বাঙ্গালা সাহিত্য

প্রথম খণ্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, এম. এ.
প্রণীত

কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—৪৲ টাকা

প্রকাশক—শ্রীক্ষীরোদলাল দত্ত,
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৪৬

প্রিণ্টার—কালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতাবাগান লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

ভূমিকা	...	।০—১৸৶০
লিপিতত্ত্ব	...	১—১৬
ভাষাতত্ত্ব	...	১৭—৭৮
সাহিত্য	...	৭৯—২৮৮
চর্য্যাপদ	...	৮১—১৪২
বিদ্যাপতি	...	১৪৩—১৮৩
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	...	১৮৪—২৮৮

ভূমিকা

জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥
(কাব্যাদর্শ, ১।২ শ্লোকের টীকা)।

অর্থাৎ গ্রন্থের আদিতেই প্রয়োজনের সহিত সম্বন্ধের উল্লেখ করা উচিত : এখানে আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, প্রয়োজনবোধেই চপলতাবশতঃ এই দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। কার্য্য কঠিন বটে, এবং আমার শক্তিও অতি সামান্য. এইজন্য কালিদাসের ভাষায় বলিতে হয় যে, বজ্রবিদ্ধ মণির মধ্যে সূত্রের ন্যায় আমি পূর্ব্ববর্তী মনীষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই ইহাতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিব। শুনিয়াছি সেতুবন্ধনকালে সামান্য কাঠবিড়ালীও তাহার শক্তি অনুযায়ী সাহায্য করিয়া ধন্য হইয়াছিল। আমার এই কার্য্যও সেই পর্য্যায়ভুক্ত। হয়ত আমার এই প্রচেষ্টায় দুর্গম পথ কিঞ্চিৎ সুগম হইতে পারে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। এই উদ্দেশ্য অণুমাত্র সফল হইলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিবার কালে প্রধান সমস্যা এই যে, বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করিয়া ইহা লিখিত হওয়া উচিত, না শতাব্দী-বিভাগে রচিত হওয়া সঙ্গত ? স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন, মহাশয় যুগবিভাগেই গ্রন্থ-রচনা করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি তিনি ইংরাজি ভাষায় অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, অতএব ধারণা করা যাইতে পারে যে, ইংরাজি সাহিত্যের সহিত বিশেষরূপেই পরিচিত হইবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। ঐ ভাষার সাহিত্যের ইতিহাসও রচিত হইয়াছে। তিনি সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞতর লোকেরা শতাব্দী বিভাগে গ্রন্থ রচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যুগপ্রভাবে সাহিত্য বিশিষ্ট

রূপ পরিগ্রহ করে, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত, যুক্তিতর্কের সাহায্যে ইহা প্রমাণিত করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইংরাজী সাহিত্য এলিজাবেথের যুগ, ভিক্টোরিয়া-যুগ প্রভৃতি পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়া রচিত হইয়াছে। সমসাময়িক ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা প্রভৃতির পরিস্থিতিতে সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠে, এবং এই যুগপ্রভাব শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয়। সাহিত্য মানুষের সৃষ্টি, এবং মানুষ কালের প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই ইহা রচনা করে। অতএব শতাব্দী-বিভাগে গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত হইতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। এইজন্য যুগ-বিভাগে গ্রন্থ রচনাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। বাঙ্গালা সাহিত্যের অভিব্যক্তির ক্রম অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া রচনা করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে বলিয়া ইহার গঠন-কার্য্যের স্তর-বিভাগ সম্বন্ধীয় আলোচনা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্য্যাপদগুলিতে পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই সকল পদ অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। চর্য্যার ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া ইহার সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইতিহাস জানিতে চাহে যে, এই সকল চর্য্যাপদকে বিশিষ্ট রূপ প্রদান করিয়া ঐরূপ প্রাচীন ভাষায় রচিত করা হইয়াছিল কেন? প্রথমতঃ দেখা যায় যে, সিদ্ধাচার্য্যগণ সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালাতেই তাঁহাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অথচ সেই সময়ে সাহিত্যের ভাষারূপে বাঙ্গালা স্বীকৃত হয় নাই। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মতবাদ সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই প্রচারিত করিয়াছিলেন, এবং তখন কাব্য-নাটকাদিও সাধারণতঃ ঐ ভাষায় লিখিত হইত। আর ঠিক এই অবস্থাটাই আমরা সেন-রাজত্বের অবসান কালেও দেখিতে পাই। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী যুগে প্রধানতঃ সংস্কৃতই ছিল সাহিত্যের ভাষা, কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে যে, সিদ্ধাচার্য্যগণ এই চির-প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন পন্থা অনুসরণ

করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, চর্য্যাগুলি সহজিয়া মতের বাঙ্গালা গান, আর এই সহজিয়া ধর্ম্ম মহাযান মতবাদের ক্রমিক অভিব্যক্তিতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ অবগত আছেন যে, মহাযানী শাস্ত্রসমূহ প্রধানতঃ বৌদ্ধ সংস্কৃতে রচিত রহিয়াছে, অথচ এখানে নূতনত্ব এই যে, তাহা হইতে উদ্ভূত মতবাদ ব্যাখ্যা করিতে সেই রীতি অনুসৃত হয় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধানের বিষয় বটে। প্রধানতঃ দেখা যাইতেছে যে, সিদ্ধাচার্য্যগণ এখানে বুদ্ধদেবের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালেও সংস্কৃতেরই প্রচলন ছিল, অথচ তিনি তাঁহার উপদেশাবলী প্রচীনতম প্রাকৃত, অর্থাৎ পালি ভাষায় প্রচারিত করিয়াছিলেন। সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য এই রীতি অনুসৃত হইয়াছিল, কারণ তখন পালিই ছিল কথ্য ভাষা, অর্থাৎ ঐ ভাষাতেই লোকে সাধারণতঃ ভাবের আদান প্রদান করিত। বুদ্ধদেবের প্রচারের ফলেই ইহার সাহিত্যিক রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। চর্য্যাপদগুলিও যখন রচিত হয়, তখন অপভ্রংশের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা কথ্য ভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। চর্য্যাকারগণ ইহাকে পালির ন্যায় সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত করিয়াছেন। এই রীতি অনুসরণ করিবার প্রধানতঃ দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। চর্য্যাগুলি গান-বিশেষ, রাগ-রাগিণীসহযোগে ইহারা আধুনিক কীর্ত্তনের ন্যায় গীত হইত। অতএব সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য করিবার জন্য ইহাদের রচনা কথ্য ভাষায় হওয়াই স্বাভাবিক। এইজন্য চর্য্যাকারগণ সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালাই ব্যবহার করিয়াছেন। এইভাবে তাঁহাদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার জাতক সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহারই ক্রমিক পরিবর্ত্তনে পরবর্ত্তী কালে আধুনিক বাঙ্গালা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলে এক প্রবল সংঘাতের সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান কালে বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। পৃথিবীতে কিছুই কার্য্য-কারণ সম্পর্ক ব্যতীত সংঘটিত হয় না, অতএব এখানেও ইতিহাস বৌদ্ধধর্ম্মের এই

পরিণতির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার জন্মভূমি হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বেদ-উপনিষদজ হিন্দুধর্ম্ম যখন এদেশে বিশেষরূপে প্রচারিত ছিল, তখন বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন করেন, আবার বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানের পরেও এখানে হিন্দু-ধর্ম্মেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অতএব প্রাথমিক ধারণা জন্মে এই যে, বোধ হয় হিন্দুধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষের ফলেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া যৌবন-প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত হিন্দু পরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, অতএব হিন্দু-সংস্কারের প্রভাব যে তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। জন্ম-জরা মৃত্যু প্রভৃতি জনিত দুঃখের কারণ, এবং তাহা প্রশমনের উপায় নির্দ্দেশ করাই বুদ্ধদেবের জীবনের ব্রত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল তত্ত্ব উপনিষদে ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়া গিয়াছে, আর ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায়-নির্দ্ধারণের জন্যই সাংখ্য-শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রসকলের প্রভাব বুদ্ধদেবের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। তিনি সে সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মচর্য্য ও বাণপ্রস্থ আশ্রমেরই রূপান্তর মাত্র, আর বৌদ্ধভিক্ষুগণের জন্য যে বিনয়ের ব্যবস্থা হইল তাহাও ব্রহ্মচারীর অবশ্য-কর্ত্তব্য বিধি-ব্যবস্থার অনুরূপ। অতএব ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পরিকল্পনার জন্য পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকটে তাঁহার ঋণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অবিদ্যার বন্ধন হইতে বিমুক্ত অবস্থার নাম মুক্তি বা নির্ব্বাণ। বুদ্ধদেব ইহারই এক নূতন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এইভাবে যে ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অব্যাহত গতিতে কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহার সংঘাত উপস্থিত হইয়াছিল হিন্দুধর্ম্মের সহিত, যে সংঘাতের ফলে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া ইহা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। উপনিষদের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হিন্দুদর্শনের তত্ত্বালোচনা যখন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল, তখন বৌদ্ধ মনীষিগণ ইহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া

থাকিবেন। তাহারই ফলে প্রায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযানী মতবাদের অভ্যুদয় হয়। উপনিষদের সারমর্ম্ম প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিয়া মহাযানীরা বৌদ্ধধর্ম্মে নবজীবনের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। মহাযানের এই অভ্যুদয় আকস্মিক নহে, ইহা জীবন-যুদ্ধে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়াস মাত্র। পালি ভাষা পরিত্যাগ করিয়া মহাযানী আচার্য্যগণ যে সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতেই এই দ্বন্দ্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। যদি তাঁহারা এই সময়ে এই নূতন পন্থা অবলম্বন না করিতেন তাহা হইলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রবাহ সেই সময়েই বিলুপ্ত হইয়া যাইত, কিন্তু করিয়াছিলেন বলিয়াই এখনও চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-ডঙ্কা নিনাদিত হইতেছে। এইরূপে নবজীবন লাভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম এক সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের সহিত তখনও ইহার সংঘর্ষের অবসান হয় নাই। হিন্দুদর্শনের পরেই হিন্দুপুরাণের যুগ। সর্ব্বগ্রাসী হিন্দুধর্ম্ম শক্তিশালী অনার্য্য সভ্যতাকে আয়ত্ত করিয়া নিজের কুক্ষিগত করিয়াছিল, এখন সুযোগ বুঝিয়া পুরাণগুলি বুদ্ধদেবকেও অবতাররূপে স্বীকার করিয়া লইল। ঘোরতর জীবন-সংগ্রামে এইরূপে পরকে আত্মসাৎ না করিতে পারিলে বিজয় লাভের সম্ভাবনা থাকে না। পুরাণের আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ধর্ম্মনীতি বিবিধ আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া সরলভাবে সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইজন্য পুরাণগুলি জনসাধারণের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তৎপর শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি মনীষিগণ আবির্ভূত হইয়া তত্ত্বব্যাখ্যায় হিন্দুধর্ম্ম প্রবাহে সতত শক্তি সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। এই শঙ্করাচার্য্যের নিকটেই প্রতিভার দ্বন্দ্বে বৌদ্ধচার্য্যগণ পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহাদের কার্য্যকারিতা যেন ক্রমেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। লোকমন আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা বিবিধ দেবদেবীর পূজারও প্রচলন করিয়াছিলেন, কিন্তু সক্রিয় হিন্দু সমাজ সুকৌশলে তাহাও আত্মসাৎ করিয়া নিজের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে। এইভাবে রিক্ত হওয়াতে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ

হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জলপ্রবাহ যখন প্রশমিত হইতে থাকে তখন উচ্চ স্তর পরিত্যাগ করিয়া ইহা নিম্ন স্তরে আসিয়া আশ্রয় লাভ করে। চর্য্যাগুলি রচিত হইবার কালে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এই অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিল তাহা চর্য্যাতত্ত্ব আলোচনার সময়ে প্রদর্শিত হইবে। ইহারই ফলে ইহার পরবর্ত্তী অভিব্যক্তিতে বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। তন্ত্রমন্ত্রের প্রচলন অথর্ব্ববেদের সময়েই হইয়াছিল, কিন্তু ইহা হিন্দুধর্ম্মের মূল প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত নহে, শাখা-সরিৎ মাত্র, আর ইহার প্রচলনও অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখর হইতে অপসারিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম তন্ত্রমন্ত্রাদির সাহায্যে ইহার শেষ দীপশিখা প্রজ্বলিত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু প্রবল দার্শনিক মতবাদের নিকট ইহা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অবশেষে এই তান্ত্রিক বৌদ্ধমত তিব্বত নেপাল প্রভৃতি দেশে যাইয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের এই পরাজয় এত সম্পূর্ণ হইয়াছিল যে, ধর্ম্মের সহিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহও ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। হীনযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি সিংহল ব্রহ্মদেশ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, আর মহাযান মতের শাস্ত্রসমূহ পাওয়া গিয়াছে প্রধানতঃ চীন জাপান প্রভৃতি দেশে। চর্য্যাপদের পুঁথি নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, আর ইহার অনুবাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তিব্বতীয় ভাষায়। এখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধির স্মৃতিচিহ্নমাত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্য ছিলেন পরম শৈব। তাঁহার প্রতিভার নিকটে বৌদ্ধাচার্য্যগণ দাঁড়াইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গেলেন, তাহাতে পরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া রামানুজ-রামানন্দ প্রভৃতি আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মের নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। সম্ভবতঃ এই যুগ-প্রভাবেই লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব মতাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব বৌদ্ধযুগের অবসানে আমরা বঙ্গদেশে বৈষ্ণবযুগের প্রবর্ত্তন লক্ষ্য করি। ইহারই প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তিতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া ইহাতে পুনরায় নব

জীবনের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থানের এই প্রাথমিক যুগ তত্ত্বালোচনার দ্বারা আরম্ভ হইয়াছিল ; কারণ তখন শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মত খণ্ডন করিয়া দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করাই বৈষ্ণব আচার্য্যগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই ভিত্তির উপরে পরবর্ত্তী কালে সাহিত্যকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়া এক উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। **গীতগোবিন্দ** এই নবযুগের সর্ব্ব প্রধান কাব্য গ্রন্থ। ইহারই আদর্শে পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণবগীতি-কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে।

চর্য্যার যুগ অতিক্রম করিয়া এখন আমরা বৈষ্ণব যুগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। জয়দেবকে এই যুগ প্রবর্ত্তক ঋষি বলা যাইতে পারে। ইহার পরেই বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে প্রকৃত পক্ষে গীতি কাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত, এবং গীতগোবিন্দের প্রভাবসম্ভূত, তাহা গ্রন্থ-মধ্যে আলোচিত হইবে, কিন্তু চণ্ডীদাস সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া চর্য্যা-কারগণের আদর্শে ইহা বাঙ্গালা ভাষাতেই রচনা করিয়াছেন। চর্য্যার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, যদিও চর্য্যার দুই একটি কথা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় তাঁহার গ্রন্থ-মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু তিনি যে জয়দেবের বেশী পরবর্ত্তী ছিলেন না, এই মত আমরা পোষণ করি (আলোচনা গ্রন্থ-মধ্যে দ্রষ্টব্য)। তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে চর্য্যার সহিত পরিচিত থাকা অসম্ভব নহে। সে যাহাই হউক, চণ্ডীদাসের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে এদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। মুসলমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য লোপ পাইতেছিল, এবং সংস্কৃতের প্রভাবও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবসরে বাঙ্গালা ভাষা স্বীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লাভ করে। বিশেষতঃ **শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন** গীতিকাব্য ও নাটকীয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত হওয়াতে ইহাতে সাধারণের ব্যবহার্য্য ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে। চর্য্যার পরবর্ত্তী যুগে প্রাচীন বাঙ্গালা কি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা হইতে আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি। কিন্তু কবি যে সংস্কৃতের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থেই পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে তিনি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া পরবর্ত্তী ঘটনার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। পড়িলেই মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় রচিত পদগুলি ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পদের সারমর্ম্ম সংস্কৃত শ্লোকে ব্যক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের কবির পক্ষে এই রীতি অনুসরণ করা অসঙ্গত হয় নাই।

বৈষ্ণব যুগের দ্বিতীয় কবি মিথিলার বিদ্যাপতি ঠাকুর। বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনরুত্থানের প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষেই অনুভূত হইয়াছিল। ইহারই ফলে মিথিলার রাজকবি বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-লীলা অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিখ্যাত পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ছিলেন পরম শৈব, তথাপি যুগ-প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্যেরও অভাব ছিল না, এবং তিনি সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দেশীয় ভাষায় তিনি যে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। দেশীয় ভাষার প্রতি অনুরাগের নিদর্শন প্রথমতঃ চর্য্যাপদগুলিতে পাওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও ইহা আমরা লক্ষ্য করি। এখন বিদ্যাপতির পদাবলীতে ইহার তৃতীয় প্রমাণ মিলিয়া যাইতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া দেশীয় ভাষাগুলি ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতেছিল। ইহা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ সংস্কৃত বহু পূর্ব্বেই সাধারণের পক্ষে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, অতএব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাহিরে ইহার প্রচলন অতিমাত্র সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এখন অধিকাংশ লোকের পক্ষে সহজবোধ্য করিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করিতে হইলেই দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা লেখকগণ অনুভব করিয়া থাকিবেন। ইহারই ফলে বাঙ্গালা মৈথিলী প্রভৃতি ভাষা সাহিত্যের বাহন হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে, মুসলমানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠন-কার্য্য আরম্ভ হয়। এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ মুসলমানগণের আগমনের পূর্ব্বেই চর্য্যাপদগুলি রচিত হইয়াছিল, এবং বিদ্যাপতি হিন্দুরাজার আশ্রয়েই তাঁহার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারের প্রেরণা আসিয়াছিল লোকের প্রয়োজন সিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে, বাহিরের কোন সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ইহার প্রচলন হয় নাই।

সাধারণতঃ তত্ত্বালোচনার উপরে ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সাংখ্য-বেদান্তের ধর্ম্মমত, এবং দ্বৈত-অদ্বৈত বাদ প্রভৃতি এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই প্রাথমিক যুগে ইহার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি কাব্য রচনা করিয়া কেবল রস পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন, তত্ত্বালোচনা তাঁহাদের রচনার মুল উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। **চৈতন্যদেব** জন্মগ্রহণ করিয়া এই অভাব পূরণ করিয়া গিয়াছেন। অতএব স্পষ্টই ধারণা করা যাইতে পারে যে, তাঁহার অভ্যুদয় আকস্মিক নহে, কিন্তু তাঁহার আগমনী গান গাহিয়া গিয়াছেন পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি তাঁহাদের অদ্ভুত প্রতিভাবলে রাধা-প্রেমের ক্রমিক অভিব্যক্তি প্রদর্শন করিতে যাইয়া অবশেষে তাঁহাকে মহাভাবস্বরূপিণী করিয়া গঠিত করিয়াছেন. আর এই ভাবময়ী রাধামূর্ত্তির জীবন্ত বিগ্রহ হইলেন চৈতন্যদেব। এই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে, মহাপ্রভু রাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের আগমনের পরেই তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, এবং গোস্বামিগণ তাঁহাদের গ্রন্থে যে বিশিষ্ট মতবাদ প্রচার করিলেন তাহাতেই বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবমত "গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম" আখ্যা লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যদেব অবতীর্ণ না হইলে হয়ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রবাহ অচিরেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত, কারণ কেবলমাত্র কাব্যগ্রন্থের সাহায্যে কোন ধর্ম্মমত অব্যাহত গতিতে

দীর্ঘকাল চলিয়া আসিতে পারে না। মহাযানী মতবাদের প্রচলনের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের যে সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল, মহাপ্রভুর আবির্ভাব কালেও বৈষ্ণবধর্ম্ম সেইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব ইহাতে নূতন প্রাণ ও প্রেরণার সঞ্চার করিয়া ইহার সংস্কার সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের ন্যায় তিনি আজও অবতার রূপে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। অতএব বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় লক্ষ্য করি, চৈতন্যদেবের সময়ে আসিয়া ইহা নবজীবন লাভ করিয়া এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এইজন্য অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল, তাহাই ইহার প্রাথমিক যুগের অভিব্যক্তি বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতেছি। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই যুগের সাহিত্যের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে। চর্য্যাপদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনাই এই যুগ-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শেষোক্ত উভয় কবির রচনা যে একই যুগের লক্ষণাক্রান্ত তাহা গ্রন্থমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার পরেই অনুবাদের যুগ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাহিত্যের অনুবাদ শাখা ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই মুসলমানগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। এক রাজত্বের অবসানে অন্য রাজশক্তির অভ্যুদয়কালে সাধারণতঃ দেশে অরাজক অবস্থারই সৃষ্টি হইয়া থাকে। পাল ও সেনরাজগণ একই জাতিভুক্ত ছিলেন, অতএব একের পরিবর্ত্তে অপরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলায় বিশেষ আঘাত লাগিতে পারে নাই। কিন্তু মুসলমানগণ ছিলেন জাতি ও ধর্ম্মে সম্পূর্ণ ই বিভিন্ন, অতএব তাঁহাদের আগমনে দেশের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। এইজন্য প্রায় আড়াই শত বৎসর পর্য্যন্ত এদেশে সাহিত্য-সাধনার কোন প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয় না।[১] এই

১। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে রচিত বৃহস্পতি রায়মুকুটের স্মৃতিগ্রন্থ ও টীকা-টীপ্পনী লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহাদের খ্যাতিও বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ আধুনিক গবেষণার ফলেই মাত্র ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানলাভ হইয়াছে।

দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা সাহিত্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেরই'[১] সন্ধান পাইয়া থাকি। অবশেষে দেশে বোধ হয় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আর ইহারই ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। আফগানিস্থান, পারশ্য, মিশর প্রভৃতি দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মুসলমানগণ যেখানেই গমন করিয়াছেন, সেখানেই পূর্ব্ব কৃষ্টি ধ্বংস করিয়া ইহারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে পাঁচশতাধিক বৎসর প্রবল প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিয়াও ইহারা হিন্দু-সংস্কৃতির বিলোপ সাধন করিতে পারেন নাই। যে শক্তিবলে হিন্দুগণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই শক্তির প্রভাবেই তাঁহারা অত্যল্প ত্যাগ স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তবে সাময়িকভাবে কখনও কখনও তাঁহাদের কৃষ্টি লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু বাহিরের চাপ একটু শিথিল হইলেই আবার ইহা আত্মপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শাসনের উত্তাল তরঙ্গ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হওয়াতে সাহিত্য সাধনার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রাথমিক অভিব্যক্তিতে অনুবাদ-সাহিত্যের প্রারম্ভ সূচিত হইয়াছে। ইহা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ঐশ্বর্য্যশালী প্রাচীন সাহিত্যের আদর্শেই অর্ব্বাচীন সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাঙ্গালায় গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছিল, তখনও মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষিগণ সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াই ইহার ভিত্তি গঠিত করিয়াছিলেন। এই জন্য অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাগ্রে স্বীকৃত হইয়া থাকে। এখানে দেখা যাইতেছে যে, রামায়ণ মহাভারতাদির অনুবাদেই কবিগণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, অন্য কোন কাব্যগ্রন্থের অনুবাদে প্রথমে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে,

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে, ইহার পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, তাহা গ্রন্থমধ্যে আলোচিত

কাব্যনাটকাদির রস পরিবেশন করা অপেক্ষা তখন ইঁহারা লোকব্যবহারের উপযুক্ত উপকরণের সংস্থান করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দু সমাজের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি এখনও হিন্দুগণ আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া কবিগণ ভাষাপথ "খননি স্ববলে, মিটাতে গৌড়ের তৃষা ভারতরসের স্রোত" প্রবাহিত করিয়াছেন। এইভাবে সংস্কৃতের ভাণ্ডার লুণ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্ট সাধনের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কবিগণ পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য পুরাণ ও কাব্য গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, এবং বহু কবি স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী একই গ্রন্থের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও ইহার বিরাম হয় নাই। অতএব প্রাক্-চৈতন্য যুগে যে ধারার উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। এইজন্য এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে, কারণ বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের এই দ্বিতীয় যুগে অনুবাদ-শাখাই সর্ব্বাগ্রে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে বৈষ্ণবসাহিত্য বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়া উন্নত হইয়াছিল বলিয়া তাহা পৃথক্‌ভাবে তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত হইবে। ইহা ব্যতীত রামায়ণ মহাভারতের আদি অনুবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় অনুবাদগ্রন্থ দ্বিতীয়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই সকল গ্রন্থ-রচনায় কবিগণ আক্ষরিক অনুবাদের রীতি অনুসরণ করেন নাই, ভাবানুবাদ করিয়াছেন, অর্থাৎ এক একটি আখ্যায়িকার সারমর্ম্ম তাঁহারা নিজের ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা ভাষা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। আক্ষরিক অনুবাদে পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া সাধারণ লোকের সাস্বাদ করিতে পারে না। এইজন্য এই রীতি পরিত্যাগ করিয়া নিজের ভাষা ব্যবহার করাতে পণ্ডিতগণ সুচিন্তিত পন্থাই অনুসরণ করিয়াছিলেন। সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া গ্রন্থ রচনা

করিতে হইলে প্রচলিত ভাষাই ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে গ্রন্থের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লোকেও নিজের ভাষা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। এইভাবে রামায়ণ মহাভারতের অত্যধিক প্রচার হেতু বাঙ্গালীর মুখে ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আর সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি বাঙ্গালা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

মুসলমান শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালার এই শুভযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা প্রচারিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। আমরা বহুল প্রশংসিত হোসেন সাহের সম্বন্ধেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। চৈতন্যদেব রামকেলি গ্রামে আসিয়াছেন, এবং প্রভূত লোক-সমাগমও হইয়াছে জানিতে পারিয়া হোসেন সাহ কেশবছত্রীকে "বার্ত্তা" জিজ্ঞাসা করিলেন। ভয়ে তিনি "প্রভুর মহিমা উড়াইয়া" দিয়াছিলেন, কিন্তু গোপনে লোক পাঠাইয়া চৈতন্যদেবকে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার উপদেশ প্রদান করেন। রূপ-সনাতন মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া বিদায় লইবার কালেও বলিয়াছিলেন "ইহা হৈতে চল প্রভু, ইহা নাহি কাজ।" রূপ গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, সনাতনও রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেছেন,-

"হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে—তুমি চল মোর সাথে॥
তেঁহো কহে—যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥
তবে তারে বান্ধি রাখি করিলা গমন।"

গোপালের আদেশে মাধবেন্দ্র পুরী চন্দন আনিতে যাইতেছেন, কিন্তু "ম্লেচ্ছ দেশে চন্দন-কর্পূর আনিতে জঞ্জাল।" চৈতন্যদেবকে নবদ্বীপের কাজী সাহেব বলিতেছেন—

কাজী কহে—যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥ ইত্যাদি—

চৈতন্যদেবের সমকালেই যখন দেশের এই অবস্থা, তখন এই প্রকার মনোবৃত্তি-ধারী শাসকগণ বাঙ্গলা ধর্ম্মগ্রন্থ রচনায় উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে যে বহু কবি ইঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা উদ্দেশ্যমূলক বলিয়াই বোধ হয়। যে কারণে বহুবিধ গ্রন্থ এখনও প্রধান প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের নামে উৎসর্গ করা হয়, তখনও সেই কারণ বর্ত্তমান ছিল। উৎসাহ পাই বা না পাই, উৎসাহ পাইয়াছি, ইহা বলিলে দেবতা সন্তুষ্ট হন, এবং তাহাতে ধন ও সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। অন্ততঃপক্ষে শনির দৃষ্টি এড়াইবার জন্য এইপ্রকার স্তবস্তুতির সার্থকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, মুসলমানগণের কঠোর শাসনে ব্রাহ্মণ্য প্রধান্য ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বিরল প্রচার হেতু দেশীয় ভাষাগুলিই সাহিত্যের বাহন হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। পরোক্ষভাবে এইরূপে মুসলমানগণের আগমন বাঙ্গালা সাহিত্য-সৃষ্টির সাহায্য করিয়াছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে চর্য্যাপদগুলি, বড় চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', সঞ্জয়ের 'মহাভারত', এবং মালধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলি যে মুসলমানগণের প্রত্যক্ষ সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হয় নাই তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকিবেন। বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসেও মুসলমান-সাহায্যের স্বীকৃতি নগণ্য মাত্র। বাঙ্গালীর প্রতিভা বাহিরের গুরুতর চাপে যেন কিছুকাল অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেই সুপ্ত সিংহ জাগ্রত হইয়া স্ববলে নিজের পথ খুঁজিয়া লইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বে যে বিরাট বাঙ্গালা সাহিত্য গঠিত হইয়াছে তাহাতে ইহারই পুনরভিনয় দৃষ্ট হইবে।

অনুবাদ-যুগের পরেই আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্মুখীন হই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে ইহা বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে নিম্নলিখিত প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

১। **ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থরাজি**। প্রধানতঃ বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ সংস্কৃত ভাষায় এই সকল তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এখানে যে সংস্কৃত ভাষাকে প্রধান্য দেওয়া হইয়াছে তাহাও উদ্দেশ্যমূলক। ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ ঐ ভাষায় রচিত রহিয়াছে। ইহাদের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে হইলে সংস্কৃতকেই তত্ত্বের বাহন করিতে হয়। ইহাতে ধর্ম্মমতের আভিজাত্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এবং ভারতের ধর্ম্মসভায় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা যায়। বাঙ্গালা প্রাদেশিক ভাষা মাত্র। ইহাতে রচিত গ্রন্থসমূহ ভিন্ন প্রদেশের লোকের নিকট সহজবোধ্য হইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের মর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র পণ্ডিতমণ্ডলী সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এইজন্য প্রাদেশিক ভাষার অভ্যুত্থানের এই যুগেও সংস্কৃতকে তত্ত্বসাহিত্যের বাহন করা হইয়াছিল।

২। **পদাবলী শাখা**। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে রসিক পর্য্যায়-ভুক্ত। রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করাই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে তত্ত্বগ্রন্থের পরিবর্ত্তে লীলারসাত্মক পদাবলীরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। যুগে যুগে কবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাতে রসসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। এইভাবে সে বিরাট পাদাবলী সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যে কোন সাহিত্যরই খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

৩। **চরিত-শাখা**। মহাপ্রভুর অলৌকিক ভাবোন্মাদনা তাঁহাকে দেবতার পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, অতএব প্রাচীন রীতি অনুসরণ করিয়া দেবতা বা দেবোপম চরিত্রের আদর্শে তাঁহার লীলামাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া চরিতগ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ হয়। বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকগণ নানা মাধুর্য্য-মণ্ডিত করিয়া ইহা রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষাতেও মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর চৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সহচর ছিলেন অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ। তাঁহাদের জীবনী বর্ণনা করিয়াও গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল,

আর প্রসঙ্গক্রমে এই সকল গ্রন্থে অন্যান্য ভক্তগণের বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে নব প্রেরণা লইয়া আসিয়া বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা চৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। এজন্য তাঁহাদের জীবনী অবলম্বন করিয়াও প্রেমবিলাস, নরোত্তম বিলাস, ভক্তিরত্নাকর, কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। পরে কোন কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণবের চরিতাখ্যানেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থ-সম্বন্ধীয় আলোচনা এই খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪। **অনুবাদ শাখা**। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, রামানন্দ রায়ের জগন্নাথ-বল্লভ নাটক, রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। ইহাদের বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইবে।

৫। বৈষ্ণবধর্ম্মের ক্রমিক পরিণতি হইতে **সহজিয়া** প্রভৃতি মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। এইসকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইসকল গ্রন্থের পরিচয় পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে। তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সূত্ররূপে এখানে নির্দ্দেশিত হইল।

মঙ্গলকাব্যাদি চতুর্থখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অনুবাদ সাহিত্যের প্রচলনের ফলে বাঙ্গালার মুখে ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং পদ্যরচনার উন্নততর রীতি প্রচলিত হওয়াতে সেই আদর্শেই পরবর্ত্তীকালে কাব্য গ্রন্থাদি রচিত হইতে আরম্ভ হইয়া থাকিবে। সাহিত্যিক ভাষার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, তাহা যে কিরূপ হইবে, তাহার নির্দ্দেশ অনুবাদ-সাহিত্যই প্রথম প্রদান করে। পরবর্ত্তীকালে গদ্যসাহিত্যের ভাষার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু সাহিত্যিক পদ্যের রূপ স্থিরকরিতে লোককে এত গলদঘর্ম্ম হইতে হয় নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের পরে

কেহ পার্শি-মিশ্রিত বাঙ্গালার সৃষ্টি করিলেন, কেহ কাদম্বরীর ভাষার অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইলেন, কেহ বা কথ্যভাষা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ গদ্য রচনার রীতি (Style) স্থিরীকৃত করিতেই তাঁহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল, কিন্তু রামমোহন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করিয়া এই প্রচেষ্টাকে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় প্রতিভা-বলে গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহার পরেও বাক্‌বিতণ্ডায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অধুনা বাঙ্গালা গদ্যে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহা সহজ সরল কথ্য ভাষারই কিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র, অথচ এই রীতি প্রচলিত করিতে বহু কষ্টসাধ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল! আদি অনুবাদকগণ এইরূপ ভুল করিয়া বসেন নাই। তাঁহারা প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে, লোকের প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে তাহাদের ব্যবহারের উপযোগী ভাষারই প্রয়োগ করিতে হইবে। এইজন্য দীর্ঘ পদক্ষেপে তাঁহারা বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারতের বহুল প্রচলন এই কারণেই হইয়াছিল। তথাপি আদি রচনায় ভাষার জড়তা এবং ছন্দের পতন প্রভৃতি জনিত দোষ যে ছিল, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে, আর এইজন্যই যুগে যুগে ইহা পরিবর্ত্তিত হইবার সুযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। আধুনিক কৃত্তিবাসী রামায়ণ এইরূপ বহু সংস্কারের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ইহার খাঁটি রূপের সন্ধান আয়াসসাধ্য গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি আদি অনুবাদকগণ পদ্যের যে রীতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বহু দোষ সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে কাব্য-রচনার প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিল, আর তাহারই ফলে মধ্য-যুগের কাব্যসাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। ১৪১৬ শক বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়গুপ্ত পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি কাণা হরি দত্ত কর্ত্তৃক রচিত মনসামঙ্গলের উল্লেখ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন ঃ—

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥

হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়াগাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥ ইত্যাদি।

অবশ্যই হরিদত্ত বিজয়গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি যে গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অনেক দোষ বিজয়গুপ্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বিজয়গুপ্তের সময়ে পদ্যরচনার রীতি এতটাই মার্জ্জিত হইয়া গিয়াছিল যে, যাহাতে কথার সঙ্গতি নাই, মিত্রাক্ষর-বর্জ্জিত এমন রচনা সেই সময়ে নিন্দনীয় হইত। এই নূতন আদর্শ প্রচলিত হওয়ার ফলে হরিদত্তের প্রাচীন রচনা আর লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বিজয়গুপ্তের সময়েই যাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, এখন তাহার অনুসন্ধানে ছুটাছুটি করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তথাপি দুই-এক স্থানে যে তাঁহার ভণিতাযুক্ত রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাও মার্জ্জিত আকারে ঐ সকল গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। দ্বিজ জনার্দ্দনের চণ্ডী ও ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গলও এই পর্য্যায়ভুক্ত। ইহাদের আদি রূপের সন্ধান কখনও পাওয়া যাইবে না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পদ্যরচনার উন্নততর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এইরূপ অমার্জ্জিত এবং জড়তাগ্রস্ত বহু প্রাচীন রচনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই পুরাতন রীতিই মার্জ্জিত হইয়া পরবর্ত্তীকালে কাব্যের ভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে, অধুনা-প্রচলিত ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল এবং মনসামঙ্গলের কোন কবিই অনুবাদ-সাহিত্য রচনার পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই। যদি বা কেহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের রচনা সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করিতে পারে নাই, বহুপূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নূতন আদর্শের প্রভাব এইভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলি হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে। দীর্ঘকালের অসাড় দেহে এখন প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়া আসিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানকালে আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের বীজ উপ্ত দেখিতে পাইয়াছি।

ইহাতে নব প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিলেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের পরে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখনও তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুধর্ম্মের আর একটি শাখাও ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই সকল গ্রন্থে প্রধানতঃ শাক্ত প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। মনসামঙ্গলে মনসাদেবীর সংমা দুর্গা, আর চণ্ডী-মঙ্গলের চণ্ডীও পৌরাণিক চণ্ডীর ছায়া অবলম্বনে গঠিত হইয়াছে। অতএব উভয়ে একই শক্তির কায়ব্যূহ রূপ মাত্র। ইঁহাদিগকে লৌকিক দেবতা আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। লৌকিক অর্থে লোকের সাধারণ সংস্কার-সম্ভূত, অতএব অপৌরাণিক। কিন্তু যেভাবে ইঁহাদের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, লোকের সাধারণ মনোবৃত্তিগুলি ইঁহাদের হৃদয়ে প্রক্ষেপ করিয়া ইঁহাদিগকে লীলাময়ী করিয়া গঠিত করা হইয়াছে। অতএব চণ্ডী বা মনসাকে ঈর্ষ্যাপরায়ণা দেখিলে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। যেহেতু ইঁহারা অপৌরাণিক, অতএব ইঁহাদের পূজা প্রবর্ত্তনের ইতিহাসও নূতন করিয়া গঠিত করিতে হইয়াছে। ইঁহারা ভক্তের প্রতি কৃপাময়ী, আর অভক্তের যম-স্বরূপিণী। এইভাবে আবির্ভূতা না হইলে সাধারণ লোকের মধ্যে সহজে ইঁহাদের পূজা প্রচলিত হইতে পারিত না। এই কৌশলে ইঁহারা গৃহস্থের ঘরে ঘরে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের আখ্যায়িকা যেভাবে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব প্রভাবেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ ভগবানকে স্বর্গের আসন হইতে মানুষের পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়া তাঁহার সহিত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণলীলা সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমাভিনয়ের আদর্শে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব চণ্ডী ও মনসার হৃদয়ে প্রাকৃতজনোচিত বৃত্তির সমাবেশ করাতে বৈষ্ণবাদর্শই অনুসৃত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই বৈষ্ণবপ্রভাব ধর্ম্মমঙ্গল জাতীয় কাব্যগুলিতেও লক্ষিত হয়, কারণ তাহাতে ধর্ম্মরাজ স্বরূপ-নারায়ণে পরিণত হইয়াছেন। সমাজের যে স্তরের লোকের মধ্যেই ধর্ম্মপূজা প্রথম প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, ধর্ম্মের এই পরিণতি যে বৈষ্ণব প্রভাবে সংঘটিত হইয়াছে

তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মমঙ্গল ও শূন্যপুরাণ হিন্দুধর্ম্মের এই পুনরুত্থানের সময়ে লিখিত হইয়াছিল। অতএব এই সকল গ্রন্থ এই যুগেরই অন্তর্ভুক্ত। নাথ-সাহিত্য সম্বন্ধেও এই যুক্তি প্রযোজ্য হইতে পারে। গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে শিব-পার্ব্বতীর প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। নাথপন্থিগণ এইভাবে শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আত্ম-গোপন করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বশেষ চিহ্নগুলিরও বিলোপ সাধন করিয়াছে, ইহা তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করে।

মঙ্গলকাব্যগুলি সংস্কৃত পুরাণের আদর্শে রচিত হইয়াছিল। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ। সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয়ের পরে পুনরায় সৃষ্টি, মন্বন্তর অর্থাৎ যুগবিভাগ, বংশ অর্থাৎ দেবতাদের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় আখ্যান, এবং বংশানুচরিত অর্থে পৌরাণিক প্রসিদ্ধ রাজগণের আখ্যায়িকা, যাঁহাদের সাহায্যে দেবতাবিশেষের পূজা প্রচলিত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে যে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা দৃষ্ট হয়, তাহা এই আদর্শের অনুকরণ মাত্র। ইহাতেই সর্গ, প্রতিসর্গ এবং মন্বন্তরের বিবরণেরও সন্ধান পাওয়া যায়। মনসা, চণ্ডী প্রভৃতির উৎপত্তিসম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা বংশ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বংশানুচরিতে কবিগণ এক নূতন পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। পুরাণপ্রসিদ্ধ রাজগণের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিবার পরিবর্ত্তে ইঁহারা আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এইভাবে আমরা লাউসেন, কালকেতু, চাঁদসদাগর, বেহুলা প্রভৃতি আধুনিক কালের নরনারীর সন্ধান পাইয়াছি। এইসকল চরিত্র-সৃষ্টিতেও দুইটি বিশিষ্ট ধারার প্রভাব লক্ষিত হয়। লাউসেন ধর্ম্মঠাকুরের খেলার পুতুল মাত্র, বিপদে পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু দৈববলে উদ্ধার পাইয়াছেন। কালকেতুও চণ্ডীদেবীর স্নেহের পুত্তলী, দেবীর করুণাতেই রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রভাবেই হইমুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু চাঁদ ও বেহুলাকে নিজবলে কঠোর অগ্নি পরীক্ষার বৌদ্ধধর্ম্মে অগ্রসর হইয়া জয়মাল্যে ভূষিত হইতে হইয়াছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়

যে, মনসামঙ্গল কাব্য প্রথমতঃ পূর্ব্ববঙ্গেই রচিত হইতে আরম্ভ করে[১], আর চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গলের উৎপত্তি প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে। দেশের দুইপ্রান্ত হইতে উদ্ভূত কাব্যধারার এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মঙ্গলকাব্য-গুলির আখ্যায়িকা যখন বিশিষ্টরূপ গ্রহণ করিয়া প্রচারিত হইতেছিল, তখন এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে পৌরাণিক চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ লোকে লাভ করিয়াছিল। পুরাণে ভক্ত ও অভক্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কবিগণ ভক্তের আদর্শ গ্রহণ করিয়া দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের

১। কোন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিত আছে—"মনসামঙ্গল কাহিনীর উৎপত্তি হয় পশ্চিমবঙ্গে, রাঢ়ে।" দীনেশবাবু লিখিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গেই মনসামঙ্গলের উৎপত্তি! রাঢ়ের অধিবাসীর ইহা মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের যে মনসামঙ্গলের নজিরে এই উক্তি করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাও রাঢ়ে রচিত হয় নাই, বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। আমরা জানি যে, গঙ্গার পশ্চিম তীর হইতে রাঢ় দেশ আরম্ভ হইয়াছে, অতএব বসিরহাট অঞ্চল রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। বিদ্বেষবশে এইভাবে সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে। ইহা করিতে যাইয়া ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের সময় সম্বন্ধেও কৌশলে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে, নতুবা বিপ্রদাসকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। অন্যত্র লিখিত হইয়াছে—"এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি দুইজন, পূর্ব্ববঙ্গের বংশীদাস চক্রবর্ত্তী এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমানন্দ।" সকল পুঁথি এবং গ্রন্থেই ক্ষেমানন্দ পাঠ রহিয়াছে, অথচ ভাষাতাত্ত্বিকগণ ইহাকে ক্ষমানন্দে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ লোকে "ক্ষমা" স্থানে "ক্ষেমা" বলে, এই জন্য বোধ হয় পাঠ শুদ্ধ করিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যে অর্থযুক্ত ক্ষেম শব্দ রহিয়াছে তাহা বোধহয় গ্রন্থকর্ত্তা অবগত নহেন। শুনিয়াছি এক ময়রা বিজ্ঞাপন দিয়াছিল—"এখানে উৎকৃষ্ণ সন্দেশ পাওয়া যায়।" ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল—"আজ্ঞে, "কৃষ্ণ" হইতে "কৃষ্ট" হয় বলিয়া আমি শুদ্ধ করিয়া লিখিয়াছি।" এইভাবে কবির নাম পরিবর্ত্তিত করা অজ্ঞতা ও স্বৈরাচারের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। "গোরোচনা" অর্থে "গেরুয়া মাটি" বলার ন্যায় ইহাও অদ্ভুত রসের সৃষ্টি করিয়া থাকে। তারপর বিজয়গুপ্ত যে ভাবে কাণা হরিদত্তের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের কবি বলিয়াই বোধ হয়। ইহা ব্যতীত প্রাচীন কবিগণের মধ্যে নারায়ণ দেবও রহিয়াছেন। ইহাদিগকে অস্বীকার করিয়া মনসামঙ্গলের উৎপত্তি রাঢ়দেশে নির্দ্দেশ করা ইচ্ছাকৃত সত্যের অপলাপ মাত্র।

পরিকল্পনাও করিতে পারেন নাই। ধনপতি মেয়েদেবতার পূজার নিন্দা করিয়া অহঙ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিপদে পড়িয়াই তিনি হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, চাঁদের ন্যায় মনোবলের পরিচয় দিতে পারেন নাই। আর ভাবুক ও চিন্তাশীল পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিগণ পুরাণ মন্থন করিয়া আসুরিক বলের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাহারই সংস্থান করিয়া তাঁহারা চাঁদের চিত্রে অপূর্ব্ব রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন। রাবণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও রামের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই, এবং নল, শ্রীবৎস প্রভৃতি রাজগণ অবিচলিত ভাবে দেবতার পীড়ন সহ্য করিয়া গিয়াছেন। চাঁদের চরিত্রে ইহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক সাবিত্রীর আদর্শ লৌকিক বেহুলায় প্রতিফলিত হইয়াছে। চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়া মনসামঙ্গলের কবিগণ অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার পশ্চাতে কিছু রাজনৈতিক কারণও থাকিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গে হয়তঃ বিদেশী শাসনের তীব্রতা অনুভূত হইয়া থাকিবে। ইহা প্রতিরোধ করিবার শক্তির আদর্শ-সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কবিগণ অনুভব করিয়া থাকিবেন। এমনও হইতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গে সেইভাবে তখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু এইসকল আখ্যায়িকার সর্ব্বাদি রূপের সন্ধান না পাওয়া গেলে ইহাদের উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় ইতিহাস চিরদিনই কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়া রহিবে।

ডাক ও খনার বচন, শিবের ছড়া, গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর গান এবং কাঞ্চনমালা প্রভৃতির উপাখ্যান মুখে মুখে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতে পারে, কিন্তু যে যুগে ইহারা সংগৃহীত হইয়াছে তাহারই সাহিত্যিক রূপের সন্ধান ইহাতে পাওয়া যায়। যে গোপীচন্দ্রের গানে চৈতন্যদেবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা যে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে রচিত হয় নাই তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এইজন্য এই সকল ছড়া-পাঁচালী চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই গদ্য-রচনার প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্ত নানাপ্রকার পরীক্ষার মধ্যদিয়া ইহা অগ্রসর হইয়াছে। যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহারা নূতন সৃষ্টিতে মনোনিবেশ

করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা গদ্যের প্রচলন যে পূর্ব্বে ছিল, ইহা তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারেন নাই। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা নানাভাবে পরীক্ষামূলক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তথাপি গদ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। গদ্য থাকুক বা না থাকুক, পদ্য যে ছিল ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত যে, আমরা যাবতীয় গদ্য-রচনাই গদ্যের ভিত্তিতে বুঝিয়া থাকি, অতএব পদ্যের অন্বয় সাধন করিলেই তৎকাল-প্রচলিত গদ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। চর্য্যাপদ হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :—

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলোঁ স্বমোহেঁ।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্গুরুবোহেঁ॥
পেখমি দহদিহ সব্বই শূন। ইত্যাদি—

অন্বয়—হাঁউ এতকাল স্বমোহেঁ অচ্ছিলোঁ, এবে মই সদ্গুরুবোহেঁ বুঝিল। (হাঁউ) দহদিহ সব্বই শূন পেখমি, ইত্যাদি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ শূন্যপুরাণের গদ্যের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—"আসিন গেলে কাত্তিক মাস তুলা রাশি। হে দামোদর, বার ভাই বার আদিত্ত, হাত পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ্য পুপ্প পানি, সেবক হব সুখী, আমিনি, গুরু, পণ্ডিত, দেউলা, দানপতি, সাংসুর-ভোক্তা, আমনি, সন্ন্যাসী, গতি, জাইতি, গাএন, বাএন, দুআরি, দুআরপাল, ভাণ্ডারী, ভাণ্ডারপাল, রাজদূত, কোমি, কোটাল পাব মোখ মুকতি। এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার।" এই ভাষার সহিত শূন্যপুরাণের পদ্যের ভাষার সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে। প্রকৃত-পক্ষে গদ্যের ভিত্তিতেই পদ্য-রচনা বোধগম্য হইয়া থাকে। যে কোন সময়ের পদ্য-রচনার অন্বয় সাধন করিলেই তৎকালোচিত গদ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা :—

সর্প যেন ধাইয়া যায় মারিতে গরুড়ক।
সেইমত চাহ তুমি মারিতে অর্জ্জুনক॥

(সঞ্জয়ের মহাভারত)

গদ্যে—সর্প যেন গরুড়ক মারিতে ধাইয়া যায়, সেইমত তুমি অর্জ্জুনক মারিতে চাহ।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

(শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)

অন্বয়ে—(ওগো) বড়ায়ি, কালিনী নইকুলে কে না বাঁশী বাএ! (ওগো) বড়ায়ি, এ গোঠ-গোকুলে কে না বাঁশী বাএ! (তা সুনিআঁ) মোর শরীর আকুল, (এবং) মন বেআকুল (ভইল), (আর) বাঁশীর শবদেঁ মো রান্ধন আউলাইলোঁ।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

অন্বয়—কাশীরামদাস অমৃতসমান মহাভারতের কথা কহে(ন), এবং পুণ্যবানেরা শুনে(ন)।

ইহা ব্যতীত পত্র-দলিলাদিতে এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থে প্রাচীন গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সকল আদর্শে প্রয়োজনানুযায়ী গদ্য বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই নূতন গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালের রচনার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই দলিল ১১৯৪ সনে (ইং ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত হইয়াছিল, এবং ইহা ভারত সরকারের সংগ্রহ হইতে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় "প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র-সঙ্কলন" গ্রন্থের ২০১—২০৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল তস্য পুত্র শ্রীজয়নারায়ণ ঘোষাল গরিব কাঙ্গালি লোকের প্রতিপালনার্থে হকিকত লিখিতেছি—বাঙ্গালার কলিকাতা সহরের সমস্ত গরিবের মধ্যে প্রায় ৫০০ পাঁচ সত গরিব—জাহারা কানা, খোড়া, আতুর, অচল ও পুঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্থ, অনাথা, পিতামাতাহিন ও পতিপুত্রবিহিন, শক্তি-রহিত, শ্রম করিয়া আত্ম-ভরণ-পোষণ করিতে অযোগ্য, সর্ব্বদা সহরের রাস্থাতে ও গলিতে ও বৃক্ষতলাতে বাস করিয়া থাকে—যাহাদ্দিগের মৃত্যু গাড়ি ও ঘোড়ার চাপটে ও অন্য ২ অসদ্গতিতে—তাহাদ্দিগের মৃত্যু হইলে পরে সহরের মুরদারফরাস আসিয়া স্থানান্তর করিয়া ফেলিয়া দেয়—ইহাতে যে যেমত জাতি সাস্ত্রসম্মত গতি হয় না—এই অনাহত অনাথা জিবের প্রাণরক্ষার কারণ, যদি শ্রীযুত রাইট হানবিল গৌবনর জানেরল বাহাদুর সাহেবের অনুগ্রহ হয়, ঐ সকল গরিব প্রতি দৃষ্টি করিয়া দুঃখ বিমোচন করেন—তবে ইহাতে অত্যন্ত পুন্যপ্রতিষ্ঠা চিরকালের জন্যে জগত সংসারে থাকিবেক,—একারণ আমরা এ সকল গরিব লোকের দুঃখ দুর করিবার নিমিত্যে ও সহরের উপকারের জন্যে বিস্তারিত দফাওয়ারিতে আপনাদ্দের বুদ্ধিক্রমে নিচে লিখিতেছি...........

কলিকাতা সহরের নিকট একস্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়, যাহাতে ঐ ৫০০ পাঁচ সত লোকের বাসকরণের বাটী হইবেক, ও এক পুষ্করিণী জলের জন্যে কাটাইতে হইবেক, আন্দাজ দুইসত বিঘা জমি হইলে বাটী ও পুষ্করিণী ও বাগিচা ভাল উপযুক্ত হইবেক—

ঐসকল গরিবদ্দিগের মধ্যে জাহারা আরাম পাইয়া আপন ২ শ্রম করিয়া গুজরাণ করিতে সমর্থ হইবেক, তাহারা ইণ্ডষ্টরি বাটী ও অনাথমণ্ডপ হইতে গিয়া অন্যন্তরে তাহাদ্দিগের আপন ২ ব্যবসার চেষ্টা করিবেক, অক্ষম লোক ব্যতিরেকে ঐ স্থানে থাকিতে পারিবেক না—

অনাথার বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্যে সিক্ষাগুরু নিরোপিত করিতে হইবেক, তাহাতে তাহার মধ্যে যে যেমন বিদ্যাসিক্ষা করণের উপযুক্ত, তাহারে তদনুরূপ সিক্ষা করাইবেক—

সহরের গলি ও রাস্তা হইতে এ সকল অক্ষেম গরিব অন্যত্রে স্থাপিত হইলে, সহরের লোকের অনেক প্রকার আরাম হইবেক। মোছলমানের আমল অবধি এ সকল ধারা বন্দ হইয়াছে। পূর্ব্বে হিন্দুর আমলে এমতরূপ গরিবের জন্যে. স্থান ও ইহার ব্যয় নিরোপন ছিল। মহারাজা যুধিষ্ঠিরের আমলে এই স্থানের নাম অনাথমণ্ডপ ছিল, এখন সেইমত নিয়ম বিলাতেও আছে শুনিতে পাই"—ইত্যাদি।

এই রচনায় সহজ ও সরল ভাষায় ভাব প্রকাশের কোনই বাধা জন্মে নাই, এবং গদ্যের যে ছন্দের কথা বলা হইয়া থাকে, তাহারও সন্ধান ইহাতে পাওয়া যায়। অথচ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইল, তখন ইহার পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার পরীক্ষামূলক কার্য্যের মধ্য দিয়া গদ্যরচনার রীতি সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—"তাঁহার রচনাগুলি পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বাঙ্গালা গদ্যের যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থা, তখনই তিনি বিভিন্ন গদ্যরীতি লইয়া পরীক্ষা চালাইয়াছেন, এবং, তাঁহার বিভিন্ন পুস্তক বিভিন্ন রীতিতে রচনা করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন। কোনও প্রাচীন আদর্শের অভাবে তিনিই নানা আদর্শ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন[১]।" এই মন্তব্য একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে, উক্ত কলেজ-সংশ্লিষ্ট সকলের সম্বন্ধেই ইহা বলা যাইতে পারে। এইরূপ পরীক্ষার সময়ে আদর্শ গদ্যের সৃষ্টি হইতে পারে না, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইঁহাদের প্রচেষ্টার ফলে পাশ্চাত্য আদর্শে গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের মধ্য দিয়া বঙ্কিমে আসিয়া এই ধারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এখানেই ইহার পরিসমাপ্তি হয় নাই। এই ধারাই রবীন্দ্র-নাথ ও শরৎচন্দ্রে আসিয়া চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। পঞ্চমখণ্ডে এইভাবে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের ক্রমিক অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে।

[১] শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার" গ্রন্থের ২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এইভাবে গদ্য-রচনার রীতি স্থিরীকৃত করিতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে এদেশে ইংরাজ-রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় দেশবাসী শিক্ষিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। তাহারই ফলে পদ্য সাহিত্যেও যে নবযুগ-প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যবর্ত্তী সময়ে মাইকেল আবির্ভূত হইয়া এই অভাব পূরণ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তিনি অতিমাত্র শিক্ষিত ছিলেন। অতএব নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিবার অধিকার যে তাঁহার জন্মিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে মাইকেলের আবির্ভাবও আকস্মিক নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতনত্বের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। ইহারই অভিব্যক্তি হেম-নবীনের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথে আসিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। পঞ্চম-খণ্ডের শেষভাগে এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের স্তর নির্দ্দেশ করিয়া এইভাবে পাঁচখণ্ডে এই গ্রন্থ রচনা করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এইভাবে তাহার সার সংকলন করা যাইতে পারে—সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পূর্ণই পরিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। বুদ্ধদেব যে পালি ভাষায় তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিলেন তাহারও একটা কারণ ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুশাস্ত্র সমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ঐসকল গ্রন্থে আলোচিত দার্শনিক মতবাদ এতই জটিলতাপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, সাধারণ লোকের তাহাতে প্রবেশ করা একপ্রকার অসম্ভবই হইয়াছিল। সময় বুঝিয়া বুদ্ধদেব জনসাধারণের প্রয়োজন সাধনের জন্য কথ্যভাষায় তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। এইভাবে পালি সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া দেড়সহস্রাধিক বৎসর পরে চর্য্যাকারগণ সাহিত্যের আসরে বাঙ্গালা ভাষার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। প্রতিভার দ্বন্দ্বে তিনি নাকি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম

অনেকদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রবাহের বেগের তীব্রতা প্রথম ভাগেই অনুভূত হয়, পরে ইহার বিস্তৃতি যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে ততই ইহা নানাভাবে পঙ্কিল হইয়া পড়ে, এবং আদি প্রবর্ত্তকগণের প্রতিভা পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-প্রচারকগণের মধ্যে সংক্রামিত হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। অতএব শঙ্করা-চার্য্যের পক্ষে সমসাময়িক বৌদ্ধগণকে পরাজিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধদেব, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার সময়ে জীবিত থাকিলে এই দ্বন্দ্বের ফল কিরূপ হইত তাহা অনুমানের বিষয় বটে। যাহাই হউক, তিনি যে ধর্ম্মমত প্রচার করিলেন তাহাও পরবর্ত্তী কালে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ আত্মা-পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মকে নামে মাত্র স্বীকার করিয়া তাঁহার তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়ই রাখিয়া গিয়াছেন। যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে প্রচলিত মতবাদ যথাসম্ভব কম পরিবর্ত্তিত করিয়া তিনি এক ছায়ামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, ইহাই মাত্র বলা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ ইহাই পরিবর্ত্তিত করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মমূর্ত্তি গঠিত করিয়া লইয়াছেন। এই অবসরে রাধিকা আসিয়া কৃষ্ণের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছেন। বঙ্গদেশে জয়দেবের কাকলিতে এই মধুর মিলনের সুর প্রথম ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ইহাতে সুর সংযোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক। জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্যদেবের সময় পর্য্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর বৈষ্ণবধর্ম্মের এবং বাঙ্গালা সাহিত্যেরও গঠনমূলক যুগ আখ্যায় অভিহিত হইতে পারে। এই সময়েই অনুবাদ-সাহিত্যের প্রারম্ভ সূচিত হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের প্রাথমিক ছড়াগুলিও এই সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে পদ্য-রচনার উন্নত-তর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ইহারা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চৈতন্যদেবের সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ইহা বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এখনও এত জটিলতার সমাবেশ রহিয়াছে যে, তাহা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া গ্রন্থ-রচনায় অগ্রসর হইলে নানাভাবে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। পূর্ব্বাচার্য্যগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে ভিত্তি গঠন করিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার উপরই নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। অতএব তাঁহাদের ঋণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমরা তাঁহাদের সময় হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে নূতন আবিষ্কার দ্বারা আমাদের জ্ঞানের পরিধি বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে, অতএব তাঁহাদের অভিমত আমরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলেও প্রভূত সম্ভ্রমের সহিতই বিবেচনা করিতে বাধ্য। কিন্তু যদি কোথাও ইচ্ছাকৃত সত্যের অপলাপ করিবার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়, তবে তাহা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করাই আমরা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তথাপি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত না হইলে কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ আমরা করিব না, কারণ আমাদের যাহা অভিমত তাহা যুক্তিসহ প্রদর্শন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, অহেতুক পরচর্চ্চা নহে। এইভাবে অগ্রসর হইলে পথ-ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

সাহিত্যের ইতিহাসের বিবিধ জটিলতার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে এখানে তাহাদের মধ্যে একটির সম্বন্ধে আলোচনা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করি। বিবিধ প্রাচীন পুঁথিতে গ্রন্থরচনার অথবা নকলের তারিখের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই দেশে শকাব্দা ব্যতীত মঘী-সন, ত্রিপুরাব্দ, মল্লাব্দ প্রভৃতি বহুবিধ অব্দের প্রচলন ছিল। ইহা ব্যতীত বঙ্গদেশে সাধারণতঃ বঙ্গাব্দই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন এই যে, কোনপ্রকার বিশেষ অব্দের উল্লেখ না থাকিলে রচনা বা নকলের যে সময়ের নির্দ্দেশ রহিয়াছে তাহা কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে? অর্থাৎ বিষ্ণুপুরে প্রাপ্ত কোনও পুঁথিতে যদি ১০৩০ সাল লিখিত থাকে তবে তাহা মল্লাব্দ কি বঙ্গাব্দ বলিয়া গণনা করা উচিত? সেইরূপ ত্রিপুরা বা চট্টগ্রামে প্রাপ্ত কোনও পুঁথিতে যদি মঘী সন বা ত্রিপুরাব্দের উল্লেখ না থাকে, তবে তাহা কি ভাবে গণনা করা সঙ্গত

বলিয়া বোধ হয় ? ইহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য আমরা প্রাচীন পুঁথির সাক্ষ্যের উপরেই নির্ভর করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। সকলেই অবগত আছেন যে, বিদ্যাপতির গ্রন্থগুলির রচনার তারিখ লক্ষ্মণ-সংবতে প্রদত্ত হইয়াছে। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী রাজার নিকট হইতে যে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দানপত্রের তারিখও "মালাব্দে" অর্থাৎ মল্লাব্দে লিখিত আছে। এখন চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরাতে প্রাপ্ত পুঁথিগুলির তারিখ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে—

১। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পুঁথিতে "সন ১১৯৭ মঘী" (বা-প্রা পু-বি, ১।১, পৃঃ ৯৮)

২। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত 'কেয়ামত নামা' পুঁথিতে "সন ১২১১ মঘি" (ঐ, ৯৮ পৃঃ)

৩। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত "গীতাসার মহাযোগ" পুঁথিতে "সন ১১৮৭ মঘি" (ঐ, ২৫ পৃঃ)

৪। ত্রিপুরাতে প্রাপ্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিতে "সন ১২০৪ ত্রিপুরাব্দ" (সাঃ-পঃ-পু সং ১৫১)

৫। ত্রিপুরাতে প্রাপ্ত সঞ্জয়ের মহাভারতের পুঁথিতে "সন ১২২৩ ত্রিপুরাব্দ" (সাঃ পঃ পু সং ১৭২)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শকাব্দা অথবা বঙ্গাব্দের উল্লেখ যখন করা হয় নাই তখন স্পষ্টভাবে বিভিন্ন অব্দের উল্লেখ করিয়া লেখকগণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বিবেচিত হইবে, কারণ যেখানে একাধিক অব্দের প্রচলন রহিয়াছে সেখানে বিশেষরূপে কোনও অব্দের উল্লেখ না করিলে ভ্রান্তি উৎপাদিত হইতে পারে। ইহা লেখকগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বিশেষ বিশেষ অব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যেখানে স্পষ্টভাবে কোনও বিশেষ অব্দের উল্লেখ না থাকিবে সেখানে এই দেশ-প্রচলিত বঙ্গাব্দ বলিয়াই তাহা গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, নতুবা কাল-নির্ণয়ের কোন সঠিক নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে না। খেয়ালবশে মল্লাব্দ বা ত্রিপুরাব্দের কল্পনা করিলে তাহাতে অরাজকতা সৃষ্টি হয় মাত্র। বিশেষতঃ

যখন এই সকল তারিখের উপর নির্ভর করিয়াই কবির আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে ধারণায় উপনীত হইতে হয়, তখন কোন স্থির পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই কাল-নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত, নতুবা যে কিরূপ ভ্রান্তির উৎপত্তি হইতে পারে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন কোন পুঁথি বিষ্ণুপুরে লিখিত হইয়াছে এবং তাহাতে মল্লাব্দই প্রদত্ত হইয়াছে, অথচ তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। পুঁথি নানা কারণেই একস্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হইতে পারে। এইরূপে এই পুঁথিখানি যদি পূর্ব্ববঙ্গে স্থানান্তরিত হয়, তাহা হইলে সেখানের লোকেরা এই তারিখকে বঙ্গাব্দ বলিয়াই গ্রহণ করিবে। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যে সকল পুঁথি সংগৃহীত আছে তাহা প্রথম কোথায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার সুযোগ অনেক পাঠকেরই হইতে পারে না। এই অবস্থায় মল্লাব্দকে বঙ্গাব্দ বলিয়াই গ্রহণ করা স্বাভাবিক। এই ধারণা লেখকগণের ছিল বলিয়াই তাঁহারা বিশেষ বিশেষ অব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অতএব আমাদের খেয়ালবশে যে কোন অব্দের কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথির প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, বোধিচর্য্যাবতারের তারিখ বিক্রমাব্দে, শূদ্রপদ্ধতির সংবতে, এবং হরিবংশ, মহাভারত ও ধর্ম্মরত্নের তারিখ শকাব্দায় লিখিত রহিয়াছে। যে দেশে এইরূপ বিভিন্ন অব্দের প্রচলন রহিয়াছে, সে দেশে স্পষ্ট নির্দ্দেশ প্রদানের জন্য এই জাতীয় উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের যে ১৬ পত্র কৃষ্ণপঞ্চানন ঠাকুর বিষ্ণুপুর-রাজগ্রন্থাগার হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার স্মারকপত্রে সন ১০৮ (?) লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরে লিখিত হইলেও স্পষ্ট নির্দ্দেশের অভাবে ইহাকে মল্লাব্দ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে কি? এই সকল বিষয়ে অহেতুক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্পষ্ট উল্লেখের উপর নির্ভর করিলেই প্রকৃত সত্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে পারা যায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

লিপিতত্ত্ব

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে—

১। Buhler's Indian Palæography, (Eng. Ed.)

২। Cunningham's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I.

৩। R. D. Banerji's The Origin of the Bengali Script.

৪। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"।

৫। বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড।

৬। বিশ্বকোষ।

৭। গৌড়লেখমালা, ইত্যাদি।

লিপিতত্ত্ব

লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনায় আধুনিক বঙ্গলিপির উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে ইহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোক তাঁহার অনুশাসনগুলি প্রস্তর-স্তম্ভে এবং পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে যে লিপি ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহাই এ পর্য্যন্ত ভারতের প্রাচীনতম লিপির নিদর্শনরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছিল। ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লিপির সন্ধান কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অশোক-অনুশাসনের লিপিই সাধারণতঃ আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করা হয়। এইজন্য অশোক-লিপির ক্রমিক পরিবর্ত্তনে কিরূপে বঙ্গলিপির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিতে সকলে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু মানবের অনুসন্ধিৎসা ইহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। অশোকের পূর্ব্বে কি ছিল তাহা জানিবার জন্য মনীষিগণ অতীতের অন্ধতম গুহায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলে যে সকল বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এখানে সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল।

ভারতীয় লিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে। সেই সময়ে পরিজ্ঞাত ভারতের প্রাচীনতম ব্রাহ্মী-লিপি অবলম্বনে আলোচনা করিয়া অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, খৃঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবসী লিখন-প্রণালী অবগত ছিল না। মোক্ষমুলার[১], বেবর[২], বুলার[৩] প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে ভারতীয়-লিপি ফিনিসীয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মীলিপি আসীরিয়া ও বাবিলোনিয়ার বাণমুখ বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

১। Ancient Sanskrit Literature, 2nd Ed, P. 521.
২। C. I. I., Vol. 1, P. 52.
৩। Indian Palæography, Eng. Ed., P. 9.

বার্ণেলের মতে ফিনিসীয়, পারস্য অথবা বাবিলোনিয়ার আরামীয়-লিপি হইতে ব্রাহ্মী-লিপির উদ্ভব হইয়াছে। প্রিন্সেপ, সেনার্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে ব্রাহ্মীলিপি গ্রীক-বিজয়ের চিহ্ন[১]। অপর পক্ষে টমাস সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছেন, "The Indian Alphabet is an independently devised and locally matured scheme of writing", অর্থাৎ ভারতবাসীরা নিজেরাই স্বাধীনভাবে লিপিবিদ্যার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, এবং ইহা তাহাদের দ্বারাই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। কানিংহামও বলিয়াছেন,—The Indian Pali Alphabet was a prefectly independent invension of the people of India", অর্থাৎ ভারতীয়-লিপি ভারতবাসীর দ্বারাই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে উদ্ভাবিত হইয়াছে[২]। অশোক লিপির বর্ণগুলি সুগঠিত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। কিরূপ আদর্শের ক্রমিক পরিবর্ত্তনে ঐ সকল বর্ণ গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন ভারতে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া নানা প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পাতে ভারতের সুপ্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হওয়াতে এই সকল যুক্তিতর্কের সম্পূর্ণ অবসান হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। ভারতবর্ষে যে খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে লিপি-বিদ্যার প্রচলন ছিল না—ইহা বলিতে এখন আর কেহ সাহস করিতে পারেন না। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধু-দেশীয় এই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। অতএব সেই সময়েও যে ভারতে লিপি-বিদ্যার প্রচলন ছিল তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বুলার সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, পারসিক, আরামীয়, এবং ফিনিসীয় প্রভৃতি লিপি খৃঃ পূঃ অষ্টম বা দশম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল, আর তাহা হইতে হিন্দুগণ প্রায় খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে তাহাদের বর্ণমালার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন[৩]। কোন

১। বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১১।

২। C. I. I., Vol. 1, P. 52.

৩। Indian Palæography, Eng. Ed. pp. 15-17.

সুপ্রাচীন লিপির আদর্শ আবিষ্কৃত না হওয়াতেই এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু এখন সৈন্ধবী লিপি আবিষ্কৃত হওয়াতে এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এই লিপির এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই, কিন্তু ইহার আকৃতিপ্রকৃতি দৃষ্টে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সৈন্ধবী চিত্র-লিপির ক্রমিক পরিবর্ত্তনেই প্রাচীন ব্রাহ্মী-লিপির উদ্ভব হইয়া থাকিবে [১]। তথাকথিত পারসিক, আরামীয় বা ফিনিসীয় সভ্যতার নিদর্শন খ্রীষ্টের জন্মের চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাওয়া যায় না বলিয়া এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত যে, ভারতে লিপি-বিদ্যার প্রচলন ঐ সকল সভ্যতার বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ফিনিসীয় লিপি হইতে ভারতীয় লিপির উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। এই ফিনিকগণের সন্ধান আমাদের সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়। সেখানে ইঁহাদিগকে পণি নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহারা প্রাচীন গ্রীক ও জার্ম্মাণ-দের নিকট ফোনিক বা ফণিক নামে পরিচিত। এই ফনিক শব্দ হইতে পরবর্ত্তীকালে বণিক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য পণি শব্দের বণিক অর্থ করিয়াছেন, এবং পাণিনির উণাদিসূত্র অনুসারে পণ ধাতু হইতে বণিক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অপর কারণ এই যে, পণিগণই আদি বণিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ঋগ্বেদের যুগে দেখা যায় যে, পণি নামক এক ধনবান্ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সমুদ্রোপকূলে ও নদীতীরে বাস করিতেন। তাঁহারা নৌকা ও অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিতেন, এবং পোতারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিতেন। ইঁহারা গোপালনবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, এবং দুগ্ধ হইতে নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানিতেন। তারপর বৈদিক আর্য্যগণের সহিত ইঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহারই ফলে তাঁহারা কেহ দাক্ষিণাত্যে, কেহ আফগানিস্থানে, পারস্যে, আরবদেশে, ও তথা হইতে ফিনিসীয়ায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। অতএব এই ফিনিক বা পণিগণ ভারতবর্ষেরই আদিম অধিবাসী ছিলেন।

১। বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২০।

এইজন্যই বোধ হয়, খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দে হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন যে, ইঁহারা পারস্যোপসাগরকূলে বাস করিতেন। আবার কেহ কেহ এরূপও লিখিয়াছেন যে, আফগানিস্থানেই ইঁহাদের আদি বাসভূমি ছিল। যাহাই হউক, ইঁহারা যে প্রাচ্যদেশের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই[১]।

এই বণিকগণ যে বৈদেক আর্য্যগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাহাও জানা যাইতেছে। অতএব তাঁহাদের মধ্যে যে কৃষ্টির আদানপ্রদান হইয়াছিল তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। এইজন্যই ব্রাহ্মী বর্ণমালার সহিত কোন কোন ফিনিসীয় অক্ষরের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দ্রষ্টব্য এই যে, ফিনিসীয় বর্ণমালায় অক্ষর সংখ্যা অতীব কম। ইহা এত অসম্পূর্ণ যে, বৈদিক বর্ণমালার সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। অতএব ভারতের আদিম অধিবাসী এই বণিকগণ যে স্থানত্যাগের পরে ভারতীয় বর্ণমালা আংশিকভাবে ব্যবহার করিতেন, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

বিশেষতঃ অতি প্রাচীনকালেও যে ভারতে লিপি বিদ্যার প্রচলন ছিল তাহা আমাদের সুপ্রাচীন গ্রন্থসমূহের উল্লেখ হইতেও বুঝিতে পারা যায়[২]। পাণিনি লিপি, লিবি, লিপিকর, গ্রন্থ, বর্ণ, অক্ষর প্রভৃতি বহুতর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং "শিশুক্রন্দীয়" ও "যমসভ" নামক দুইটি লিখিত গ্রন্থেরও উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি মাহেশ্বর সূত্রের উল্লেখ করিয়া বর্ণপাঠের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। অতএব এই ব্যাকরণ পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাতে বুঝা যায় যে, সেই প্রাচীন কালেই ভারতীয় বর্ণমালা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। বর্ণজ্ঞান অর্থে লিখন, পঠন উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ইহার ব্যতিক্রম হইত, তাহা ধারণা করা যায় না। ৬০ম সূত্রে পাণিনি লোপের সংজ্ঞা দিয়াছেন—"লোপোঽদর্শনম্", অর্থাৎ কোন বর্ণের অদর্শনকে লোপ বলা হয়। বর্ণ লিখিত না হইলে তাহার অদর্শনের অর্থ হয় না। এই প্রকার লোপের সূত্র বৈদিক প্রাতিশাখ্যগুলিতেও

১। বিশ্বকোষ, ১৭শ খণ্ড, ৫৯৪ পৃঃ; বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, ৫৫৫—৬ পৃঃ হইতে সঙ্কলিত।
২। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বিশ্বকোষের "বর্ণলিপি" শব্দে, এবং বঙ্গীয় মহাকোষের "অক্ষর" শব্দে দ্রষ্টব্য। এখানে তাহাদের অতি সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলিত হইল মাত্র।

দৃষ্ট হয়, যথা—"লোপ উদঃস্থান্তম্ভোঃ সকারস্য" (অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য, ২।১।১, বাজসেনয়প্রাতিশাখ্য, ৪।৯৫, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, ৫।১৪)। অন্যত্র—"অন্তস্থোষ্মসু লোপঃ" (ঋক্প্রাতিশাখ্য, ৪।৫, ইত্যাদি)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ইন্দ্রকে আদি ব্যাকরণকার বলা হইয়াছে, যথা—"ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ, পদের প্রকৃতি স্পষ্ট করিয়াছিলেন।" ইহা ব্যাকরণের কার্য্য, অতএব ব্যাকরণ যখন ছিল, তখন লিখিত ভাষার অস্তিত্বে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পাণিনি তাঁহার ঐ প্রকাণ্ড গ্রন্থ কেবল মুখে মুখেই রচনা করিয়াছিলেন, ইহা ধারণার অতীত। পরে গুরুর নিকট শুনিয়া শিষ্য শিক্ষা করিতে পারে বটে, কিন্তু গ্রন্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বেদের সূত্রগুলি পৃথক্‌ভাবে রচিত হইতে পারে, কিন্তু যখন তাহারা সংহিতাকারে সংগৃহীত হইয়াছিল, তখনই গ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এই সকল কারণে ভারতে যে কোন প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। অধুনা সৈন্ধবী লিপির আবিষ্কারে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিবিধ বস্তুর প্রতীক এক একটি চিত্র হইতে প্রাথমিক লিপিবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল। মেক্সিকো দেশের চিত্র-লিপি এই পর্য্যায়ভুক্ত। প্রাচীন মিশরীয় লিপিতে এই প্রথার উন্নততর অভিব্যক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়, অর্থাৎ সমগ্র বস্তুটি চিত্রিত না করিয়া ইহার অংশ বিশেষের দ্বারাই বস্তুটি লক্ষিত হইয়াছে দেখা যায়, যেমন মানুষের মস্তকের চিত্র দ্বারাই মানুষ বুঝান হইয়াছে। এইরূপ চিত্রদ্বারা যাবতীয় মনের ভাব প্রকাশ করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ইহার প্রতীকার কল্পে পরবর্ত্তীকালে এক একটি চিত্রের ধ্বন্যাত্মক মূল্য নির্দ্দেশিত হইয়াছিল, যেমন মিশরীয় ভাষায় মুখের প্রতিশব্দ রু, অতএব মুখের চিত্র দ্বারা র বর্ণ লক্ষিত হইত। উক্ত ভাষায় গুহার প্রতিশব্দ নেব। অতএব গুহার চিত্র দ্বারা ন বর্ণ বুঝান হইত। এইরূপ সাঙ্কেতিক লিপি হইতে মিশরদেশে বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছিল।[১]

১। Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I., pp. 52-55.

ভারতবর্ষেও স্বাধীনভাবে বিবিধ বস্তু-চিত্র হইতে বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহার প্রাচীনতম মহেঞ্জোদারোর মুদ্রালিপি এইরূপ—

মুদ্রা নং ৩২৪— [১]

এই লিপির এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই, তথাপি এই চিত্র হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বিবিধ বস্তুর সাঙ্কেতিক প্রতীক হইতে এই বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে। পরবর্ত্তী অশোক লিপিতে ইহার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় আলোচনা এখানে সন্নিবিষ্ট হইল[২] :—

সং—কর্ত্তার (কাটারী)		হইতে অশোক লিপির		= ক
সং—খন্ ধাতুজাত খনন যন্ত্র		হইতে অশোক-লিপির		= খ
সং—গগনের চিত্র		হইতে অশোক-লিপির		= গ
ধনুর চিত্র		হইতে অশোক লিপির		=ধ
বাড়ীর চিত্র			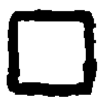	= ব
মৎস্যের চিত্র				= ম
তালপত্রের চিত্র				= ত
বীণার চিত্র				= ব
রশ্মি বা রজ্জুর চিত্র	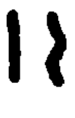			=র

অশোক-লিপির ল এবং হ একই চিত্রের বিপরীত পরিস্থিতিতে উৎপন্ন হইয়াছে, যথা— =ল ; =হ, অর্থাৎ বামাবর্ত্তে ল, এবং দক্ষিণাবর্ত্তে হ। এই চিত্রটি লাঙ্গলের রেখা চিত্র মাত্র, এবং লাঙ্গলের অপর প্রতিশব্দ হল। একই বস্তুর দুইটি প্রতিশব্দ হইতে এইরূপ দুইটি বর্ণের উদ্ভব

১। Indus Civilisation, Plate CXIX.

২। C. I. I. Vol. I, Plate XXVIII.

হওয়াতে বস্তুচিত্র হইতেই যে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব হইয়াছিল, এই ধারণাই সমর্থিত হইতেছে।[১]

অশোকলিপির জ, ঘ, এবং য, এই তিনটি বর্ণে সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। সংস্কৃত "জঘন" হইতে ইহাদের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে।[২] দক্ষিণমুখী হইলে জ, ঊর্দ্ধমুখী হইলে য এবং ঘ, অথচ এই তিনটি বর্ণের রেখাচিত্র এমন বিশিষ্টতা সম্পন্ন যে, সহজেই একটিকে অপরটি হইতে পৃথক্ করিয়া পাঠ করা যায়। যবের রেখাচিত্র হইতেও য বর্ণের উৎপত্তি কল্পিত হইতে পারে। অশোক-লিপির ঠ একটি ক্ষুদ্র বৃত্তদ্বারা লিখিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় ঠ বর্ণে চন্দ্রমণ্ডল, এবং শূন্য উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। ইহাদেরই রেখাচিত্র হইতে ঐ ক্ষুদ্র বৃত্তের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার থ বর্ণ বুঝাইতে উক্ত বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে একটি বিন্দু স্থাপন করা হইয়াছে। সংস্কৃতের থ অনেক স্থলে প্রাকৃতে ঠ'তে পরিণত হয়, যেমন—সং-স্থান = প্রাঃ—ঠাণ। কেবল বিভিন্নতা রক্ষার্থে মধ্য-বিন্দুটি স্থাপন করা হইয়াছে মাত্র। এইরূপ কৌশল ন এবং ণ বর্ণদ্বয়েও লক্ষিত হয়। এইরূপে বিবিধ বস্তুর চিত্র হইতে অশোকলিপির উদ্ভব হইয়াছিল। প্রসিদ্ধি এই যে, ব্রহ্মা ইহার আদি প্রবর্ত্তক, এইজন্য এই লিপির অপর নাম ব্রাহ্মীলিপি। আধুনিক ভারতের যাবতীয় লিপি ইহার ক্রমিক অভিব্যক্তিতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্রাহ্মী লিপির ক্রমিক পরিবর্ত্তনের চিত্র এখানে প্রদত্ত হইল।

১। C. I. I., Vol. I., P. 59, and Plate XXVII—III.

২। Ibid, p. 55.

বিবৃতি

অশোক-লিপি হইতে প্রধানতঃ টানা লেখার ক্রমে বর্ত্তমান বাঙ্গালা বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমতঃ ক অক্ষরটিই ধরা যাউক। অশোক-লিপিতে ইহার আকৃতি + এইরূপ। পরস্পর সমকোণে অবস্থিত এই দুইটি সরলরেখা যদি একটানে লিখিত হয়, তাহা হইলে ইহার আকৃতি + এইরূপ হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে কোন কোন স্থানে এইরূপ ক লিখিত হইয়াছে, এবং অনেক বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিতেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। লম্ব রেখাটির বামদিকের অংশ পরে ত্রিভুজাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং দক্ষিণ পার্শ্বের বর্দ্ধিত অংশ বক্র হইয়া পাল-লিপির ক উৎপন্ন করিয়াছে। ইহারই সুগঠিতরূপ আমরা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে, বিশ্বরূপ সেনের দান-পত্রে, এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে পাইয়া থাকি।

অশোক লিপিতেই খ অক্ষরের নীচে একটি ক্ষুদ্রবৃত্ত সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। কুষাণ-লিপিতে ইহা ত্রিভুজাকার ধারণ করিয়াছে, আর পাল-লিপিতে বামভাগের অংশ বক্র হইয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। বল্লাল-সেনের দানপত্রে ত্রিভুজের উপরের অংশ লম্বরেখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বামভাগের অবনমিত শেষ প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র ত্রিভুজের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই বাঙ্গালা খ এর আদিরূপ। ইহারই সংস্কৃত এবং সুগঠিত অভিব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে পাওয়া যায়।

গগনের চিত্রলিপি হইতে গ অক্ষরের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। কুষাণ লিপিতে ইহার বাম ভাগের শেষপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র সমান্তরাল রেখা দৃষ্ট হয়। পাল-লিপিতে দক্ষিণ ভাগে একটি লম্ব রেখার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালা গ-এর আদিরূপ। পরবর্ত্তী অভিব্যক্তিতে ইহার বিশিষ্ট সংস্করণ লক্ষিত হইবে।

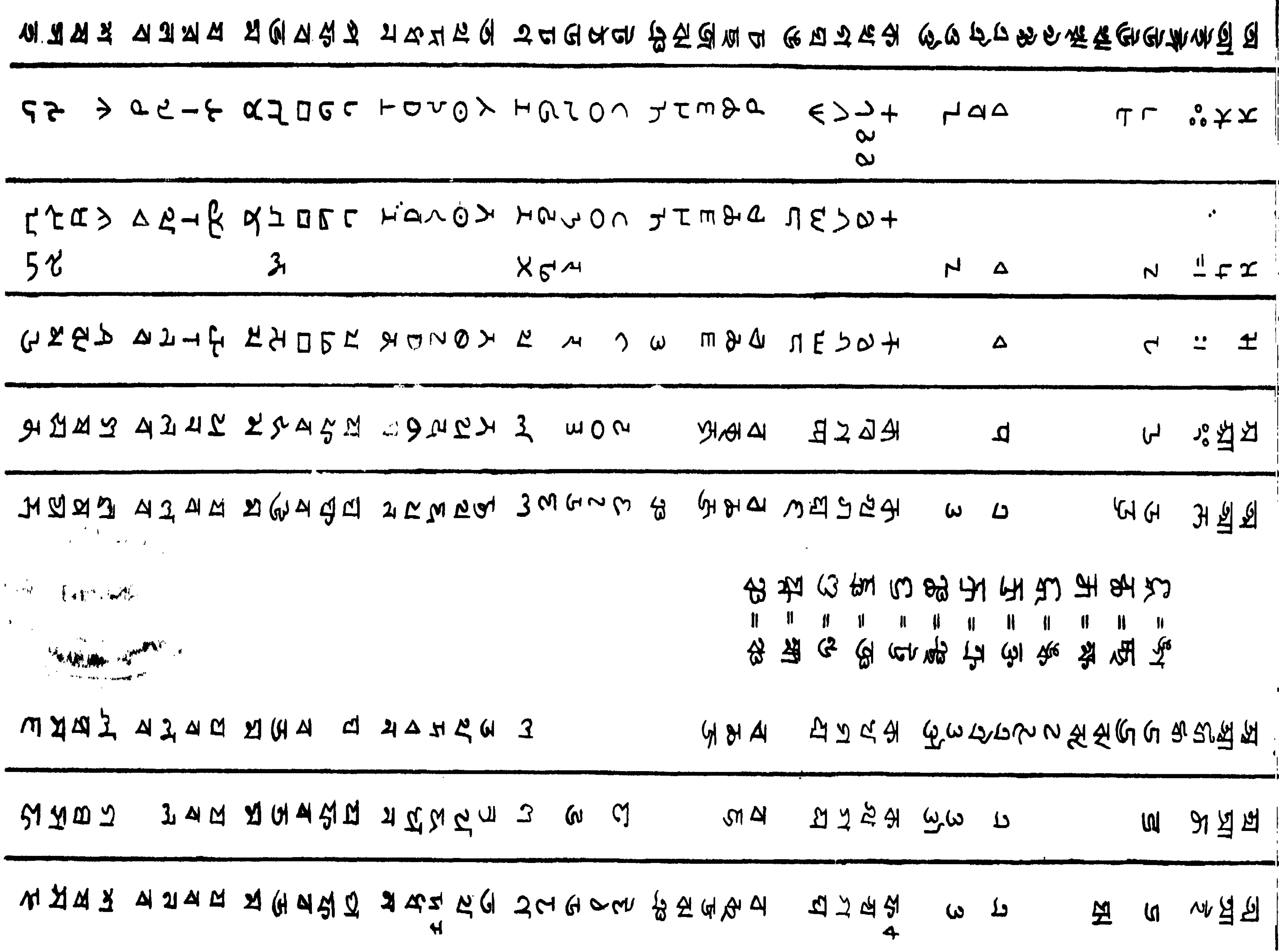

Row	Source
1	অশোক-লিপি খৃঃপূঃ তৃতীয় শতাব্দী (C.I.I., VOL. I, PLATE XXVII)
2	কুষাণ-লিপি — ১ম-২য় খৃঃ (C.I.I., VOL. I, PLATE XXVII) (BUHLER'S PLATE III, COL. III)
3	গুপ্ত-লিপি — খৃঃ ৪র্থ-৬ষ্ঠ (BUHLER'S PLATE IV, COL. I)
4	পাল-লিপি খৃষ্টীয় ৯ম-১০ম শতাব্দী
5	সেন-লিপি (১৩০৪ সনের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত বল্লালসেনের দানপত্রের প্রতিলিপি হইতে) (খৃঃ ১২শ শতাব্দীর প্রথম পাদ)
6	কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৯৯ সংখ্যক পুঁথি। ১১৯৮ খৃঃ লিখিত। (BUHLER'S PLATE VI, COL. X)
7	বিশ্বরূপ সেনের দানপত্র — FROM INSCRIPTIONS OF BENGAL, VOL. III
8	শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পুঁথি

অশোকলিপির ঘ-এর বামপ্রান্ত কুষাণ ও গুপ্তলিপিতে মাত্রাবিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পাল লিপিতে এই মাত্রা সমগ্র অক্ষরটির উপরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং নীচের অংশে অসম দুইটি ঘরের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই বাঙ্গালা ঘ-এর আদিরূপ। বল্লালী দানপত্রে মধ্যবর্ত্তী লম্ব রেখাটি সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী লিপিতে ইহারই সংস্কৃত রূপ দৃষ্ট হয়।

অশোকলিপির চ মাত্রাবিশিষ্ট হইয়া সামান্য পরিবর্ত্তনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের চ'তে পরিণত হইয়াছে। ইহারই পার্শ্বপরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান চ'এর উদ্ভব।

অশোক-লিপির ছ একটি লম্বরেখার দুইপার্শ্বে বিপরীত পরিস্থিতিতে স্থাপিত দুইটি চ-এর সমবায়ে গঠিত। বোধ হয় অল্প প্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ-বিশিষ্টতা প্রদর্শন করিবার জন্য এই কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছিল। কুষাণ লিপি হইতেই ইহা মাত্রাবিশিষ্ট হইয়াছে। পাল-লিপিতে ইহা ঈষৎ তির্য্যকভাবে কর্ত্তিত একটি বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু বল্লালী লিপি ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে প্রায় অশোক-লিপিরই অনুকরণ দৃষ্ট হয়। ছ-এর বর্ত্তমানরূপে চ-এর মহাপ্রাণত্ব বুঝাইবার জন্য শিরকর্ত্তিত একটি হ যুক্ত রহিয়াছে।

অশোক, কুষাণ ও গুপ্তলিপির জ প্রায় একই পর্য্যায়ভুক্ত। ইহা ইংরাজী বর্ণমালার বড় হাতের E অক্ষরের অনুরূপ। পাল-লিপিতে ইহার আধুনিক রূপ গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে দেখা যায় যে, উপরের সরল রেখাটি মাত্রায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আর মধ্যের রেখাটি নিম্নদিকে বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং সর্ব্বনিম্নের রেখাটি ঈষৎ বক্র হইয়া বাম দিকে হেলিয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তী অভিব্যক্তিতে ইঁহারই সংস্কার দৃষ্ট হইবে।

এইভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে অশোকলিপি হইতে বাঙ্গালা বর্ণমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। আধুনিক প্রাদেশিক বর্ণমালাসমূহ ব্রাহ্মী লিপি হইতে এক একটি বিশেষত্ব লইয়া গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের লিপিতে বৃত্তের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। বঙ্গলিপি সরল রেখা, ত্রিভুজ

ও বৃত্তাংশ লইয়া গঠিত হইয়াছে। ব, র, ক, ধ, ঝ, ঋ, খ, ত, থ প্রভৃতি বর্ণে এই বিশেষত্ব সুপরিস্ফুট।

অশোক-লিপিতে ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ যোগ করিবার যে কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে, তাহারই ক্রমিক অভিব্যক্তিতে বাঙ্গালা বানানের উদ্ভব হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র সরল রেখাকে বর্ণের ডাইন দিকে যুক্ত করিলে আকার, বামদিকে একার, উপরে ইকার, ঐরূপ দুইটিতে ঈকার, নিম্নে উকার, দুইটীতে ঊকার, এবং ডাইনে বামে উভয় দিকে থাকিলে ওকার বুঝিতে হয়। যথা— 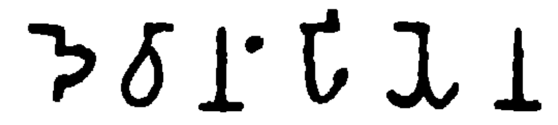 =দেবাণং পিয়েণ। এই সরল রেখাটি বর্ণের ডাইনে লম্বভাবে বর্দ্ধিত হইয়া বাঙ্গালা আকার, বামে অর্দ্ধবৃত্তাকারে স্থাপিত হইলে একার, উভয়ের সংযোগে ওকারের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ত্তমানকালের ইকার ও ঈকার বর্ণের বাম ও দক্ষিণভাগে স্থাপিত সরল রেখার উপরে অর্দ্ধবৃত্তের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ইহাদের বিভিন্নতাজ্ঞাপক পরবর্ত্তী অভিব্যক্তি মাত্র। উকার ও ঊকার বর্ণের নিম্নস্থ একটি ও দুইটি রেখার ক্রমিক পরিবর্ত্তনে উৎপন্ন হইয়াছে। দ্রষ্টব্য এই যে, এইরূপ কৌশল অবলম্বনে একমাত্র অবর্ণ দ্বারাই যাবতীয় স্বরবর্ণ লেখা যাইতে পারে। বস্তুতঃ নাগরী বর্ণমালায় অ, আ, ও, ঔ লিখিতে অ বর্ণকেই মূলরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্যামদেশের বর্ণমালায় একমাত্র অকার অবলম্বনে স্বরবর্ণগুলি লিখিত হয়।

অধুনা কোন কোন বর্ণে উকার সংযোগের কৌশল লক্ষণীয়। গুরু শব্দটি ধরা যাউক। গএর নিম্নভাগে ত-এর ন্যায় অংশটি পাল-লিপির উকারের নিম্নাংশ মাত্র। আর র-এর উকার অশোক-কুষাণ-গুপ্তলিপির উক্ত বর্ণের শেষের দিকের বর্দ্ধিতাংশের আধুনিক অভিব্যক্তি। ইহা হইতেই বিভিন্নতাসূচক উকারের (যেমন রূ প্রভৃতি বর্ণের) উৎপত্তি হইয়াছে।

যুক্ত ব্যঞ্জনের আদর্শও অশোক-লিপিতে মিলিয়া থাকে। যথা— —দ্বে, —মৃহি। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে বর্ণের নিম্নভাগে এবং পার্শ্বে অন্যবর্ণ স্থাপন করিয়া যুক্তাক্ষর গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালাতেও এই রীতি অনুসৃত হইয়া থাকে।

বঙ্গলিপিতে অনেক যুক্তবর্ণ নানাপ্রকার বিশিষ্টতা লইয়া গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অধুনা ষ এবং ণ-এর যুক্তবর্ণকে আমরা ষ্ণ এইরূপে লিখিয়া থাকি। কেশব-প্রশস্তিতে বিষ্ণু শব্দটি এইভাবে লিখিত রহিয়াছে— 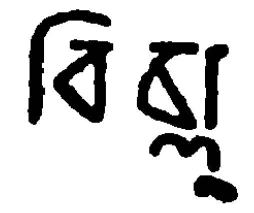 [১]। পাল-রাজগণের লিপি হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বল্লালী প্রভৃতি লিপিতে ণ বর্ণটি রূপে লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও ষ এর নীচে এই ণ যুক্ত রহিয়াছে। এই দুইটি অক্ষর পৃথক্‌ভাবে না লিখিয়া একটানে লিখিত হইলে এইরূপ হয়। ইহাই পরবর্ত্তীকালে এবং ষ্ণ-তে পরিণত হইয়াছে।[২] বর্ণের দক্ষিণপার্শ্বস্থ ও জাতীয় চিহ্নটি প্রাচীন ণ-এর রূপভেদ মাত্র, ষ-এর নিম্নভাগ হইতে পার্শ্বে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে।

অশোক ও কুষাণ লিপির ঞ এইরূপ । গুপ্তলিপিতে ইহা ও এই রূপ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু বল্লালীলিপিতে ব্রাহ্মী অক্ষরের বামভাগের লম্ব-রেখাটি যোগ করিয়া ইহাকে ঞ এইরূপ প্রদান করা হইয়াছে। অধুনা জ এবং ঞ সংযুক্ত বর্ণটি জ্ঞ রূপে লিখিত হয়। জ-এর বামাংশের সহিত ঞর দক্ষিণাংশ, যোগ করিয়া এই বর্ণ গঠিত হইয়াছে।

এখন ঞ এবং চ সংযুক্ত বর্ণটি ঞ্চ রূপে লিখিত হয়। বল্লালী লিপিতে ইহার আকৃতি এইরূপ। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, অশোক-লিপির চএর উপরে ঞ স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালের ষ্ণ এবং ঞ্চ-এর আকৃতিগত বিভিন্নতায় ইহাদের উৎপত্তির ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

বর্ত্তামানকালে হ ও ম সংযুক্ত অক্ষরটি হ্ম এইরূপে লিখিত হয়। বল্লালী লিপিতে ইহাকে এইভাবে পাওয়া যায়। উক্ত লিপির হ এইরূপ । ইহার নিম্নভাগে যে ম সংযুক্ত করিয়া এই যুক্তবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ইহার বর্ত্তমান

১। গৌড়লেখমালা, ১ম স্তবক, ২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিলিপি হইতে।

২। বঙ্গীয় মহাকোষ, ২১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রূপে হ এর লেজটি অক্ষরটিকে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে নিম্নদিকে প্রসারিত রহিয়াছে। বামদিকের পরিবর্ত্তন টানা লেখার প্রভাবজাত পরবর্ত্তী সংস্কার মাত্র।

এখন ক্ ও ষ সংযুক্ত বর্ণ টি ক্ষ রূপে লিখিত হয়। বল্লালী লিপিতে ইহার রূপ এই প্রকার। কুষাণ ও গুপ্ত-লিপিতে খ এইরূপে লিখিত হইত। ইহার মধ্যস্থানে অশোক লিপির (ক) এর সমান্তরাল রেখাটি যুক্ত করিয়া বল্লালী লিপির ক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। এই লিপিতে ক-এর রূপ এই প্রকার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে ডাইন পার্শ্বের বর্দ্ধিত অংশটি সঙ্কুচিত হইয়া এইরূপ গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষ অক্ষরে ইহারই প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। ইহার বামদিকের অংশ টানা লেখার পরবর্ত্তী সংস্করণ মাত্র। বল্লালী লিপির ক্ষ-এর রূপ দেখিয়া বুঝা যায় যে, সেই সময়ে ইহা ক্‌খ-এর মত উচ্চারিত হইত। শিল্পী এইজন্য খ-এর উপরে ক স্থাপন করিয়াছেন।

এখন ঙ ও গ সংযুক্ত বর্ণ টি ঙ্গ এইরূপে লিখিত হয়। বল্লালী লিপিতে ইহার রূপ এইপ্রকার। ইহার নিম্নভাগের অংশটি অশোকলিপির গ-এর পরবর্ত্তী কুষাণ ও গুপ্তলিপির অভিব্যক্তিমাত্র। পরে নীচের বর্দ্ধিত বামাংশ টানা লেখায় স-এর আকৃতি গ্রহণ করিয়াছে। মাত্রার সহিত সংযুক্ত সঙ্কেতটি ঙ দ্যোতক।

এখন ক্ ও ত সংযুক্ত বর্ণ টি ক্ত এইরূপে লিখিত হয়। বাল্লালী লিপিতে ইহা এইরূপে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অশোক লিপির ক-এর নীচে ত যুক্ত রহিয়াছে। পরবর্ত্তী টানা লেখায় দ্বিত্ব ত-এর দক্ষিণ পার্শ্বে ক-এর সঙ্কেতরূপে ইহার ডাইনের বর্দ্ধিতাংশ মাত্র সংযুক্ত রহিয়াছে।

ক্ ও র সংযুক্ত বর্ণের বর্ত্তমানরূপ ক্র। বল্লালী লিপিতে ইহা এইভাবে লিখিত রহিয়াছে। ইহাতে অশোকলিপির ক-এর নীচে রফলা সংযুক্ত করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী অভিব্যক্তিতে কএর সমান্তরাল রেখার বামাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে মাত্র।

দ্বিত্ব ট অধুনা ট্ট এইভাবে লিখিত হইয়া থাকে। বল্লালী লিপিতে ট-এর নীচে এইরূপ একটি চিহ্ন দ্বারা দ্বিত্ব বুঝান হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত সেই আদর্শই অনুকৃত হইতেছে।

রেফ্ এবং র ফলা। উভয়ই অশোক-লিপির র। বর্ণের উপরে তির্য্যক্‌ভাবে স্থাপন করিয়া রেফ্ এবং নিম্নভাগে সমান্তরাল ভাবে স্থাপন করিয়া র ফলা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। ইহা প্রাচীন প্রথারই অনুকরণ মাত্র।

য ফলা ইহার বর্ত্তমান রূপও বল্লালী-লিপিতে পাওয়া যায়। অশোক-লিপির য এইরূপ । ইহাকে বর্ণের নিম্নভাগে স্থাপন করিয়া তখন যুক্তবর্ণ নির্দ্দেশিত হইত। এখন ইহার দক্ষিণ দিকের বক্র অংশ বাদ দিয়া ইহাকে বর্ণের পার্শ্বে স্থাপন করা হয়, এইমাত্র প্রভেদ।

বাঙ্গালা যুক্তবর্ণে ধ'এর রূপ পরিবর্ত্তিত হয়, যথা—দ্ধ ইত্যাদি। ইহাতে ধ'এর স্কন্ধস্থিত অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর পাল-লিপিতে ব্যবহৃত ধ'এর দক্ষিণাংশ টানা-লেখার প্রভাবে পরিবর্ত্তিত আকারে যুক্ত রহিয়াছে।

যুক্তবর্ণ হ্ন— 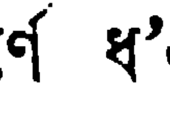 । ইহার সরলতা সম্পাদনের জন্য ণ'এর দক্ষিণাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং বক্রাংশের শেষ সীমায় একটি বিন্দুর আবির্ভাব হইয়াছে।

ম-ফলায় ম'এর বামভাগের উপরের অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণে লিপির প্রসারতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইংরাজগণ এখন এদেশের রাজা, এইজন্য এখানে ইংরাজী ভাষা ও লিপির প্রচলন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অশোক পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। তাঁহার অনুশাসনগুলি ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে তখন এই লিপিরই প্রচলন ছিল। কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন লক্ষিত হয়। পরবর্ত্তী কুষাণরাজগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী এই উভয় প্রকার লিপিই ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু গুপ্তরাজগণ প্রধানতঃ ব্রাহ্মী লিপিই ব্যবহার করিয়াছেন। সেই প্রাচীন যুগেই

এই ব্রাহ্মীলিপি ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া দুইটি বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। ইহারই ফলে পূর্ব্বাঞ্চলে আদি-বঙ্গাক্ষরের, এবং পশ্চিমাঞ্চলে আদি-নাগরী অক্ষরের উদ্ভব হইয়াছিল। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন[১]—"গুপ্তরাজগণের প্রাধান্যের সময় উক্ত পূর্ব্ববিভাগীয় লিপি এলাহাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত লাভ করিয়াছিল। ইঁহাদের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই লিপির প্রচলন ক্রমে ক্রমে সীমাবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে, এবং পশ্চিম বিভাগীয় আদি নাগরী লিপির প্রসারতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেই এই নাগরী লিপি পূর্ব্ববিভাগীয় আদি বঙ্গলিপিকে অপসারিত করিয়া কাশী পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত উভয় লিপিই মগধে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে মুসলমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের বাহিরে বঙ্গলিপির প্রচলন লক্ষিত হয় না।"

এইরূপে আদি বঙ্গলিপির প্রচলন ক্রমে ক্রমে সীমাবদ্ধ হইলেও ইহার পরিপুষ্টিলাভের ব্যাঘাত হয় নাই। একাদশ শতাব্দীতে ইহার অন্তর্গত প্রায় সকল বর্ণগুলিই গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, আর দ্বাদশ শতাব্দীর লিপিতে ইহাদের প্রায় পূর্ণ পরিপুষ্ট অবস্থাই লক্ষিত হয়। ইহার পরে মুসলমানগণের আগমনে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সাহিত্যচর্চ্চার অনুকূল হইতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে ১২শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত আমরা প্রায় উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থেরই সন্ধান পাই না। ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বোধির্য্যাবতারের পুথি, এবং চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে[২]। ইহাদের লিপিতে বঙ্গাক্ষরের প্রায় পূর্ণ পরিণত অবস্থাই লক্ষিত হয়। ১৭শ ও ১৮ শতাব্দীতে ইহাদের আর বিশেষ কোন্ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। তারপর ১৯শ শতাব্দীতে মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গাক্ষর বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়া স্থায়িত্ব লাভ

১। The Origin of the Bengali Script, by R. D. Banerji, pp, 2-6.

২। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রাচীনতম হস্তলিপির আদর্শ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের পঞ্চদশ শতাব্দীর পুথিও পাওয়া যায় নাই।

করিয়াছে[১]। অধুনা বিংশ শতাব্দীতে দ্রুত মুদ্রণের বিবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে প্রয়োজন বোধে কোন অক্ষর ও যুক্তবর্ণের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইয়াছে।

বঙ্গলিপির প্রচলন একদিকে খর্ব্ব হইলেও অপরদিকে ইহা আসাম, শ্রীহট্ট ও উড়িষ্যা দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আসামে বৈদ্যদেবের দান-পত্রে, এবং ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত বল্লভদেবের দানপত্র প্রভৃতিতে বঙ্গাক্ষরই ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের কেশবদেব এবং ঈশ্বরদেবের দানপত্রেও বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরে ভট্টভবদেবের অনন্ত বাসুদেব মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি আদি বঙ্গলিপিরই সাক্ষ্য প্রদান করে। আবার গঙ্গাবংশীয় দ্বিতীয় ও চতুর্থ নরসিংহ দেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত দানপত্রগুলিতে বঙ্গাক্ষরেরই ব্যবহার লক্ষিত হয়। আসাম ও উড়িষ্যাতে প্রচলিত বর্ত্তমান লিপি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গাক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে[২]।

ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক গুরুর নিকটে যে ৬৪ প্রকার লিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্গলিপিরও উল্লেখ রহিয়াছে[৩]। এখানে লিপি অর্থে ভাষাই লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অশোক উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে খরোষ্টী এবং ভারতের অন্যত্র ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সেই সময়ে ভারতে এই ব্রাহ্মী লিপিরই প্রচলন ছিল। ইহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস। অধুনা ভারতের প্রদেশগুলিতে যে বিভিন্নপ্রকার লিপির প্রচলন দেখা যায়, তাহারা সকলই সেই একমাত্র ব্রাহ্মীলিপি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। তখন অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার লিপি প্রচলিত থাকিলে অশোকের সময়ে তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইত, এবং পরবর্ত্তীকালে উদ্ভূত প্রাদেশিক লিপিগুলিতেও তাহার প্রভাব বর্ত্তমান থাকিত। বিশেষতঃ সেই

১। The Origin of the Bengali Script, by R. D. Banerji, pp. 3-4.
২। Ibid ,pp. 5-6.
৩। ললিতবিস্তর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সং, ১৪৩ পৃঃ।

প্রাচীনকালে লিপি প্রচলনের প্রাথমিক অবস্থায় পরস্পর নিকটবর্ত্তী অঙ্গে ও বঙ্গে বিভিন্ন প্রকার লিপি প্রচলিত থাকিবার কল্পনা করাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে ললিতবিস্তরের ঐ উক্তির সার্থকতা কি? অশোকের অনুশাসনগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব ভারতীয় প্রাদেশিকতায় র অক্ষরের প্রচলন ছিল না[১] এবং ইহার পরিবর্ত্তে ল অক্ষর ব্যবহৃত হইত, যথা—রাজ স্থানে লাজ, রোপপিত স্থানে লোপপিত, দশরথ স্থানে দসলথ, ইত্যাদি[২]। আবার স্বরপূর্ব্ব শব্দগুলিতে হ আগমের দৃষ্টান্তও লক্ষিত হয়, যথা—এবম্ স্থানে হেবম্, ইদম্ স্থানে হিদম্ ইত্যাদি। তুলনীয়—সং-ইহ=গীর্ণার ইধ=ধৌলী-হিদ। সং-ইহলৌকিক=ধৌলী-হিদলোকিক। আবার শব্দের আদিতে য অক্ষরের ব্যবহারও দৃষ্ট হয় না, যথা—গীর্ণারের যথা, যদা, যতা (সং-যত্র), যং স্থানে ধৌলীতে অথা, অদা, অতা, অম্ ইত্যাদি। সংস্কৃত মনুষ্যঃ শব্দ গীর্ণারে মনুসো, এবং ধৌলীতে মুনিসে রূপে লিখিত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বভারতীয় লিপি শিক্ষা করা অর্থে এই সকল শব্দের পরিবর্ত্তিত রূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা, এবং তদনুযায়ী অক্ষর বিন্যাসে তাহা প্রকাশিত করা। বুদ্ধদেব বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই ললিত-বিস্তরকারের উক্তির উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

১। C. I. I., Vol. I, pp. 44-46.

২। ঋগ্বেদেও এইরূপ পরিবর্ত্তনের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার প্রাচীনতম মণ্ডলগুলিতে ব্যবহৃত র পরবর্ত্তী মণ্ডলগুলিতে ল'তে পরিণত হইয়াছে। যথা—রম স্থানে লম, রোম স্থানে লোম, রোহিত স্থানে লোহিত ইত্যাদি।

ভাষাতত্ত্ব

যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে—

১। The Aryans by Childe.

২। An Introduction to Comparative Philology by Prof. P. D. Gune.

৩। Wilson Philological Lectures by Prof. R. G. Bhandarkar.

৪। The Philosophy of Sanskrit Grammar by Prof. Prabhat Chandra Chakrabarty.

৫। The Linguistic Speculations of the Hindus by Prof. P. C. Chakrabarty

৬। The Origin and Development of the Bengali Language, by Prof. S. K. Chatterjee.

৭। পালিপ্রকাশ by মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী। ইত্যাদি।

ভাষাতত্ত্ব

সাধারণতঃ যে সকল অর্থযুক্ত শব্দ দ্বারা আমরা মনের ভাব ব্যক্ত করি তাহাদের সমষ্টিকেই ভাষা বলা হয়, কিন্তু ব্যাপক অর্থে যদ্দারা মনের ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাই ভাষা। এই সূত্রানুযায়ী কণ্ঠ-নির্গত ব্যক্ত ও অব্যক্ত ধ্বনি, ভাব-প্রকাশক অঙ্গভঙ্গী বা সঙ্কেতাদিও ভাষা-পর্য্যায়ভুক্ত। কুকুরকে আঘাত করিলে ইহা করুণস্বরে চিৎকার করিয়া উঠে, আদর করিলে অব্যক্ত ধ্বনির সহিত আনন্দ প্রকাশ করে, আবার পরস্পরের সহিত যখন ইহারা বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তখন ক্রোধ-ব্যঞ্জক উচ্চ রব করে। এই সকল শব্দ দূর হইতে শুনিয়াও ইহাদের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রাণী মাত্রেরই যে সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি প্রকাশ করিবার বিশিষ্ট ভাষা রহিয়াছে, তাহা তাহাদের পরস্পরের ব্যবহার হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এখানে মানুষের ভাষাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইহা সাঙ্কেতিক ও শাব্দিক, বা অনুচ্চার্য্য ও উচ্চার্য্য ভেদে দ্বিবিধ। অঙ্গভঙ্গী, হাবভাব, আকার-ইঙ্গিত, এবং মনোভাব-প্রকাশক চিত্রাদি সাঙ্কেতিক ভাষার পর্য্যায়ভুক্ত। অধুনা যুদ্ধ-পরিচালনায় হস্ত ও পতাকার বিবিধ প্রকার সংস্থান দ্বারা এই সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহৃত হয়। দূর হইতে কাহাকেও আহ্বান করিতে, অথবা দূরে বিতাড়িত করিতে আমরা হস্তের ইঙ্গিতেও মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকি, এবং মস্তক সঞ্চালনে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করি। অতএব সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত এখনও মানব-সমাজে পরিদৃষ্ট হয়। অপর পক্ষে উচ্চার্য্য বা শাব্দিক ভাষার পরমাণু কণ্ঠনির্গত ধ্বনি, এবং ধ্বনির সমবায়ে গঠিত অর্থযুক্ত শব্দ, শব্দ দ্বারা গঠিত বাক্য বা বাক্যসমষ্টি। ইহাও লিখিত ও কথিত ভেদে দ্বিবিধ। কথিত ভাষার অভিব্যক্তি কণ্ঠোচ্চারিত শব্দে, আর ইহাই লিখিত হইয়া সাহিত্যিক

রূপ পরিগ্রহ করে। এক একটি ধ্বনির দ্যোতক এক একটি বর্ণ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন, আর ইহাদের সমবায়ে শব্দের রূপ প্রত্যক্ষীভূত হয়। অতএব লিখিত ও কথিত ভাষা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। প্রকৃতিদত্ত শক্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে মানুষের ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনবোধে মানুষ বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। অতএব লিখন-প্রথা মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির সাক্ষ্য প্রদান করে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে ইহার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডার এখন লিপিবিদ্যার সাহায্যে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

যখন কণ্ঠোচ্চারিত ধ্বনির সমবায়েই ভাষা গঠিত হয়, তখন এই উচ্চারণ-রীতিই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি, তখন বায়ু দ্বারা ফুসফুস পরিপূর্ণ হয়। পরে ফুসফুস হইতে নির্গত বায়ু প্রথমতঃ কণ্ঠনলীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এখানে দুইটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আছে, তাহাদিগকে শব্দ-তন্ত্রী বলা যাইতে পারে, কারণ ইহাদের কম্পনেই ধ্বনির উৎপত্তি হয়। সাধারণ অবস্থায় আমরা যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বা পরিত্যাগ করি তাহাতে এই প্রকার কম্পনের অভাবে কোন ধ্বনিরই উৎপত্তি হয় না। কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় সময় সময় কণ্ঠ হইতে যে ধ্বনি নির্গত হয়, তাহা এই কম্পন-প্রসূত। এই ধ্বনি অব্যক্ত, কিন্তু বর্ণ আমাদের ইচ্ছাকৃত প্রয়াসে উচ্চারিত হয়। কণ্ঠনলী হইতে শ্বাস-বায়ু দুইটি পথে নির্গত হইতে পারে—নাসিকা ও মুখ। যখন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দুইটি সঙ্কোচিত-প্রসারিত না হইয়া লম্বভাবে অবস্থান করে, তখন নাসিকাপথে বায়ু নির্গত হয়। আমরা এইভাবে সাধারণতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ ঝিল্লিদ্বয় কণ্ঠের পশ্চাৎদিকে প্রসারিত হইয়া যখন নাসিকা-দ্বারে বায়ু নির্গমনের পথে বাধা জন্মায়, তখন শ্বাসবায়ু মুখবিবরে প্রবেশ করে, তৎপর ওষ্ঠ ও জিহ্বার সাহায্যে আমরা স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণগুলি উচ্চারিত করিয়া থাকি। যখন শ্বাস-বায়ু মুখবিবরে জিহ্বা দ্বারা বাধিত না হইয়া নির্গত হয়, তখন স্বরবর্ণ উচ্চারিত হয়। জিহ্বা বাধা দান করে না বটে, কিন্তু জিহ্বা ও ওষ্ঠের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে বিভিন্ন স্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অ, ই, উ

প্রভৃতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। অপরপক্ষে শ্বাস-বায়ু মুখ-বিবরের নানাস্থানে জিহ্বা দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া ব্যঞ্জন ধ্বনি উৎপন্ন করে। ক, চ, ট, ত, প ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। এই বাধার স্থান অনুযায়ী বর্ণগুলিকে বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—

কণ্ঠ্য—অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ

তালব্য—ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ

মূর্দ্ধন্য—ঋ, ৠ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ

দন্ত্য—ঌ, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স

ওষ্ঠ্য—উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম ইত্যাদি

এই বর্ণ-বিভাগে স্বরবর্ণগুলিকেও স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, স্বরবর্ণ উচ্চারণে যদিও জিহ্বা শ্বাস-বায়ুকে বাধা প্রদান করে না, তথাপি জিহ্বা ও ওষ্ঠের সঙ্কোচন ও প্রসারণে মুখবিবরের বিভিন্ন স্থান হইতে ঐ সকল বর্ণ উচ্চারিত হয়। সকল ব্যাকরণেই এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হইবে। বর্ণগুলি মিলিত হইয়া শব্দ, এবং শব্দের সমষ্টিতে বাক্য গঠিত হয়।

উচ্চারণের বিশিষ্টতার উপরেই বর্ণ এবং ভাষার প্রকারভেদ নির্ভর করে। আমাদের শব্দ-উচ্চারণের যন্ত্র কণ্ঠ, জিহ্বা, ওষ্ঠ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি প্রভৃতি। সকল মানুষ সমভাবে এই সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যত লোক তত বিভিন্নতা। এমন কি এক পরিবারবদ্ধ বিভিন্ন লোকের ভাষাও বিভিন্ন প্রকারের। প্রত্যেক লোকেরই কথা বলিবার একটি বিশিষ্ট স্থর আছে। আমরা ইহার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত আছি বলিয়াই কেবল কথা শুনিয়াই দূর হইতে বুঝিতে পারি কে কথা বলিতেছে। আকৃতি প্রকৃতি ও শক্তি-সামর্থ্যে ভগবান প্রত্যেক লোককেই অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা-সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন! বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া, এবং শিক্ষার তারতম্যে আমাদের এই বিভিন্নতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত।

হইয়া যাইতেছে। এই জন্য প্রত্যেক ভাষাই অবিরত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে, এবং ইহারই ফলে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। এক গোষ্ঠীভুক্ত লোকগণ যে ভাষায় কথা বলিয়া পরস্পরের সহিত সহজে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারে, তাহাই প্রাদেশিক ভাষা। ঐ গোষ্ঠীভুক্ত লোকগণের নিকটে ইহার বিশিষ্টতা ধরা না পড়িলেও, ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা ইহার বিভিন্নতা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এই জন্যই প্রত্যেক জনপদের ভাষার পার্থক্য অনুভূত হয়। অধুনা প্রদেশ-বিভাগে আমরা পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের ভাষার নামকরণ করিয়া লইয়াছি।

মানুষের এই ভাষার উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছে ইহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। ভগবান মানুষের ভাষা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, আর মানুষ তাহা ব্যবহার করিয়া ভাবের আদান-প্রদান করিতেছে, এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান-সম্মত নহে। ভগবান-প্রদত্ত ক্ষমতার ক্রমিক অভিব্যক্তিতে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই এখন ভাষাতাত্ত্বিকগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুদূর অতীতে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ এমন অবস্থায় ছিল, যখন তাহারা পশুর ন্যায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং পশু শিকার করিয়াই খাদ্য সংগ্রহ করিত। তখন পশুর ন্যায় দুই একটি অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াই তাহারা নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইত। কিন্তু মানুষে ও পশুতে প্রভেদ রহিয়াছে। সৃষ্টির আদি কাল হইতে ইতর প্রাণিগণ একই প্রথায় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোনই উন্নতি হয় নাই। পশুগণ এখনও গহন অরণ্যে অথবা পর্ব্বত-গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করে, আর পক্ষিগণ সেই প্রাচীন প্রথাতেই বাসা নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আদিম মানবগণ প্রকৃতিজাত লতাপাতার সাহায্যে বৃক্ষের উপরে নিরাপদ স্থানে আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিত, আর তাহাদের বংশধরগণ এখন সৌধপরিপূর্ণ সুরম্য নগরে বাস করে। মানুষের এই বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যেই তাহারা প্রয়োজনানুরূপ ভাষার সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। আদিম শিকারি-মানুষের ভাষার প্রয়োজনীয়তা অতি সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথমতঃ ইঙ্গিতে, তৎপর অব্যক্ত ধ্বনিতে

এবং পরে অল্পসংখ্যক শব্দেই তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু যখন তাহারা জীবনধারণের প্রধান উপায়রূপে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিল, তখন নূতন নূতন বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের ভাষার প্রসারতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কোন বস্তুর বিশিষ্টতা-জ্ঞাপক এক বা একাধিক শব্দ. দ্বারা হয়ত ঐ বস্তুটি নির্দ্দেশিত হইত, পরে একটি শব্দের অত্যধিক প্রচলন হেতু সেই শব্দটি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে বিভিন্ন নাম এবং সমনামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। বস্তুর সংখ্যাধিক্যে এবং ক্রিয়ার প্রকারভেদে ভাষার ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন আমরা বয়োজ্যেষ্ঠ লোকগণের নিকট হইতে ভাষা শিক্ষা করি। শিশু তাহার অনুকরণ বৃত্তির সাহায্যে ইহা ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে। শব্দগুলি যখন তাহার নিকটে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়, তখন সে কণ্ঠের কম্পন ও মুখের ভঙ্গী মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করে, এবং ইহাই অনুকরণ করিয়া তদনুরূপ শব্দের উচ্চারণে প্রয়াস পায়। তাহার প্রথম প্রচেষ্টায় শব্দগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় না বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে জিহ্বার জড়তা তিরোহিত হইলে সে সাধারণ মানুষের ন্যায়ই কথা বলিতে সক্ষম হয়। এই সময়ে প্রধানতঃ শ্রবণ-শক্তির তারতম্যের উপরেই শিশুর সফলতা নির্ভর করে। যাহারা বধির, তাহারা ধ্বনির স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না, অতএব বাক্‌যন্ত্র চালিত করিয়া অনুরূপ শব্দ উচ্চারণের প্রয়াস না করাতে বধিরেরাই বোবা হইয়া থাকে। কিন্তু জন্মান্ধ অপেক্ষাকৃত সহজে কথা বলিতে পারে। তারপর শিশু যাহা শোনে তাহাই আয়ত্ত করে। এইজন্যই বাঙ্গালীর সমাজে প্রতিপালিত শিশু বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু তাহাকে ইংরাজ পরিবারে রাখিয়া দিলে সে সহজেই ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতে পারিবে। ভারতপ্রবাসী ইংরাজ শিশুগণ মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আয়ার ভাষাও আয়ত্ত করিয়া থাকে। আবার এদেশে এমন বাঙ্গালীও আছেন, যাঁহারা অতি শৈশবে ইংলণ্ডে যাইয়া বাস করা হেতু বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন না। অতএব ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে সামাজিক পরিস্থিতির উপরেই নির্ভর করে। ভারতপ্রবাসী

পার্শিগণ ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ। এদেশে আসিয়া বাস করা হেতু তাঁহাদের মাতৃভাষার প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। মুসলমানগণের আগমনের পরে এদেশীয় ভাষার সহিত মিশ্রণে উর্দ্দু ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। এখন বিশেষ প্রচলন হেতু এই ভাষা ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান অনেকেরই মাতৃ-ভাষায় পরিণত হইয়াছে। আমরা যাহা শুনি তাহাই শিক্ষা করি, তাহাই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি। এইভাবে ভাষা রূপ পরিগ্রহ করে।

বাঙ্গালাভাষা বিবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রাচীন আর্য্যভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী ছিলেন না, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়া তাঁহারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই মতবাদই এখন প্রচলিত রহিয়াছে। আর্য্যগোষ্ঠী সুসভ্য এবং পরাক্রমশালী ছিলেন। প্রথমে তাঁহারা একই স্থানে বসবাস করিতেন, পরে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহারা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা, অতএব তাঁহাদের বিবরণ কোন লিপিবদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এইজন্য তাঁহাদের আদি বাসভূমি সম্বন্ধে নানা প্রকার কাল্পনিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এসিয়া ও ইউরোপের নানা স্থান, এমন কি মেরুপ্রদেশ পর্য্যন্ত এই আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল! লিখিত ইতিহাসের অভাবে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা এখন পণ্ডিতগণ একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর্য্যগণ যদি এক গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া পূর্ব্বে একই স্থানে বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিচ্ছিন্ন হইবার পরেও তাহাদের ভাষায় শব্দ-সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন আর্য্য ভাষা-জাত উপভাষাগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—১। আর্য্যভাষা (নামান্তরে ইন্দো-ইরাণীয়, অর্থাৎ সংস্কৃত ও আবেস্তার ভাষা), ২। আর্ম্মানীয়, ৩। গ্রীক (আইওনিক, এটিক, ডোরিক প্রভৃতি উপভাষা সহ), ৪। আল্‌বানীয়, ৫। ইটালীয় (লেটিন, ওস্‌কান, আমব্রিয়ান প্রভৃতি সহ), ৬। কেলটিক (আয়র্লণ্ড এবং স্কটলণ্ড প্রভৃতি দেশের ভাষা সহ), ৭। জার্ম্মেনিক (আইসলেণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ও ডেনমার্ক

প্রভৃতি দেশজ ভাষা সহ), ৮। বাল্‌তোশ্লাভিক (প্রাশিয়া, লিথুয়ানিয়া, লেটিক, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, চেক্ ও শ্লাভ ভাষা সহ)। ইহা ব্যতীত হিট্টাইট, মিট্টানি, তোখারীয় প্রভৃতি উপভাষাগুলিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এই ভাষাগুলির পরস্পরের সহিত যে শব্দ-সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল[১]—

সং—দেব ; লা—দেউস্ (deus) ; কেল—দিঅ (dia)।

সং—পিতর্ ; লা—ও গ্রী—পতের (pater) ; টিউ—ফদর ; ইং—ফাদার ;

সং—মাতর্ ; লা—মতের্ (mater) ; কেল—মথির্ (mathir) ; ইং—মাদার।

সং—ভ্রাতর্ ; গ্রী ও লা—ফ্রাতের ; কেল—ব্রথির ; ইং—ব্রাদার।

সং—দুহিতর্ ; টিউ—দোহ্‌টর ; আরমে—দুস্ত্র ; ইং—ডটার।

সং—স্বসর্ ; লা—সোরোর—(soror) ; কেল—সিউর (siur) ; টিউ—স্বিস্তর (svistar). লিথু—সেস্ত্র (sestra) ; ইং—সিষ্টার।

সং—পতি ; লিথু—পত্‌স (pats)।

সং—বিধবা ; লা—বিডুআ (vidua) ; টিউ—বিডুবো (viduvo) ; লিথু—বীদোব (vidova) ; ইং—উইডো (widow)।

সং—বিশ ; লা—বিকুস্ (vicus)।

সং—রাজন্, লা—রেক্‌স্ (rex) ; কেল—রি (ri)।

সং—শ্বন্ ; লা—কেনিস্ (canis) ; কে—কু (cu) ; টিউ—হুন্দস্ (hunds) ; ইং—হাউণ্ড।

সং—গো ; লা—বোস্ (bos) ; কেল—বো (bo) ; লিথু—গোবেদো (govedo) ; আরমে—কোউ (kow) ; ইং—কাউ (cow)।

সং—অশ্ব ; লা—ইকুয়াস্ (equus) ; কেল—এচ (ech)।

সং—পশু; লা—পেকুস্ (pecus) ; গথিক—ফাইখ্।

১। The Aryans by Childe, pp. 91—93.

সং—মধু; কেল—মিদ্ (mid); টিউ—মেতু (metu), লিথু—মেদু (medu); গ্রী—মেথু।

সং—অয়স্; লা—অয়েস্ (aės)।

সং—অসি; লা—এন্সিস্ (ensis)।

সং—রথ; লা—রোত (rota); কেল—রোথ্ (roth); টিউ—রড (rad); লিথু—রাতস্ (ratas)।

সং—নৌ; লা—নেবিস্ (navis); ইং—নেভি (navy)।

সং—অক্ষ; লা—এক্সিস্ (axis)।

সং—দম; লা—দোমাস্ (domus); শ্লাভ—দোম্ (গৃহ)।

সং—দ্বার; টিউ—দউর (daur); ইং—door.

সংখ্যাবাচক শব্দ[১]

সং—দ্বৌ; লা—দুও (duo); আই—দৌ (dau); লিথু—দু; গথিক—ত্বই (twai); ইং—টু (two)।

সং—ত্রয়ঃ; লা—ত্রেস্ (tres); আই—ত্রি (tri); ইং—থ্রি (three)।

সং—ষট্; লা—সেক্স্ (sex); আই—সে (se); ইং—সিক্স।

সং—সপ্ত; লা—সেপ্তেম (septem); ইং—সেভেন (Seven)।

সং—অষ্টৌ; লা—অক্টো (octo); ইং—এইট্ (Eight)।

সং—নব; লা—নবেম্ (novem); ইং—নাইন (Nine)।

সং—দশ; লা—দেকেম (decem); গথি—তেহুন (tehun); ইং—টেন (ten)।

সর্ব্বনাম[২]

সং—অহম্; লা—এগো (ego); গথিক—ইক (ik); ইং—আই।

১। The Aryans by Childe, p. 13.; An Introduction to Comparative philology by Gune, p. 91.

২। Gune, pp. 90—91.

সং—ত্বম্ ; লা—তু (tu) ; লিথু—তু (tu) ।
সং—সঃ ; লা—ইস্তে (iste) ; গথিক—স (sa) ।

ক্রিয়ারূপ[১]

সং—অস্মি ; লা—সুম (sum) ; আই—এম (am) ; গথিক—ইম (im) ; লিথু—এস্মি (esmi) ।
সং—অসি ; লা—এস্ (es) ; আই—এট (at) ; গথিক—ইজ (is) ।
সং—অস্তি ; লা—এস্ত (est) ; আই—ইজ (is) ; গথিক—ইষ্ট (ist) লিথু—এস্তি (esti) ।

এই জাতীয় সাদৃশ্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একগোষ্ঠিভুক্ত হইয়া পূর্ব্বে একই স্থানে বসবাস করিতেন, পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া নানাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের যাত্রা-পথের কিছু নিদর্শন ঐতিহাসিক আলোচনা হইতে মিলিয়া থাকে। জার্ম্মানির মধ্য-প্রদেশ হইতে এঙ্গোল ও সেক্সনগণের একটি শাখা ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, এবং অপর একটি শাখা ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে গমন করেন। অতএব এই কয়টি জাতির পূর্ব্ব বাসভূমি মধ্য-জারমেনিতেই ছিল আর একটি কেন্দ্র ছিল আলপস্ পর্ব্বতস্থ প্রদেশে। তথা হইতে কেল্টিকশাখা প্রথমতঃ ফরাসীদেশে, এবং তথা হইতে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড দেশে গমন করে, আর লাটিন শাখা প্রথমতঃ ইতালীতে উপনিবিষ্ট হয়, তৎপর শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা ফরাসী, স্পেন, পর্টুগাল ও রুমেনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করে। রোমকগণ যেখানে গমন করিতেন সেখানেই তাঁহাদের ভাষা প্রতিষ্ঠিত হইত। এই কারণে ফরাসীদেশ হইতে কেল্টিক ভাষা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু এখনও ইহা আয়র্লণ্ডে কথিত হয়। লাটিনের সহিত গ্রীকভাষার সাদৃশ্য দৃষ্টে ধারণা করা যায় যে, এই রোমক ও গ্রীকগণ পূর্ব্বে একই স্থানে

১। The Aryans by Childe, p. 13.

বাস করিতেন। বোধহয় দানিয়ুব নদীর তীরস্থ কোন স্থানে তাঁহাদের আদি বাসভূমি ছিল। তথা হইতে একদল গ্রীস ও এসিয়া মাইনরে, এবং অপরদল প্রথমতঃ আল্‌পপর্ব্বতে, এবং তথা হইতে ইতালী ও ফরাসীদেশে গমন করে। অতএব ইউরোপে দুইটি প্রধান কেন্দ্র পাওয়া যাইতেছে; একটি মধ্য-জার্ম্মানিতে, অপরটি দানিয়ুব নদীর তীরে। এখন ভারতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। বৈদিক সংস্কৃত ও আবেস্তার ভাষার সাদৃশ্য দৃষ্টে মনে হয় যে, বৈদিক আর্য্যগণ ও প্রাচীন পারসিকগণ পূর্ব্বে এক গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। বোধ হয় কাস্পিয়ান সাগর, উরলহ্রদ, বা পারশ্য ও আফগানিস্থানের উত্তরস্থ কোন স্থানে ইহাদের আদি বাসভূমি ছিল। তথা হইতে একদল পারস্যে, এবং অপর দল ভারতে প্রবেশ করে। কিন্তু বালতোশ্লাভ ভাষা সাতেম শাখার (পরে দ্রষ্টব্য) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এখন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাচীন ভারতীয় ও পারসিকগণের সহিত মধ্য রাশিয়ার কোন স্থানে বাস করিতেন। অতএব তিনটি প্রধান কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—মধ্য জার্ম্মানি, দানিয়ুবতীর, এবং মধ্য রাশিয়া। ইহাদের সমন্বয় করিলে বোধ হয় যে, কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে, অথবা হাঙ্গেরির উত্তর-পশ্চিম দিকে কোন স্থানে হয়ত আর্য্যগণের আদি বাসস্থান ছিল।

বাসভূমি যেখানেই থাকুক না কেন, ভাষা-তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা আদি আর্য্যসভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। উপরে বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত যে শব্দ-সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যগণ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি সমন্বিত পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। তন্মধ্যে পা ধাতু জাত পিতাই বোধ হয় পরিবারের রক্ষাকর্ত্তা বা প্রধান পুরুষ ছিলেন। দোহন করা অর্থে দুহ ধাতু জাত দুহিতা শব্দে কার্য্য-বিভাগ সূচিত হয়। বোধ হয় সেই সময়ে গোদোহনাদি কার্য্যের ভার কন্যাগণের উপরে ন্যস্ত ছিল। পিতৃব্য (=লা patruus), স্নুষা (লা nurus=টিউ Snura); শ্বশুর (=লা Socer); শ্বশ্রূ (=লা Soerus);

দেবর (=লা levir) ; জামাতা (=লিথু Zentas) ; জা (তু°-সং-যাতরস্ =লা—Janitrices) প্রভৃতি সম্বন্ধজ্ঞাপক শব্দ সাদৃশ্যে বোধ হয় বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা আর্য্যসমাজ অতিপ্রাচীন কালেই সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আর্য্যগণ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, এবং গৃহের অধিপতিকে দম্পতি বলা হইত (পরে এই শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে)।

তাঁহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল, এবং এক একটি দলকে বিশ্ বলা হইত, আর দলপতিকে বিশ্পতি (তু°—আবেস্তা—Vispaiti, লিথু—Wiesz—pats) বলিত। বিভিন্ন দল এক রাজার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন (তু°-সং—রাজন্=লা—Rex ইত্যাদি)। রাজ্য-শাসনের জন্য বোধ হয় সভারও অস্তিত্ব ছিল (তু°-সভা=গথিক—Sibja, জারমেন—Sippe)।

আর্য্যগণ পশুপালনেও দক্ষ ছিলেন। গো, অশ্ব, বরাহ, কুকুর, মেষ প্রভৃতি বহু পশু তাঁহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না (তু°—সং—শূকর, লা—sus, জার—sau ; সং—অবি, লা—ovis, টিউ—ou, ইং—ewe, ইত্যাদি)। পশুর মাংসও তাঁহারা অগ্নির সাহায্যে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন (তু°—সং—মাংস, গথিক—mimz ; সং—মজ্জা=আবেস্তা—mazga, টিউ—marg ; সং—পচ্=লা—coquo ; সং—অগ্নি=লিথু—ugnis=লা—ignis, ইত্যাদি)। মধু তাঁহাদের প্রিয় খাদ্য ছিল।

তাম্র ও লৌহ ধাতুর সহিত তাঁহারা পরিচিত ছিলেন, এবং তাহাদের সাহায্যে অস্ত্র—রথাদি প্রস্তুত করিতেন। আত্মার ধারণাও তাঁহাদের ছিল (তু°—সং—আত্মন্—টিউ—atum, atem)। তাঁহারা দেবগণের পূজা করিতেন (তু°—সং—দেব, লা—deus, লিথু—diewas)। বহু দেবতার মধ্যে প্রধান এক দেবতার ধারণাও তাঁহাদের ছিল (তু°—সং—দৌঃ পিতর্=লা—Juppiter)।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা এইরূপে আদি আর্য্য-সভ্যতার একটা ধারণায় উপনীত হওয়া যায়। এখন বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া আর্য্যগণ নানা দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছেন, এবং আচার ব্যবহারেও বিশেষ পার্থক্য

সূচিত হইয়াছে, এজন্য পরস্পরের জ্ঞাতিত্ব-সম্বন্ধ সহজে ধরিতে পারা যায় না, কিন্তু সুদূর অতীতে তাঁহারা যে একই গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া বাস করিতেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

উপরে যে শব্দ-সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে বর্ণবিন্যাসের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে। কিন্তু পণ্ডিতগণ গবেষণা করিয়া ইহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ আর্য্যভাষাগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সং—শতম্, আবেস্তা—সতেম, লিথু—সিম্‌তাস্ (Szimias), কিন্তু লা—কেন্তুম (centum), গ্রীক—হেকতোন (hekaton), কেলটিক—কেত্ (cet), তোখারীয়—কন্ধ্ (kandh), প্রাচীন কেন্ত (kent) হইতে খুন্দ হইয়া ইংরাজীতে হান্‌ড্রেড্ (hundred)। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সংস্কৃতের শ-কার লাতিন প্রভৃতি ভাষায় ক বর্গীয় বর্ণে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাকে সতেম্, এবং লাতিন প্রভৃতি ভাষাকে কেন্তুম্ বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। আর এই প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে ধারণা করা হইয়াছে যে, আদি আর্য্যভাষার শত-বাচক শব্দটি বোধ হয় "ক্যাম্‌-তোম্" রূপে বর্ত্তমান ছিল। পরে সংস্কৃতাদিতে এই "ক্য" ধ্বনি "শ" তে, এবং লাতিন প্রভৃতিতে ক-বর্গীয় বর্ণে পরিণত হইয়াছে। এই জাতীয় পরিবর্ত্তনের আরও দৃষ্টান্ত, যথা—সং—দশ, গ্রীক—দেক, লাতিন—দেকেম্ (decem), গথিক—তইখুন্ (taihun), ইং—টেন (ten)। ইহা হইতেও ধারণা করা হইয়াছে যে, মূল ভাষায় শব্দটি বোধ হয় "দেক্যম্" রূপে বর্ত্তমান ছিল। তু°—সং—বিংশতি=লা—বিগিন্তি (viginti); সং—বিশ=লা—বিকুস্ (vicus) ইত্যাদি।

তারপর গ্রিম সাহেব কর্ত্তৃকও ধ্বনি-পরিবর্ত্তনের একটি সূত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাঁহার নাম অনুযায়ী ইহা গ্রিমের সূত্র আখ্যায় অভিহিত হয়। সূত্রটি এই :—সংস্কৃত, লাতিন প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহৃত বর্গের প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণের স্থানে গথিক (জারমেনিক) প্রভৃতি ভাষায় যথাক্রমে দ্বিতীয়, প্রথম, এবং তৃতীয় বর্ণ ব্যবহৃত হয়। উদ্ধৃত একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক।

সং—দশ=লা—দেক, কিন্তু গথিকে তইখুন। কেন্তুম বর্গের অন্তর্গত বলিয়া লাতিনে ক-বর্গের প্রথম বর্ণ ক ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু গথিকে ইহা দ্বিতীয় বর্ণ (তইখুনের) খ'তে পরিণত হইয়াছে, আর (দেকের) তৃতীয় বর্ণ দ গথিকে প্রথম বর্ণ ত'তে পরিণত হইয়া তইখুন শব্দটি উৎপন্ন করিয়াছে। সেইরূপ সং—পশু=লা—পেকুস্, গথিকে ফাইখু। এখানেও প্রথম বর্ণ প এবং ক গথিকে যথাক্রমে দ্বিতীয় বর্ণ ফ এবং খ'তে পরিণত হইয়াছে। এই ফাইখু হইতে ইংরাজীতে ফি (fee) শব্দর উৎপত্তি। প্রাচীন কালে পশুই লোকের ধন-পর্য্যায়ে পরিগণিত হইত, এবং তাহার সাহায্যেই আদান-প্রদান চলিত। সেই প্রাচীন প্রথার নিদর্শন এখনও ভাষাতত্ত্বে মিলিয়া থাকে। এই জাতীয় আর একটি শব্দ গবেষণা, অর্থাৎ গো বা ধন অন্বেষণ।

এই জাতীয় পরিবর্ত্তনের আরও সূত্র একে একে উদ্ভাবিত হইয়াছে। যেমন সং—মধু=গ্রীক—মেথু; সং—ভ্রাতর্=গ্রীক—ফ্রাতের্ ইত্যাদি। ইহা হইতে ধারণা করা যায় যে, মুলের চতুর্থ বর্ণ গ্রীক ভাষায় দ্বিতীয় বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহা মূলানুরূপ রহিয়াছে, কারণ এই দুই শব্দের আদিরূপ ছিল মেধু এবং ভ্রাতের্।

আর একটি সূত্র এই—মুল শব্দে পর পর দুইটি চতুর্থ বর্ণ থাকিলে তন্মধ্যে প্রথমটি গ্রীক ও ভারতীয় ভাষায় তৃতীয় বর্ণে পরিণত হয়, যথা—মুল শব্দ ভেন্ধ=সং—বন্ধ=গ্রীক—পেন্থ; মুল—ভেউধ=সং—বুধ==গ্রীক—পেউথ, ইত্যাদি। এখানে মুল শব্দের চতুর্থ বর্ণ ভ সংস্কৃতে তৃতীয় বর্ণ ব'তে পরিণত হইয়াছে, আর গ্রীমের সূত্রানুযায়ী এই তৃতীয় বর্ণ ব গ্রীক ভাষায় প্রথম বর্ণ প হইয়াছে, এবং উপরের সূত্রানুযায়ী চতুর্থ বর্ণ ধ দ্বিতীয় বর্ণ থ'তে পরিণত হইয়া পেন্থ, পেউথ শব্দ উৎপন্ন করিয়াছে।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিলে স্বরবর্ণ পরিবর্ত্তনেরও সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। যখন দেখা যায় যে, মুলের মেধু=সং—মধু=গ্রীক—মেথু, এবং ভেন্ধ=সং—বন্ধ=গ্রীক—পেন্থ, তখন স্পষ্টই ধারণা জন্মে যে, মুলের একার সংস্কৃতে রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় ইহা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আবার ইহাও দেখা যায় যে, সংস্কৃত ও আবেস্তার অ, আ, অন্যান্য ভাষায় অ, আ, ই, ও, এ'তে পরিণত হইয়াছে, যথা[১]—

সং—অহম্, আবে—অজেম্=গ্রীক ও লাতিন—এগো, গথিক—ইক্, ইং—আই।

সং—অস্তি=লা—এস্তি, গথিক—ইস্ত।

সং—অবি=লা—ওবিস্।

সং—অষ্টৌ=লা—ওক্টো।

সং—দানম্=লা—দোনুম্।

সং—মাস=লা—মেন্সিস্ (mensis)। ইত্যাদি

এইরূপ বিবিধ পরিবর্ত্তনের সূত্র অবলম্বনে বিভিন্ন আর্য্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

এখন ইহার প্রাচ্য শাখার অর্থাৎ সংস্কৃত ও আবেস্তার বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। ইণ্ডো—ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতের সহিত আবেস্তার ভাষার নিকটতম সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে কোন সংস্কৃত শব্দ সামান্য পরিবর্ত্তিত হইলেই আবেস্তার ভাষায় পরিণত হইতে পারে, যথা[১]—

আবেস্তা :—তঅম্ অমবন্তঅম্ যজতঅম্। সূরঅম্ দামোহু সঅবিষ্টঅম্।

সংস্কৃত :—তং অমবন্তং যজতম্। সূরং ধামসু সবিষ্টম্।

আবেস্তার বিশেষত্ব এই :—

ম্'এর পূর্ব্ববর্ত্তী অকার হ্রস্ব আ'এর মত উচ্চারিত হয়। উপরের দৃষ্টান্তে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই উচ্চারণটি মূল ইণ্ডো—আরমেনিক ভাষা হইতে আসিয়াছে। সংস্কৃত ও আবেস্তায় ইহা ইকারে এবং লাতিন প্রভৃতি ভাষায় অ-কারে পরিণত হইয়াছে, যথা—পঅতের্=সং—পিতর্, আবে—পিত, গ্রী ও লা—পতের, ইত্যাদি।

১। An Introduction to comp. Philo., by Gune, p. 120 হইতে উদ্ধৃত। পরবর্ত্তী দৃষ্টান্তগুলিও তাহা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সংস্কৃত স্বরবর্ণগুলি আবেস্তায় প্রায় যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে, যথা—সং—অশ্ব—আবে—অস্প; সং—মাতরঃ—আবে—মাতরো; সং—ইহি—আবে—ইদি; সং—উত—আবে—উত; সং—শূর—আবে—সূর, ইত্যাদি। কোন কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়, যেমন,—সং—নানা—আবে—নমা; সং-শুনঃ—আবে—সূনো, ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণ নিয়ম এই যে, ম্-এর পূর্ব্বে ই, উ আবেস্তায় দীর্ঘ হয়, যথা—সং—পতিম্—আবে—পইতীম্; সং—পিতুম্—আবে—পিতূম্। অন্ত্য স্বর গাথা-আবেস্তায় সর্ব্বত্রই দীর্ঘ হয়, যথা—সং—অসুর—গাথা—অহুরা; সং—অসি—গাথা—অহী। অন্যত্র—সং—নু—আবে—নূ, ইত্যাদি। সংস্কৃতের ন্যায় আবেস্তায় ব্যঞ্জনবর্ণের বাহুল্য নাই। তালব্য বর্ণের মধ্যে ইহাতে কেবল মাত্র চ, জ রক্ষিত হইয়াছে। মূর্দ্ধন্য বর্ণ নাই, এবং বর্গের চতুর্থ বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ ব্যবহৃত হয়, যথা—সং—মধু—আবে—মদু; সং—ভ্রাতা—আবে—ব্রাতা, ইত্যাদি। সংস্কৃত জ এবং হ এই উভয় স্থানেই আবেস্তায় জ ব্যবহৃত হয়, যথা—সং—জাত—আবে—জাতো; সং—অহম্—আবে—অজম্! সংস্কৃত স সাধারণতঃ হ'তে পরিণত হয়, যথা—সং—সপ্ত—আবে—হপ্ত; সং—সিন্ধু—আবে—হিন্দু। সংস্কৃত প্ত আবেস্তায় রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্ব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে স্প'তে, যথা—সং—অশ্ব=আবে অস্প ইহা ব্যতীত বিভক্তি, সর্ব্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ প্রভৃতিতেও আবেস্তা সংস্কৃতের অনুরূপ, যথা—সং—যজ্ঞঃ—আবে—যস্নো; সং—যজ্ঞম্—আবে—যস্নম্। সং—অহম্—আবে—অজম; সং—মাম্—আবে—মম্; সং তে—আবে—তে; সং—সঃ=আবে—হো; সং—তস্য=আবে—তহে; সং—দ্বৌ=আবে দ্ব; সং—পঞ্চ=আবে—পঞ্চ; সং—ভরাম=আবে—বরাম; সং ভরানি=আবে—বরানি, ইত্যাদি।

বৈদিক সাহিত্যে দেবাসুর-সংগ্রামের উল্লেখ রহিয়াছে। আবেস্তা পাঠে দেখা যায় যে, অসুর জাত অহুর শব্দটি বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত "দেব" অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বৈদিক অসুরই আবেস্তার দেব। ইহা হইতে মনে হয়, আর্য্য ও ইরাণীয় জাতিদ্বয় পূর্ব্বে একই স্থানে একই গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া বাস

করিতেন। উভয় ভাষার আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্যও এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক। পরে মতদ্বৈধ হওয়াতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক শাখা ইরাণে ও অপর শাখা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন ইহারা প্রত্যক্ষভাবে একে অপরকে জ্ঞাতি বলিয়া চিনিতে না পারিলেও উভয়ের প্রাচীন ভাষা সেই অতীত যুগের সাক্ষ্য প্রদান করে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এখন আমরা ইরাণিগণকে পরিত্যাগ করিয়া ভারতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। ঋগ্বেদ ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ। ইহা পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতমও বটে। আর্ম্মানীয় ভাষার লিখিত রূপ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে পাওয়া যায়।[১] গ্রীক ভাষার প্রাচীনতম রূপ মিলে হোমারের ইলিয়াড ও ওডেসি নামক কাব্যদ্বয়ে। ইহাদের রচনা কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দী। ইতালীয় ভাষার প্রাচীনতম রূপের সন্ধান পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে। এক সময়ে লাতিন ও কেলটিক ভাষা এক গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। পরে কেলতিক পশ্চিম ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া এখন ইহা আয়র্লণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহার প্রাচীনতম রূপের সন্ধান পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ধর্ম্মযাজক উল্‌ফিল গথিক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রণয়ন করেন। ইহাই জার্ম্মেনিক ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ। বাল্‌তো—শ্লাভিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত লিথুয়ানীয়া, লাটভিয়া, সার্বিয়া ও বুল্‌গেরিয়ার ভাষাই প্রধান। বুলগেরিয়ার ভাষায় খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছিল। ইহাই এই গোষ্ঠীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইউরোপীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে রচিত হোমারের ইলিয়াড ও ওডেসিই প্রাচীনতম। আর আবেস্তার গাথাগুলি খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনা কাল

১। Gune, pp. 93—94,

খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে নহে। অতএব ইহাই যে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহার আভ্যন্তরিক প্রমাণ বিশ্লেষণ করিয়া নানা মত প্রচারিত হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন যে, ইহা খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল,[১] আবার অনেকেই ইহার রচনা কাল বা সংহিতাকারে গ্রথিত হইবার সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে নামাইয়া আনিয়াছেন। কিন্তু কিছু কাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রত্নলেখ হইতে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যাইতে পারে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়া মাইনরের বোঘাজকুই নামক স্থানে এই সকল প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অশ্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অইক, তেরস্, পঞ্জ, সত্ত এবং নব প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত হিট্টাইট ও মিটান্নি রাজবংশের মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৩৬০ সালে অনুষ্ঠিত একটি চুক্তিপত্রও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ইন্দ্রর (ইন্দ্র), উরুব'ন (বরুণ বা অরুণ), মিত্র এবং নাসত্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সেই স্থানে ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। মিটান্নি রাজবংশের রাজধানী ছিল পারশ্যের উত্তরভাগে, এবং ইহার রাজাদের নামেও আর্য্যভাষার শব্দ-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যথা—দুশ্‌রত্ত (দুরথ), অর্ত্ততম (ঋতধাম) ইত্যাদি। আবাব টেল-এল-অমর্ণ (Tel!-e!-Amaina) নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নলেখ হইতে জানা যায় যে, সিরিয়া ও পালেষ্টাইনের রাজাদের নাম ছিল বিরিদশ্ব (বৃহদশ্ব), সুবরদত (সুবরদাতা?), যশ্‌দত (যশোদাতা), অর্ত্তমন্য (ঋতমন্য) ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত কসাইট (Kassites) রাজবংশ বাবিলনে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৭৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার রাজাদের নামে সূর্য্য, মরুৎ, ইন্দ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতার নাম সংযোজিত রহিয়াছে। অতএব এসিয়ার পশ্চিমাংশে

১। Rg Vedic India, by Dr. A. C. Das.

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক সভ্যতার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।[১] ইহা হইতে স্পষ্টই ধারণা জন্মে যে, ঋগ্বেদ ঐ সময়ের পরে রচিত হয় নাই।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিতে হইতেছে। আর্য্যগণের আদি বাসস্থান এসিয়া, না ইউরোপ? আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, প্রাচীন কালেই আর্য্যভাষা সতেম ও কেন্তুম বর্গে বিভক্ত হইয়াছিল। অতএব কোন না কোন স্থানে এই দুই বর্গীয় লোকেরা এক সময়ে পাশাপাশি বাস করিতেন, পরে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রাচীন যুগে এইরূপ কোন স্থানের যদি সন্ধান পাওয়া যায়, তবে সেইখানেই আর্য্যগণের আদি বাসভূমি নির্দ্দেশিত হওয়া উচিত। এখন দেখা যাইতেছে যে, টেরাস পর্ব্বতের উভয় দিকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে উক্ত উভয় বর্গীয় লোকেরা বসবাস করিতেন।[২] দুইটি বিশিষ্ট আর্য্য সভ্যতার পাশাপাশি বর্ত্তমানতার ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর নিদর্শন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তারপর সাহিত্যের দ্বারাও জাতির প্রাচীনত্ব নির্দ্দেশিত হয়। এই হিসাবে বৈদিক জাতিই প্রাচীনতম। বিশেষতঃ একটি সাহিত্য যখন সুগঠিত হইয়া উঠে, তখন নিকটবর্ত্তী প্রদেশেও ইহা প্রভাব বিস্তার করে। বেদের প্রভাব যে আবেস্তায় পড়িয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ হিট্টাইট, মিটান্নি এবং কসাইট রাজবংশেও ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। তিনটি মিটান্নি রাজকন্যাও মিশরের রাণী হইয়াছিলেন।[৩] অতএব পারস্য

১। The Aryans by Childe, pp. 18—29.

২। The only certain result that has emerged as yet is that there was a centum element somewhere within the Hittite realm just after 1500 B. C. About that date the Tauras ranges seem to have represented in a sense a frontier between Satem and Centum Indo-European speech, (The Aryans by Childe, p. 24).

৩। No less than three Mitannian princess' became queens of Egypt (Ibid. p. 26).

হইতে মিশর পর্য্যন্ত এই বৈদিক সভ্যতার বিস্তৃতির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। রাশিয়া হইতে আর্য্যগণ এসিয়ায় আসিলে, রাশিয়াতেও প্রাচীনতম বৈদিক সভ্যতার উক্ত প্রকার নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিত। বাল্‌তো-স্লাভ ভাষা সতেম বর্গের অন্তর্ভুক্ত হইলেও অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন। আর্য্যদের আদি বাসভূমি বিচারে ইহার কোনই মূল্য নাই। এই সকল কারণে মনে হয়, ধর্ম্ম যেমন এসিয়া হইতে ইউরোপ-আফ্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল, সেইরূপ আর্য্য ভাষাও হয়ত এসিয়া হইতে অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকিবে, কারণ আর্য্য সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন এসিয়ার পশ্চিমাংশেই মিলিয়া থাকে।

বৈদিক সাহিত্যে প্রধানতঃ তিনটি স্তর লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ বেদ (ঋক্, সাম, যজু, এবং পরবর্ত্তী অথর্ব্ব), দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ, তৃতীয়তঃ উপনিষদ্। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং ইহারও প্রথম ভাগের মণ্ডলগুলি শেষাংশের মণ্ডল অপেক্ষা প্রাচীনতর। অতএব ভারতীয় আর্য্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্বেদের প্রথমাংশের ভাষাতেই পাওয়া যায়। ইণ্ডো-ইউরোপীয় মূল ভাষার (অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে সমগ্র আর্য্যগোষ্ঠী একই স্থানে বাস করিয়া যে ভাষায় ভাবের আদান প্রদান করিতেন, সেই ভাষার) অনেক বিশেষত্ব প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মূল ভাষার ব্যঞ্জন বর্ণগুলি প্রায় সমভাবেই ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু গ্রীক্ ও লাতিনে হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্গের চতুর্থ বর্ণটি গ্রহণ করা যাউক। মূল শব্দ মেধু্ = সং—মধু = গ্রীক্—মেথু্; মূল শব্দ ভ্রাতের্ = সং—ভ্রাতর্ = গ্রীক্—ফ্রাতের্ ইত্যাদি। ইহা হইতে দেখা যায় যে, চতুর্থ বর্ণটি গ্রীক্ প্রভৃতি ভাষায় দ্বিতীয় বর্ণে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু বেদে ইহা অবিকৃত রহিয়াছে। তারপর ইহাতে যে মূলের স্বরবর্ণের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি ইহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে যে, বৈদিক ভাষাই আর্য্যগোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা মূলের অধিকতর নিকটবর্ত্তী।[১]

১। Bhandarkar's Wilson Philological Lectures. p. 16.

কিন্তু ঋগ্বেদেই ভাষার ক্রমিক পরিবর্ত্তনের নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার প্রথমাংশের সহিত তুলনা করিলে দশম মণ্ডলের ভাষার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত দশম মণ্ডলের য্ এবং ব্ স্থানে প্রাচীনতম অংশে ইয়্, উব বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ত্বম্ স্থানে তুবম্।

প্রাচীনতম অংশের র্ স্থানে দশম মণ্ডলে ল্ বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—রম্, রোম্, রোহিত স্থানে লম্, লোম, লোহিত ইত্যাদি। কৃ ধাতুর রূপে প্রাচীনতম অংশে কৃণুমঃ, কিন্তু দশম মণ্ডলে কুর্ম্মঃ। প্রাচীনতম অংশে অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের কর্ত্তৃকারকের বহুবচনে আসস্ এবং অস্ উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু দশমমণ্ডলে অস্ বিভক্তিরই প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত ইহাতে ইম্, অবস্ম্যা, বীতি প্রভৃতি প্রাচীনতম অংশে ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রয়োগ লক্ষিত হয় না।[১] অতএব দশম মণ্ডলের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল হইয়া আসিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের মূলে একটা কথ্য ভাষার অস্তিত্ব পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং ইহাই পাণিনি কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃত ভাষা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সংস্কৃতে উচ্চারণের স্থান ভেদে বর্ণগুলি যেভাবে শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে আর্য্যগণের ধ্বনি-বিজ্ঞানে অদ্ভুত পারদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় বর্ণগুলি এমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ মূর্দ্ধন্য বর্ণের অস্তিত্ব একমাত্র সংস্কৃত ভাষাতেই লক্ষিত হয়। ইণ্ডো-ইউরোপীয় অন্য কোন ভাষায় ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না, এমন কি সংস্কৃতের নিকটতম আবেস্তার ভাষাতেও নহে। এজন্য অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, মূর্দ্ধন্য বর্গের বর্ণগুলি ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নহে। আর্য্যগণ ভারতে উপনিবিষ্ট হইবার পরে দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি ভাষার সংস্পর্শে আসিয়া মূর্দ্ধন্য বর্ণগুলি গঠিত করিয়া লইয়াছেন।

১। Gune, pp. 131—132; Bhandarkar's Philo. Lectures. pp. 16—17.

মতান্তরে দন্ত্য বর্ণ হইতে মূর্দ্ধন্য বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গান্ধারে বসিয়া তাঁহার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন, এবং বর্ণ বিভাগে তিনি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মাহেশ ব্যাকরণই অনুসরণ করিয়াছেন। এই মাহেশ ব্যাকরণ পাণিনির কত পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থে আরও অন্ততঃ নয় জন ব্যাকরণ-কারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী যাস্কও (খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী) অনেক ব্যাকরণ-কারের উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ এই সকল গ্রন্থে মূর্দ্ধন্য বর্ণের বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা সাধারণতঃ ণত্ব-বিধান, ষত্ব-বিধান নামে পরিচিত। অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরবর্ত্তী দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য ষ হয়, যথা—জিগীষা, বৃষ, কৃষ্ণ প্রভৃতি। সেইরূপ ঋ, র, ষ এই তিন বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হয়, যথা—ঋণ, প্রহরণ, তৃষ্ণা প্রভৃতি। উক্ত তিনটি বর্ণের প্রভাব এত বেশী যে, স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ এবং য, ব, হ ব্যবধান থাকিলেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হয়, যথা—নারায়ণ, কৃপাণ, প্রবণ, গ্রহণ ইত্যাদি। মূর্দ্ধন্য বর্গান্তর্গত অন্যান্য বর্ণগুলিও যে দন্ত্য বর্ণ হইতে উদ্ভুত হইয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে পুরোদাশ এবং পুরোডাশ এই উভয়ই রহিয়াছে। অন্যত্র দুর্দভ=দূডভ।[১] বৈদিক পৃথতি হইতে পঠতি ইত্যাদি।[২] আবার উল্লিখিত কারণ বর্ত্তমাণ না থাকিলেও কতকগুলি সংস্কৃত শব্দে কেবল মূর্দ্ধন্য বর্ণই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যথা—পাণি, মণি, পণ্য, বাণ, আষাঢ়, পাষাণ ইত্যাদি। অতএব বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সংস্কৃতেও মূর্দ্ধন্য বর্ণের ব্যবহার লক্ষিত হইয়া থাকে।

শব্দ-সম্পদে সংস্কৃতের ঐশ্বর্য্য অতুলনীয়। ইংরাজীতে হস্তীর প্রতিশব্দ Elephant, ইহার আর কোন সমনাম ঐ ভাষায় পাওয়া যায় না। কিন্তু সংস্কৃতে গজ, হস্তী, করী, দ্বিপ প্রভৃতি ইহার বহু সমনাম রহিয়াছে। তন্মধ্যে শব্দ বা গম্ভীর রব করে' বলিয়া গজ, শুণ্ডটি হস্তের ন্যায় কার্য্য করে বলিয়া

১। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী কৃত পালিপ্রকাশ, প্রবেশক, ৪২ পৃঃ।
২। Gune's Com. Philo., p. 146.

হস্তী এবং করী, আর শুণ্ড দ্বারা জল গ্রহণ করিয়া মুখ দিয়া পান করে বলিয়া ইহাকে দ্বিপ বলা হয়। হস্তীর বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়া এই সকল সংজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিরদ, কুঞ্জর প্রভৃতি শব্দও এই পর্য্যায়ভুক্ত। ইহা দ্বারা ভাষার আভিজাত্যই সূচিত হয়। সংস্কৃত ভাষা এইরূপে অনন্যসাধারণ ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ যখন হস্তীর সহিত প্রথম পরিচিত হয়, তখন বোধ হয় একটি মাত্র সংজ্ঞা দ্বারা এই জন্তুটিকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। পরে ইহার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। তন্মধ্যে হস্তী ও করী শব্দদ্বয় সাদৃশ্যবাচক। আদিম মানব যখন সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বস্তুর সহিত পরিচিত হইতে আরম্ভ করে, তখনই ঐ সকল বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে বিভিন্ন নামের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। এইজন্য পৃথিবীর সকল ভাষাতেই সর্ব্বপ্রথম নাম বা বিশেষ্যের উৎপত্তি কল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুণ বা বিশেষত্বের ধারণা হওয়াও স্বাভাবিক। চক্ষু দ্বারা আমরা নীল পীতাদি বর্ণ লক্ষ্য করি, স্পর্শ দ্বারা কোমলত্ব বা কঠোরতা অনুভব করি, জিহ্বা দ্বারা অম্ল-তিক্ত মধুরাদি আস্বাদন লাভ করি। এইভাবে বস্তুকে বিশেষিত করে বলিয়া বিশেষণের উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমে বোধ হয় বিশেষ্য বিশেষণের প্রভেদ সূচিত হয় নাই, কিন্তু ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের ব্যবহারের পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকিবে। তারপর ক্রিয়াপদ। যাহা দ্বারা কোন কিছু করা বুঝায় তাহাই ক্রিয়া। আদিম যুগেও মানুষকে জীবন ধারণের জন্য কার্য্য করিতে হইয়াছে। অতএব ক্রিয়াপদের উৎপত্তি সেই প্রাথমিক যুগেই হইয়াছিল, পরে বাক্যকে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় অংশে ভাগ করা হইয়াছে। অন্যান্য পদের মধ্যে ক্রিয়া-বিশেষণ (adverb), সম্বন্ধবাচক অব্যয় (preposition), এবং সংযোজক অব্যয় (Conjunction) যে পরবর্ত্তীকালে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃত কিম্, শনৈঃ, কুত্র, যত্র, হেলয়া, সহসা, সাকম্, সুখেন প্রভৃতি শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্ব্বনামের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং সপ্তমী বিভক্তির পদ মাত্র। প্রথমতঃ ইহারা কারকরূপেই বিরাজিত ছিল, কিন্তু পরে

ক্রিয়ার সহিত বহুকাল ঘনিষ্টভাবে ব্যবহৃত হওয়াতে ক্রিয়া-বিশেষণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এইভাবেই কৃতে, পশ্চাৎ, সার্দ্ধম্, সমম্ প্রভৃতি ক্রিয়া-বিশেষণ সম্বন্ধবাচক অব্যয়ে পরিণত হইয়াছিল। সংস্কৃতে যতগুলি কারকই থাকুক না কেন, তাহাদের দ্বারা সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ সকল সময়ে সহজে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। এইজন্য কতকগুলি পদ বিশেষ্যের সহিত ভাব-প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। পরে তাহারা সম্বন্ধবাচক অব্যয়ে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ যৎ, তদ্, যদা, তর্হি প্রভৃতি সর্ব্বনামগুলি হইতেই পরবর্ত্তীকালে সংযোজক অব্যয়ের উদ্ভব হইয়াছে। আবার ইহাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বিশেষ্য ও ক্রিয়ার পূর্ব্বেই বোধ হয় সর্ব্বনামের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, কারণ "দদামি" পদের "মি" বিভক্তিতে কর্ত্তার সন্ধান মিলিয়া থাকে। আদিম মানব নিজেকেই উত্তম পুরুষরূপে গ্রহণ করিয়া থাকিবে। তুমি মধ্যম পুরুষ, আর আমি, তুমি ব্যতীত সকলেই নাম পুরুষ মাত্র। ইহা মানবের আদিম যুগের কৃষ্টিরই সন্ধান প্রদান করে।[১]

সংস্কৃতে প্রায় সকল শব্দকেই প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। এইভাবে শব্দ বিশ্লেষণ করাকে ব্যাকরণের ভাষায় সংস্কার বলে।[২] আর এইরূপে সংস্কৃত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের দেবভাষার নাম সংস্কৃত[৩]। শব্দের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, কয়েকটি বর্ণ মিলিত হইয়া এক একটি বর্ণসমষ্টি গঠন করে, আর সেই বর্ণসমষ্টি হইতে বিবিধ শব্দের উদ্ভব হইয়া থাকে। যেমন—ন্+ঈ=নী একটি বর্ণসমষ্টি। ইহা হইতে নী+ক্ত=নীত; নী+ক্তি=নীতি; নী+অল্=নয়; নী+অনট্=নয়ন প্রভৃতি শব্দ গঠিত হইয়াছে। এইভাবে শব্দ সৃষ্টি করে বলিয়া নী-জাতীয় বর্ণসমষ্টিকে প্রকৃতি অর্থাৎ শব্দমূল

১। Gune's Com. Philo., pp. 73—74.

২। The Philosophy of Sanskrit Grammar, by Dr. P. Chackrabarti. P. 137.

৩। The Linguistic Speculations of the Hindus, by Dr. P. Chackrabarti, p. 178.

বলে, আর ইহাদের উত্তর ক্ত, ক্তি, অল্, অনট্ প্রভৃতি যে সকল বর্ণসমষ্টি মিলিত হইয়া অর্থযুক্ত শব্দ গঠন করে তাহাদিগকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় যোগেই শব্দের অর্থ প্রতীত হয়।

আবার প্রকৃতি দ্বিবিধ, যথা—নাম এবং ধাতু। যাহাদ্বারা বস্তু-বিশেষ লক্ষিত হয় তাহাই নাম, আর কার্য্যের দ্যোতক ধাতু। ইহাদের উত্তর প্রযুক্ত প্রত্যয় ব্যাকরণে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। নরম্, নরাভ্যাম্, নরয়োঃ প্রভৃতি পদে ব্যক্তিবাচক "নর" শব্দটিই অপরিবর্ত্তিত অংশ, এবং ইহার সহিত অম্, ভ্যাম্, ওঃ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে শব্দ-বিভক্তি আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। আর বদতি, বদতঃ, বদন্তি প্রভৃতি পদে বদ্ ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত তি, তস্, অন্তি প্রভৃতি প্রত্যয় ক্রিয়া-বিভক্তি। এইভাবে সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলিকে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। এমন কি পতি, পিতা, ফেন, বধূ, বিন্দু, নভস্ প্রভৃতি শব্দগুলিরও ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশার্থে উণাদি প্রত্যয়ের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এইভাবে পাণিনি শব্দমূল নির্দ্দেশ করিয়া ভাষার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাকরণ (অথবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন ব্যাকরণ) রচিত হইবার পূর্ব্বেও করোতি, জানাতি, গচ্ছতি, শক্লোতি প্রভৃতি পদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ইহাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া ব্যাকরণকারগণ ইহাদিগকে বিভিন্ন গণে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সূত্র রচনা করিয়াছেন মাত্র। পরবর্ত্তীকালে ঐ সকল সূত্র অবলম্বনে ইহাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু শব্দের সহিত অর্থ নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ। অর্থ প্রকাশ করিবার জন্যই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ যাবতীয় নামকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—রূঢ়, লক্ষক, যোগরূঢ় এবং যৌগিক। গম্ ধাতুজাত গৌঃ শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ "যাহা গমন করে।" কিন্তু এখন ইহা দ্বারা প্রাণী বিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। গঙ্গা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থও "যাহা গমন করে" কিন্তু অধুনা ইহা দ্বারা নদীবিশেষ লক্ষিত হয়। এইভাবে বিশেষার্থে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে রূঢ় বলে। দুহিতা, পিতা, পতি প্রভৃতি শব্দ এই জাতীয়। ইহা

অর্থসঙ্কোচের দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়তঃ গঙ্গায়াম্ ঘোষঃ, মঞ্চা হসন্তি প্রভৃতি বাক্যে গঙ্গার জলের উপরে না বুঝাইয়া গঙ্গাতীরে অবস্থিত ঘোষপল্লী, এবং মঞ্চে অধিষ্ঠিত লোকগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অতএব সাধারণ অর্থের পরিবর্ত্তে এখানে অর্থান্তরন্যাসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহাই লক্ষণা। প্রচলিত বাঙ্গালায় "তোমার কি কান নাই?" অর্থে "তুমি কি শুনিতে পাও না?" "ছেলেটার মাথা নাই" অর্থে বুদ্ধিবৃত্তির অভাব লক্ষিত হইয়াছে। ইহাও লক্ষণার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তৃতীয়তঃ কতকগুলি শব্দ তাহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ভিত্তিতে বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে যো'গরূঢ় শব্দ বলে। পঙ্কজ অর্থে যাহা পঙ্কে জন্মে, কিন্তু এই শব্দটি এখন সর্ব্ববিধ জলজ উদ্ভিদকে না বুঝাইয়া পদ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হয়। প্রবীণ অর্থে বীণা বাদনে দক্ষ, আর কুশল অর্থে কুশ আহরণকারী। অথচ এই উভয় শব্দই এখন দক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। চতুর্থতঃ যৌগিক শব্দই কেবলমাত্র তাহাদের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কারক, পাঠক, পাচক প্রভৃতি শব্দগুলিই এই জাতীয়।[১] এই ভাবে ভাষার সংস্কার এবং শব্দার্থের সমন্বয় সাধন করিয়া সংস্কৃত ভাষাকে ব্যাকরণের সূত্রের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। এখনও ঐ সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত, পঠিত ও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে একদিকে ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অপর দিকে ইহার প্রসারতা সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা সজীব তাহা বর্দ্ধিত হয়, আর বৃদ্ধির রাহিত্যই প্রাণহীনতার প্রধান লক্ষণ। কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ভাষা লোকের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, আর স্বল্পায়াসে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়াসই মানবের সহজ প্রকৃতি। বিশেষতঃ ব্যাকরণের সূত্র অবলম্বন করিয়া ভাষা ব্যবহার করিবার শিক্ষা সাধারণ লোকের থাকিতে পারে না। এইজন্য নিত্য ব্যবহারে ভাষা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। ইহা

১। The Linguistic Speculations of the Hindus, by' Dr. P. Chackrabarti, pp. 208—14.

ব্যতীত আর একটি বিশেষ কারণেও ভাষার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। আর্য্যগণ বিজয়-অভিযানে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আর্য্যসভ্যতার প্রভবাধীনে আসিয়া ইহারা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেও ইহার সুপ্রয়োগ রক্ষা করিতে পারে নাই। এই সকল কারণে আর্য্য ভাষা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক কথ্য ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষার নাম পালি। ইহাতে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কালক্রমে ইহার ব্যাকরণও রচিত হইয়াছিল। ইহাতে এই ভাষার যে সকল বিশেষত্ব নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু সন্ধান প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেও মিলিয়া থাকে। পালিতে পদান্ত হসন্ত বর্ণের প্রয়োগ নাই, যথা—সং—গুণবান্—পালি - গুণবা। সেইরূপ পশ্চাৎ হইতে পচ্ছা, যাবৎ হইতে যাব, তাবৎ হইতে তাব, ইত্যাদি। বৈদিক সাহিত্যেও পশ্চাৎ এবং পশ্চা এই উভয়বিধ প্রয়োগই লক্ষিত হয়।[১] সেইরূপ যুষ্মান্ এবং যুষ্মা, উচ্চাৎ স্থানে উচ্চা, নীচাৎ স্থানে নীচা, ইত্যাদি। পালিতে বহুস্থানে ঋকার উকারে পরিণত হয়, যথা—ঋতু স্থানে উতু, ঋজু স্থানে উজু ইত্যাদি। বৈদিক সাহিত্যেও বৃন্দ এবং বুন্দ এই উভয়বিধ প্রয়োগই লক্ষিত হয়। পালিতে বহুস্থানে দকার ডকারে পরিণত হয়, যথা—দহ'তি স্থানে ডহতি। বৈদিক সাহিত্যেও দুর্দভ এবং দুডভ, পুরোদাশ এবং পুরোডাশ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পালিতে সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর প্রায়ই হ্রস্ব হয়, যথা—পরাক্রম স্থলে পরক্কম, তার্কিক স্থলে তক্কিক, ইত্যাদি। বৈদিক সাহিত্যেও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যথা—রোদসীপ্রা স্থলে রোদসিপ্রা, অমাত্র স্থলে অমত্র ইত্যাদি। ভাষার এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? প্রাচীনতম বৈদিক ভাষা হইতে যে ক্রমিক পরিবর্ত্তনে লৌকিক সংস্কৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ

১। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখরের শাস্ত্রী সম্পাদিত পালিপ্রকাশ, প্রবেশক, ৩৯—৪৮ পৃঃ হইতে সঙ্কলিত।

বলিয়া থাকেন যে, আর্য্য ও অনার্য্যের সংমিশ্রণে ভাষার এই অপচয় সংসাধিত হইয়াছে। "কিন্তু ইহা দুই চারি দশ-বিশ বৎসরে হয় নাই, সুবহু কাল ইহাতে অতীত হইয়াছে। আবার উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা লিখিত হইতে আরব্ধ হয় নাই, লিখিত হইবার পূর্ব্বেই ইহার অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। সমগ্র আর্য্যসমাজে বিস্তৃতি লাভ করিতেও ইহার অল্প সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। ইহা বহুকাল ধরিয়া কথ্যরূপে মুখে মুখে আসিতে আসিতে শেষে বুদ্ধদেব ও অন্তিম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের আবির্ভাবের পর সাহিত্যরূপে আসিয়া দর্শন প্রদান করিয়াছে।"[১] বেদের সময়ে যে পরিবর্ত্তনের সূচনা মাত্র হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ পরিণত অবস্থা সাহিত্যিক পালি ভাষায় পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষাকেই ভিত্তি করিয়া পরবর্ত্তী কালে পালি ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, সংস্কৃতের কঠোরতা অতিক্রম করিয়া পালি অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসিয়াছে। এখানে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইল। পালিতে ঋ, ঌ, ঐ, ঔ এই চারিটি স্বরবর্ণের প্রয়োগ নাই। ঋকার সাধারণতঃ অ, ই, উ'তে পরিণত হয়, যথা—কৃত স্থানে কত, ঋণ স্থানে ইণ, ঋতু স্থানে উতু, ইত্যাদি। ঐকার স্থানে একার বা ইকার হয়, যথা—তৈল স্থানে তেল, সৈন্ধবঃ স্থলে সিন্ধব। ঔ-কার স্থানে ও-কার বা উ-কার হয়, যথা—পৌর স্থলে পোর, মৌক্তিক স্থলে মুক্তিক। পালিতে শ ও ষ'এর প্রয়োগ নাই, তৎপরিবর্ত্তে একমাত্র স'ই ব্যবহৃত হয়, যথা—শ্রমণ স্থলে সমণ, শিষ্য স্থলে সিস্‌স। পদান্ত হসন্ত বর্ণ এবং বিসর্গের ব্যবহার পালিতে লক্ষিত হয় না, যথা—পুনর্‌ স্থলে পুন, ধেনুঃ স্থলে ধেনু, দুঃখ স্থলে দুক্‌খ, ইত্যাদি। ইহারই ফলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ এবং তাদের রূপ পালিতে কদাচিত লক্ষিত হয়।

সংস্কৃতের যুক্ত বর্ণও পালিতে অপেক্ষাকৃত সরল হইয়া আসিয়াছে, যথা—কর্ম্ম স্থানে কম্‌ম, তার্হি স্থানে তরহি, গ্রাম স্থানে গাম, সমুদ্র স্থানে সমুদ্দ, ক্ষীর স্থানে খীর, দ্যুতি স্থানে জুতি, ইত্যাদি।

১। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত পালিপ্রকাশ, প্রবেশক, ৩৮ পৃঃ হইতে সঙ্কলিত।

পালিতে দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই, একাধিক হইলে বহুবচনের বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর তৃতীয়া ও পঞ্চমী এবং চতুর্থী ও ষষ্ঠীতে শব্দসমূহ প্রায় একইরূপ গ্রহণ করে। ইহারই ফলে পরবর্ত্তী প্রাকৃতে সম্প্রদান কারকে সর্ব্বত্রই ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

পালিতে আত্মনেপদের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প, পরস্মৈপদী রূপই বেশী ব্যবহৃত হয়। অতএব পালির সময়ে নানাপ্রকারে সংস্কৃতের সরলতা সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষায় লক্ষিত হয়।

পালির ন্যায় প্রাকৃত ভাষাতেও ঋ, ঌ, ঐ, ঔ, স্বরবর্ণের প্রয়োগ নাই। কিন্তু পালিতে ঋ স্থানে অ, ই, উ হয়, আর প্রাকৃতেও ঐরূপ হয় বটে, কিন্তু ইহা ব্যতীত পদের অদিস্থিত ঋকার ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত না থাকিলে রি'তে পরিণত হয়, যথা—ঋণ স্থানে রিণ। ইহাতে আধুনিক কথ্য ভাষায় ঋকারের উচ্চারণ বিশিষ্টতার প্রাথমিক সূচনা লক্ষিত হইবে। পালিতে ঐ স্থানে এ বা ই হয়, আর প্রাকৃতেও ঐরূও হয় বটে, কিন্তু এই একার (=অই) হইতে পুনরায় অই উৎপন্ন হইয়াছে, যথা—পালিতে ভৈরব স্থানে ভেরব, কিন্তু প্রাকৃতে ভইরব। ঔকারের পরিবর্ত্তনেও ইহা লক্ষিত হয়। পালিতে পৌর স্থানে পোর, কিন্তু প্রাকৃতে এই ওকার (=অ+উ) হইতে পুনরায় অউ উৎপন্ন হইয়া পউর হইয়াছে। ইহা পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনের লক্ষণ মাত্র।

প্রাকৃতে অসংযুক্ত পদমধ্যস্থ ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য, ব বর্ণগুলির লোপ হইয়া স্বরমাত্র অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু পালিতে এইরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। পালির সময়ে এই অপচয় সংঘটিত হয় নাই। পালিতে ন এবং ণ উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই ণ।

পালিতে য-ফলা ও র-ফলার অস্তিত্ব রহিয়াছে, কিন্তু প্রাকৃতে নাই।

বৈদিক দেবেভিঃ হইতে পালিতে দেবেভি, কিন্তু প্রাকৃতে দেবেহি. কারণ প্রাকৃতে খ, ঘ, থ, ধ, ভ প্রায়ই হ-কারে পরিণত হয়। ইহাও পরবর্ত্তী অপচয়ের দৃষ্টান্ত। ইহারই অপর রূপ দেবেহিং দেবেহিঁ অপভ্রংশে সংক্রামিত হইয়াছে।

পালির ন্যায় প্রাকৃতেও দ্বিবচনের স্থানে বহুবচনের বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

পালিতে চতুর্থী ও ষষ্ঠী বিভক্তিতে শব্দ সকল প্রায় একই রূপ গ্রহণ করে, কিন্তু প্রাকৃতে ষষ্ঠী বিভক্তিই চতুর্থীর স্থানে ব্যবহৃত হয়।

পালিতে ধাতুরূপে উভয়পদী বিভক্তির ব্যবহার হইলেও পরস্মৈপদের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকৃতে আত্মনেপদী বিভক্তির প্রয়োগ নাই, সর্ব্বত্রই পরস্মৈপদী। পালিতে অন্যান্য গণের মধ্যে ভ্বাদিগণের প্রাধান্য দেখা যায়, আর প্রাকৃতে একমাত্র ভ্বাদিগণই বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আর লট্ লোট্ লৃট্ এই তিনটি মাত্র কালের ব্যবহার প্রাকৃতে বিশেষরূপে পরিস্ফুট রহিয়াছে।[১]

এই সকল কারণে পালির পরবর্ত্তী স্তরে প্রাকৃতের স্থান নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

অপভ্রংশ

এইরূপে ক্রমিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের সাহিত্যিক রূপের বিশিষ্টতা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রাকৃত ব্যাকরণে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু ব্যাকরণ রচিত হইবার পরেই প্রাকৃতের প্রসারতা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি ভাষাস্রোত এই বন্ধন অতিক্রম করিয়া অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। ইহারই পরিণতিতে পরবর্ত্তীকালে ভাষা যে বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাই অপভ্রংশ বলিয়া কথিত হয়। ইহা প্রাকৃত এবং আধুনিক কথ্য ভাষাসমূহের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, অর্থাৎ অপভ্রংশ হইতে বর্ত্তমানে প্রচলিত কথ্য ভাষাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব অপভ্রংশই বাঙ্গালা ভাষার জননী, আর সংস্কৃত ইহার অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহী। অপভ্রংশ ক্রমে সাহিত্যিক ভাষাতেও পরিণত হইয়াছিল, এবং হেমচন্দ্র, ত্রিবিক্রম, ক্রমদীশ্বর রচিত ব্যাকরণ হইতে ইহার কিঞ্চিৎ সন্ধান পাওয়া যায়।[২]

১। বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত পালিপ্রকাশ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রাকৃতপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত।

২। Bhandarar's Wilson Philological Lectures, pp. 109—118 হইতে সঙ্কলিত।

বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কে অপ্রকৃতিস্থ রাজার প্রলাপে কবি এই ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই ভাষায় রচিত দুইটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

এত্তহে তেত্তহে বারি ঘরি লচ্ছি বিসংট্‌ল ধাই।
পিঅ পব্‌ভট্টব গোৗরড়ী নিচ্চল কহিংবি ন ঠাই॥
জীবিউ কাসু ন বল্লহউং ধণু পুণু কাসু ন ইট্টু।
দোণ্ণি বি অবসরি নিবড়ি অইং তিণসম গণই বিসিট্টু॥

ইহাদের সংস্কৃতরূপ এই প্রকার—

অত্র তত্র দ্বারে গৃহে লক্ষ্মীর্বিসংষ্ঠুলা ধাবতি।
প্রিয়প্রভ্রষ্টেব গৌরী নিশ্চলা ক্বাপি ন তিষ্ঠতি॥
জীবিতং কস্য ন বল্লভং ধনং পুনঃ কস্য ন ইষ্টম্।
দ্বে অপ্যবসরে নিপতিতে তৃণসমে গণয়তি বিশিষ্টঃ॥

অর্থাৎ—

চঞ্চলা লক্ষ্মী দ্বার হইতে দ্বারান্তরে এবং গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়া থাকেন। প্রিয় বিরহিণী নারীর ন্যায় তিনি কোন স্থানেই অচলা হইয়া অবস্থান করেন না। প্রাণ কাহার নিকট প্রিয় নহে, এবং ধনই বা কাহার ইপ্সিত নহে? কিন্তু সুযোগ উপস্থিত হইলে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই উভয়ই তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করেন।

অপভ্রংশের বিশেষত্ব—

শব্দরূপে

কর্ত্তৃ ও কর্ম্মকারকের বিভিন্নতা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ একই পদ এই উভয় কারকে একই বিভক্তিযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। অকারান্ত পুংলিঙ্গ বিশেষ্যের কর্ত্তৃকারকের একবচনে ব্যবহৃত "ও" এই ভাষায় উ'তে পরিণত হইয়া কর্ত্তৃ ও কর্ম্মকারকে এবং ক্লীবলিঙ্গেও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যথা—গতঃ স্থানে গউ; বিশিষ্টঃ স্থানে বিসিট্টু; যমলোকম্ স্থানে জমলোউ;

কমলম্ (ক্লী) স্থানে কমলু। কিন্তু স্বার্থে ক-যুক্ত ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যের মকার অনুস্বাররূপে রক্ষিত হয়, যথা—কমলকম্ স্থানে কমলউং।

পুংলিঙ্গ বিশেষ্যের প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনে আ ব্যবহৃত হয়, যথা—দিবসা স্থানে দিঅহড়া।

কখনও কখনও কর্ত্তৃ ও কর্ম্মকারকে কোন বিভক্তিই ব্যবহৃত হয় না, যথা— উদ্ধৃত শ্লোকে বিসংকুল, নিচ্চল, ইত্যাদি করণকারকে এক বচনের বিভক্তি এন, অথবা ইহার সংক্ষিপ্তরূপ এঁ, এবং ইহা ইকারান্ত ও উকারান্ত বিশেষ্যেও ব্যবহৃত হয়।

করণের বহুবচনের বিভক্তি হিঁ।

অপাদান কারকের একবচনের বিভক্তি হে এবং হু, আর বহুবচনের বিভক্তি হুং।

ষষ্ঠীর একবচনের বিভক্তি সু এবং স্সু, আর বহুবচনের বিভক্তি হং (যেমন মনুষ্যাণাম্ স্থানে মানুসহং)।

সপ্তমীর একবচনের বিভক্তি এ অথবা ই, আর বহুবচনের বিভক্তি হিং। সম্বোধনে হো ব্যবহৃত হয়।

সর্ব্বনামের রূপ

	উত্তম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তৃ	হউং	অম্হে, অম্হইং	তুহং	তুম্হে, তুম্হইং
কর্ম্ম	মইং	ঐ	তইং	ঐ
করণ	ঐ	অম্হেহিং	পইং, তইং	তুম্হেহিং
অপাদান	মহু, মজ্ঝু	অম্হহং	তউ, তুজ্ঝ,	তুম্হহং
ষষ্ঠী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
অধিকরণ	মইং	অম্হাসু	পইং, তইং	তুম্হাসু

বিবৃতি

সং—অহম্—অহকম্—হকম্—হম্+অপভ্রংশ উ=হউং; সং—ময়া, ময়ি হইতে মই (প্রাকৃতেও); ইহা কর্ম্মকারকেও ব্যবহৃত হয়। বৈদিক অস্মে হইতে অম্হ মূলের উৎপত্তি। অস্মকে—অম্হএ—অম্হহং। অপাদান ও ষষ্ঠীতে অম্হহং। অস্মাভিঃ হইতে অম্হেহিং। প্রাকৃত তুম্হং হইতে তুহ, আর ত্বয়া এবং ত্বয়ি হইতে তই এবং (ত্ব হইতে প্প হইয়া) পই মূলের উদ্ভব হইয়াছে। সম্ভবতঃ ত্বক হইতে ক লোপে এবং অপভ্রংশ উ যোগে, অথবা তব হইতে ব-কার উ'তে পরিণত হইয়া অপাদানের তউ পদের উদ্ভব হইয়াছে। সং—তুভ্যম্ জাত পালি এবং প্রাকৃতের তুম্হং হইতে তুজ্ঝ আসিয়াছে। সং—যুষ্ম বা তুষ্ম হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বহুবচনের তুম্হ মূলের উৎপত্তি হইয়াছে।

সং—অত্র হইতে প্রাকৃত এথ রূপের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এখানে অ পরিবর্ত্তিত হইয়া এ উৎপন্ন করিয়াছে। অপভ্রংশ ভাষায় ইহার প্রভাব অত্যধিক লক্ষিত হয়। এখানেও যদ্, তদ্, প্রভৃতির অকারের পরিবর্ত্তনে ই-কার বা এ-কার ব্যবহৃত হইতেছে দেখা যায়। যথা,—যত্র স্থানে জেথু, তত্র স্থানে তেথু, কুত্র স্থানে কেথু, (এখানে ক এর উ-কার পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলির সাদৃশ্যে এ-কারে পরিণত হইয়াছে)। পদান্ত উ-কার সাদৃশ্য জাত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অকারান্ত বিশেষ্যের অকার কর্ত্তৃকারকের একবচনে উকারে পরিণত হয়। অনেক শব্দে এই প্রকার উকারের ব্যবহার চলিত থাকাতে অন্যান্য পদেও ইহা সংক্রামিত হইয়াছে। এই জন্য জেথ স্থানে জেথু ইত্যাদি। সেইরূপ বিনা স্থানে বিণু, পুনঃ স্থানে পুণু ইত্যাদি। প্রাকৃতে পদান্ত হসন্ত বর্ণের লোপ হয়। ইহারই প্রভাবে তদ্বৎ হইতে তদ্ব, পরে তেম (পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রানুযায়ী অ—এ)। সেইরূপ যদ্বৎ হইতে জেম, কিম্বৎ হইতে কেম (সাদৃশ্যে)। এই একার পরে ইকারে পরিণত হইয়া জিম, তিম, কিম প্রভৃতি পদের সৃষ্টি করিয়াছে। দ্রষ্টব্য এই যে, প্রাকৃতের ন্যায় এখানেও বর্গীয় ব পরিবর্ত্তিত হইয়া মকার উৎপন্ন করিয়াছে। অন্যান্য দৃষ্টান্ত যাবৎ হইতে জাম,

তাবং হইতে তাম। সং—যদ্, তদ্ হইতে জেম, জিম, তেম, তিম প্রভৃতির উদ্ভব হয় বলিয়া অপভ্রংশ ভাষায় জে, জি, তে, তি প্রভৃতিই শব্দমূল রূপে গৃহীত হইয়াছিল, এবং এইরূপে তথা, যথা, কথম্ হইতে প্রথমতঃ তিধ, জিধ, কিধ, তৎপর তিহ, জিহ, কিহ, এবং সর্ব্বশেষে তিহু, জিহু, কিহু প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

ক্রিয়াবিভক্তি

বর্ত্তমান কাল (লহ ধাতু)

	নামপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	লহই	লহহি	লহউং
বহুবচন	লহন্তি	লহহু	লহহুঁ

বিবৃতি

সং—লভতি হইতে লহই। লভন্তি হইতে লহন্তি। এখানে—ন্তি'র ইকার এবং নকারের পরিবর্ত্তে অনুস্বার রক্ষিত হইয়াছে, আর ত সাদৃশ্যজাত। মধ্যমপুরুষের একবচনের—সি বিভক্তি হইতে—হি হইয়া লহহি। আর অনুজ্ঞার বহুবচনের—থ বিভক্তি হইতে বহুবচনের হ। ইহার সহিত সাদৃশ্য জাত উ যুক্ত হইয়াছে। উত্তম পুরুষের একবচনে লহউং (অপভ্রংশের উ প্রবণতার জন্য) অথবা দ্বিবচনের বস বিভক্তির প্রভাবজাত। সং—অস্ ধাতুর উত্তম পুরুষের রূপে স্মি,—স্মঃ—স্মো প্রভৃতি পদ পাওয়া যায়। ইহারাই নাটকে—ম্হি,—ম্হো রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ম্হো হইতে ওকার উকারে পরিণত হইয়া বহুবচনের হু বিভক্তি উৎপন্ন করিয়াছে।

অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের একবচনের বিভক্তি হি, এ, উ। প্রথম দুইটি সংস্কৃত হি বিভক্তি-জাত, আর সংস্কৃত স্ব—সু—হু হইতে উ বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হি এবং ইসস।

অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপে ই, ইউ, অবি, ইবি, এবি, এবিণু, এপ্পি, এপ্পিণু বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য বিশেষত্ব:—কখনও কখনও দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়, যথা—গঙ্গা স্থানে গঙ্গ। কখনও কখনও ক্, খ্ স্থানে গ্, ঘ্; ত্, থ্ স্থানে দ্, ধ্; এবং প্, ফ্ স্থানে ব্, ভ্ আদেশ হয়। বর্গীয় ব অনেক শব্দেই ম'তে পরিণত হয়, যথা—যাবৎ, তাবৎ স্থানে জাম, তাম ইত্যাদি। ইহার প্রভাবেই ভ্রমর স্থানে ভবঁরু, কমল স্থানে কবঁলু এবং যমুনা স্থানে জবুঁনা। এইরূপ পরিবর্ত্তন প্রাকৃতেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু অপভ্রংশে ইহার প্রয়োগ বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়।

অপভ্রংশের কিছু নমুনা বৌদ্ধাচার্য্যগণের দোহাতেও মিলিয়া থাকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধগান ও দোহা নামক গ্রন্থে সরোজবজ্রের এবং কৃষ্ণাচার্য্যের কতকগুলি দোহা মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি দোহা তাহা হইতে এখানে সঙ্কলিত হইল—

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউ পরমথে পবিন।
কোটিহ মাহ এক জত হোই নিরংজনলীণ॥

অর্থাৎ—লোকে এই বলিয়া গর্ব্বিত হয় যে, তাহারা পরমার্থতত্ত্বে প্রবীণ হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক কোটী যোগীর মধ্যে হয়তঃ একজন নিরঞ্জনে লীন হইতে পারে।

আগমবেঅপুরাণে পংড়িত্ত মান বহংতি।
পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভ্রময়ন্তি॥

অর্থাৎ—আগমবেদপুরাণে পণ্ডিত হইয়া অনেকের মনে পরমার্থসত্যাভিমান জাগরিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অবস্থা এই যে, আগমাদি বাহ্যশাস্ত্রের প্রতি রুদ্ধদৃষ্টি হেতু তাহারা গভীর তত্ত্বামৃত-রসের আস্বাদন করিতে পারে না, যেমন অলিগণ পক্ক শ্রীফলের বাহিরেই ভ্রমণ করে, কিন্তু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার রসভোগ করিতে পারে না।

এহু মণ মেল্লহ পবণ তুরঙ্গ সুচঞ্চল।
সহজ সহাব স বসই হোই নিচ্চল

অর্থাৎ—পবন এবং তুরঙ্গের ন্যায় এই সুচঞ্চল মন যখন পরিত্যাগ করা যায়, তখন সহজ-স্বভাবে মন নিশ্চল হইয়া বসে।

জব্য হি মণ নিচ্চল থক্কই।
তব্য ভবসংসারহ মুক্কই॥

অর্থাৎ—যখন মন নিশ্চল হইয়া থাকে, তখন ভব-সংসারের ধারণা হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

জহি মন পবন ন সঞ্চরই
রবি শসি নাহ পবেশ।
তহি বট চিত্ত বিসাম করু
সরহে কহিঅ উবেশ॥

অর্থাৎ—যখন মন-পবন সঞ্চরণ করে না, এবং গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাবরূপ রবিশশীরও প্রবেশ বারিত হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে চিত্ত বিশ্রাম করে—সরহ এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

কায়বাকমন জাব ণ বিভজ্জই।
সহজসহাবে তাব ণ রজ্জই॥

অর্থাৎ—কায়বাক্য এবং মন পৃথকীকৃত না হইলে সহজ-স্বভাবে অনুরক্তি জন্মিতে পারে না। ইত্যাদি।

অপভ্রংশের পরবর্ত্তী স্তরে প্রাচীন বাঙ্গালার স্থান নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। পালি ও প্রাকৃত যেমন বহুকাল কথ্যভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া পরে সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, অপভ্রংশ হইতেও ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালা বহুকাল কথ্যভাষারূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, পরে তাহা সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হইয়াছে। ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত চর্য্যাপদগুলিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ স্তর পর্য্যন্ত ভাষার যে ক্রমিক অপচয়ের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছিল, প্রাচীন বাঙ্গালার সময়ে আসিয়া যেন তাহা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধগামী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ প্রাকৃত অপেক্ষাও তৎসম

শব্দের বহুল প্রয়োগ এই সকল চর্য্যাপদে লক্ষিত হয়। পঙ্ক, চঞ্চল (চর্য্যা—১), কুম্ভীর (২), গম্ভীর, অনুত্তর (চর্য্যা—৫), কুণ্ডল (চর্য্যা—১১), তরঙ্গ (চর্য্যা—১৩), গঙ্গা, মাতঙ্গী (চর্য্যা—১৪), ইত্যাদি। পালিতে ন এবং ণ উভয়ই রহিয়াছে, আর প্রাকৃতে এবং অপভ্রংশে একমাত্র ণই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু চর্য্যাপদে উভয়েরই প্রয়োগ লক্ষিত হইয়া থাকে, যথা—মণ (চর্য্যা—২০), এবং মন (চর্য্যা—৩০)। পালিতে শ ও ষ এর পরিবর্ত্তে একমাত্র স'ই ব্যবহৃত হয়, আর কোন কোন প্রাকৃতে একমাত্র শ, অন্যত্র একমাত্র স'এর ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। অপভ্রংশেও স'ই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু চর্য্যাপদে শ, ষ, স এই তিনটিরই প্রয়োগ লক্ষিত হয়, যদিও ইহাদের উচ্চারণ বিশিষ্টতা রক্ষিত হয় নাই। এই সময়ে যে সংস্কৃতের আদর্শ গৃহীত হইতেছিল তাহার নিদর্শন শক্তি, শশী (চর্য্যা—১১), শঙ্কা (চর্য্যা—৩৭), শান্তি (চর্য্যা—২৬), শিখর (চর্য্যা—৪৭), প্রভৃতি শব্দে পাওয়া যায়। আধুনিক কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালায় যে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশী লক্ষিত হয়, ইহার প্রারম্ভ চর্য্যার সময়েই হইয়াছিল। আবার অপভ্রংশের পরেই প্রাচীন বাঙ্গালার উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া অপভ্রংশের প্রভাবও চর্য্যার ভাষায় বিশেষরূপে পতিত হইয়াছে। অপভ্রংশের জিম (সং—যদ্বৎ—জেম—জিম ; তুº—প্রা—জেব্ব), তিম (সং—তদ্বৎ—তেম—তিম) উক্তরূপেই চর্য্যাতে (১৩, ২৯ সং দ্রষ্টব্য) মিলিয়া থাকে। অপভ্রংশের পণু (সং—পুনঃ), বিণু (সং—বিনা) চর্য্যাতে (১৪ এবং ২৩ সং দ্রষ্টব্য) ঐরূপেই পাওয়া যায়। প্রাকৃতে যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়, যথা—মার্গ স্থানে মগ্‌গ। কিন্তু উক্ত কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও অপভ্রংশে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হইয়া থাকে, যথা—গঙ্গা স্থানে গঙ্গ। চর্য্যার ভাষাতেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়, যথা—আবিশসি—আইসসি স্থলে অইসসি (চর্য্যা—১০), আচার স্থলে অচার (চর্য্যা—১১), অনাহত স্থলে অণহ (চর্য্যা—১৬) ইত্যাদি। অপভ্রংশে ম স্থানে বঁ-এর প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, যথা—ভ্রমর স্থলে ভবঁরু, কমল স্থলে কবঁলু ইত্যাদি। চর্য্যাতেও ইহার দৃষ্টান্ত মিলিয়া থাকে, যথা—যমুনা স্থলে জবুঁণা হইয়া জউণা (চর্য্যা—

১৪)। প্রাকৃতে আত্মা স্থানে বিকল্পে অপ্পা হয় (অন্যত্র অত্তা), কিন্তু অপভ্রংশে ইহা সর্ব্বত্র অপ্পা'তে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে চর্য্যাতে অপণা (৬, ২২ ইত্যাদি), অপণে (৩, ২২ ইত্যাদি), এবং অপা (৩১, ৩২ ইত্যাদি) পদের সৃষ্টি হইয়াছে। পালি ও প্রাকৃতে অকারান্ত বিশেষ্যের প্রথমার একবচনেও বিভক্তির প্রয়োগ হয়, কিন্তু অপভ্রংশে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে ইহা উকারে পরিণত হইয়াছে। ইহারই ফলে গতঃ স্থানে গউ, এবং যমলোকম্ স্থানে জমলোউ অপভ্রংশে পাওয়া যায়। চর্য্যাতেও ইহার দৃষ্টান্ত মিলিয়া থাকে। ২৭ সংখ্যক চর্য্যাতে কৃতম্ স্থানে কিউ। অন্যত্র স্থিতম্ হইতে থিউ হইয়া বুলথেউ (চর্য্যা—১৫), বোলথি (চর্য্যা—২৬) এবং অতারিউ চটারিউ (ঐ) প্রভৃতি। অপভ্রংশের অপাদানের বিভক্তি হু চর্য্যার থেপহু (চর্য্যা—৪) পদে রক্ষিত হইয়াছে। সং—অহম্ জাত অপভ্রংশের হউং চর্য্যাতে হাঁউ (হাউঁ) রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (১০, ২০ সং চর্য্যা দ্রষ্টব্য)। ক্রিয়ার রূপে অপভ্রংশের প্রভাবও লক্ষিত হয়। সং—প্রবিশতি হইতে প্রাকৃতে পবিসই হইয়া অপভ্রংশের পইসই একাধিক চর্য্যাতে (৬, ৭, ১৪ প্রভৃতি সংখ্যক চর্য্যা দ্রষ্টব্য) পাওয়া যায়। ইহার বর্ত্তমান রূপ পশে। সং—খাদতি হইতে প্রাকৃতের খাঅই হইয়া অপভ্রংশের খাই চর্য্যাতে খাই, খাঅ। সেইরূপ সং—যাতি হইতে জাই (চর্য্যা—২), জাঅ (চর্য্যা—৪, ৩৩), এবং জায় (চর্য্যা—৪০)। এইভাবে অপভ্রংশের প্রভাবের নিদর্শন লইয়া প্রাচীন বাঙ্গালা গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার কিছু কিছু বিশেষত্ব এখানে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

প্রাকৃতে এবং অপভ্রংশে ঋ, ঐ, ঔ এর ব্যবহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু চর্য্যাতে এই সকল স্বরের ব্যবহার সংস্কৃতের আদর্শে পুনরায় প্রচলিত হইয়াছে। যথা—দৃঢ় (চর্য্যা—৯, পাঠান্তর), তৈলোত্র (চর্য্যা—৩০), জৌবণ (চর্য্যা—২০), চৌকোটি (চর্য্যা—৩৭), চৌদীস (চর্য্যা—৬), চৌর (চর্য্যা—৩৩)। দ্রষ্টব্য এই যে, ইহাদের প্রাকৃত রূপের সন্ধানও চর্য্যাতে মিলিয়া থাকে, যথা—দিঢ় (চর্য্যা—১, ৩ ইত্যাদি), ঘিণ (চর্য্যা—৩১), চউদিস (চর্য্যা—৮) ইত্যাদি। ন, ণ, শ, ষ, স এর ব্যবহার যে চর্য্যাতে প্রচলিত হইতেছিল তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই

প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণ বিশিষ্টতা রক্ষিত হয় নাই, কারণ চর্য্যাতে মণ (চর্য্যা—২০) এবং মন (চর্য্যা—৩০) এই উভয়প্রকার প্রয়োগই রহিয়াছে, এবং ৫০ সংখ্যক চর্য্যাতেই শবর, ষবরালী ও সবর রূপে একই শব্দের বর্ণবিন্যাসে তিনটি শকারই পাওয়া যায়। সেইরূপ যাই (চর্য্যা—১০), এবং জাই (চর্য্যা—২, ১৪), আর যোগী (চর্য্যা—১১) এবং জোই (চর্য্যা—১০, ১৯ প্রভৃতি)। বর্ত্তমান সময়েও বাঙ্গালাতে এই সকল উচ্চারণ বিভিন্নতা যে রক্ষিত হয় না, তাহার সূচনা চর্য্যার সময়েই লক্ষিত হয়, এবং ইহা মূলতঃ প্রাকৃত প্রভাবজাত। এখন আমরা শব্দ ব্যবহার করিয়া এই উচ্চারণ পার্থক্য প্রদর্শন করি। চর্য্যাতে কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, করণ ও অধিকরণ কারকে কখনও কোন বিভক্তিই ব্যবহৃত হয় নাই, যথা—

কর্ত্তৃকারকে—কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল (চর্য্যা—১)

কর্ম্মকারকে—বান্ধন তোড়িউ (চর্য্যা—৯)

করণকারকে—বাটই সো তরু সুভাসুভ পানী (চর্য্যা—৪৫)

অধিকরণে—হাক পড়অ চৌদীস (চর্য্যা—৬)

পালি ও প্রাকৃতে বিভক্তি ব্যবহারের নিয়ম রহিয়াছে, যদিও একাধিক কারকে একই বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অপভ্রংশে কখনও কখনও কর্ত্তৃ ও কর্ম্মকারকে বিভক্তিবর্জ্জিত পদের প্রয়োগ রহিয়াছে (যথা—বিসংটুল, এবং নিচ্চল—অপভ্রংশের দৃষ্টান্তে উদ্ধৃত প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই রীতির অনুকরণে উক্ত চারিটি কারকে চর্য্যাতে বিভক্তিহীন পদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ইহারই প্রভাব "রাম খাইতেছে", "ভাত দেও" প্রভৃতি বাক্যে আধুনিক বাঙ্গালাতেও লক্ষিত হয়। অন্যত্র কর্ত্তৃকারকে ও, এ বিভক্তি পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে অপভ্রংশের উ ওকাররূপে কর্ত্তৃকারকে ব্যবহৃত হইয়াছে। মতান্তরে ইহা শৌরসেনী প্রভাব-জাত। কর্ত্তৃকারকের এ তৃতীয়ার এন বিভক্তিজাত। কর্ম্মকারকের এঁ, এ এবং অধিকরণের এঁ, এ, ই, অহি, অই, হি, হ প্রভৃতি বিভক্তি সং—অস্মিন হইতে অপভ্রংশের (এবং কোন কোন প্রাকৃতের) অহিং

হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সপ্তমীর বিভক্তি, কিন্তু পরে ইহা দ্বিতীয়াতে সংক্রামিত হইয়াছে। সং—অন্ত হইতে সপ্তমীর ত বিভক্তির উৎপত্তি। তে রূপে ইহাতে দুইবার সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। করণের তেঁ এই ত + এন বিভক্তি-জাত। করণের এঁ এবং এ—এন বিভক্তি হইতে উৎপন্ন। সম্বন্ধের কৃতজাত ক, এবং কেরক জাত র বা এর ষষ্ঠীতে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং এই ক পরে দ্বিতীয়া ও চতুর্থীতে সংক্রামিত হইয়াছে। সম্বন্ধের আ, আহ সং—অস্য হইতে উৎপন্ন। অপভ্রংশের হু অপাদানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্ব্বনামের উত্তম পুরুষে হাঁউ, অম্হে, অহ্মে, আম্হে, মই, ম, মোএ, মো, মোহোর প্রভৃতি রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সং—অহম্ হইতে হাঁউ অপভ্রংশের প্রভাবজাত, আর বৈদিক অস্মে হইতে অম্হে, আহ্মে, আম্হের উৎপত্তি হইয়াছে। সং—ময়া হইতে মই, ম, মোএ রূপের উদ্ভব, আর সং—মম হইতে অপভ্রংশের প্রভাবে মব হইয়া মো, এবং ইহাই মূল শব্দরূপে গৃহীত হইয়া মোহোর প্রভৃতি পদের সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্যম পুরুষে তু, তই, তো, তুম্হে, তুহ্মে, তো, তোহোর প্রভৃতি রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সং—ত্বম্ হইতে তুম্ হইয়া তু বা তো, সং—ত্বয়া হইতে—এন বিভক্তি যোগে তই, সং—তব হইতে তো, তোহোর ইত্যাদি, এবং অস্মে পদের সাদৃশ্য-বোধক সম্ভাবিত তুস্মে হইতে তুম্হে, তুহ্মে প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। নাম পুরুষে স, সো, তে, তা, তসু, তাহের, তহিঁ প্রভৃতি রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সং—সঃ হইতে মাগধী প্রাকৃতের সি হইয়া সে, তৃতীয়ার তেন হইতে তে, অপভ্রংশের প্রভাবে সঃ হইতে সো (শৌরসেনী প্রভাবেও হইতে পারে), সং—তস্য হইতে তা, তাহের, আর তস্মিন্ হইতে অপভ্রংশের প্রভাবে তহিঁ রূপের উৎপত্তি। ক্রিয়াবিভক্তিতে বর্তমান কালে উত্তম পুরুষে মি, ম, ই, এ, হুঁ, মধ্যম পুরুষে সি, এবং প্রথম পুরুষে ই, অ, এ, অই, অন্তি, অন্তি, অথি প্রভৃতি বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সং—একবচনের বিভক্তি মি, ও বহুবচনের মস্ হইতে মি, ম, ই, এ, এবং অহম্ জাত হঁউ হইতে হুঁ বিভক্তির উৎপত্তি। মধ্যম পুরুষের বিভক্তি সি চর্য্যাতে তদ্বৎ ব্যবহৃত হইয়াছে, আর প্রথম পুরুষের তি হইতে ই,

অ, এ, অই, বিভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। বহুবচনের অন্তি চর্য্যাতে অনুকৃত হইয়াছে, এবং ইহার সহিত হি যোগে অতি, অথি বিভক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। অতীত কালের ক্রিয়ায় অ, আ, উ, ও, ড়, ল প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সংস্কৃতে অতীত ঘটনা বুঝাইতে ব্যবহৃত ক্ত প্রত্যয় হইতে অ, এবং বিশিষ্টার্থে আ, আর ইহা হইতেই অপভ্রংশের প্রভাবে উৎপন্ন ও এবং উ। এই ত হইতেই ড় বিভক্তির উৎপত্তি, যথা—গীত—গাইত—গাইদ—গাইড়। অন্যত্র গত+ইল্ল—ইল=গাইল। আধুনিক বাঙ্গালায় এই ল বিভক্তির প্রাবল্য লক্ষিত হয়। ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি ইব, সংস্কৃতের তব্য প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালাতেও ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে এই বিভক্তিই ব্যবহৃত হয়।

চর্য্যার পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও মঙ্গলকাব্যাদির মধ্য দিয়া ভাষা আধুনিক বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। চর্য্যা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তৎসম শব্দের প্রয়োগ অনেক বেশী। পুরাণ ও গীতগোবিন্দের আদর্শ অনুসরণ করাতে কবি সংস্কৃতের প্রভাবাধীনে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাকৃতে ঋ, ঐ, ঔ এই বর্ণত্রয়ের প্রয়োগ নাই, কিন্তু চর্য্যাতে ইহাদের ব্যবহার পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। চর্য্যা অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহারা মূলের অধিক নিকটবর্ত্তী। তুলনীয় দৃঢ় (কৃঃ কী) এবং দিঢ় (চর্য্যার একাধিক স্থানে), যৌবন (কৃঃ কী) এবং জোবণ (চর্য্যা—২০) ইত্যাদি। চর্য্যাতে শ, ষ, স, ন, ণ, য, জ অবিচারিত ভাবে ব্যবহৃত হইলেও মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত আদর্শানুযায়ী প্রয়োগ লক্ষিত হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকাংশ স্থলেই মূলকে অনুসরণ করা হইয়াছে। পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ন্যায় চর্য্যা ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই, একাধিক হইলেই বহুবচন ব্যবহৃত হয়। আবার সংস্কৃত শব্দরূপ অনুযায়ী বহুবচনের কোন বিশিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত এই উভয় গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। তৎপরিবর্ত্তে গণ, সকল প্রভৃতি সংখ্যাবোধক শব্দ ব্যবহারের দ্বারা সাধারণতঃ বহুবচন বুঝান হইয়া থাকে। তথাপি চর্য্যা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আধুনিক বাঙ্গালার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। চর্য্যাতে রা বা

এরা বিভক্তির প্রয়োগ নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা—

আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী।
পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে ভরাসিল মণে।

আধুনিক বাঙ্গালায় ইহা হইতেও আমরা তোমরা প্রভৃতি পদের উদ্ভব হইয়াছে।

চর্য্যাতে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণে, এবং অতীত কালের ক্রিয়ার স্ত্রীলিঙ্গে ই এবং ঈ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—তোহোরি কুড়িআ (চর্য্যা—১০), রাতি পোহাইলী (চর্য্যা—২৮) ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে, যথা—বড়াই লইআঁ রাহী গেলী সেই থানে (২য় সং, ১৩৬ পৃঃ), কিন্তু সর্ব্বত্র নহে, যথা—সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে (ঐ)। আধুনিক বাঙ্গালায় এই রীতি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে, স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণেও বিভক্তি প্রয়োগ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয় না। কারকের অনেক বিশিষ্টতাও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অধুনা কর্ত্তৃ ও কর্ম্মকারকের একবচনে অনেক সময় কোন বিভক্তিই ব্যবহৃত হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে সঙ্কলিত উদ্ধৃত উল্লেখে "বড়াই", "রাহী" ও "রাধা" শব্দে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। চর্য্যার সময়েই ইহার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। করণের দ্বারা, দিয়া প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল, যথা—দূত দিআঁ পাঠাইলে কপূর তাম্বুলে (২য় সং, ১৬৫ পৃঃ)। চর্য্যাতে এই রীতি অনুসৃত হয় নাই। অপভ্রংশের প্রভাবজাত হুঁ বিভক্তি চর্য্যায় অপাদান কারকে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহা পরিত্যক্ত হইয়া নূতন শব্দের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ভ হএ, অথবা—আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মনে, ইত্যাদি[১]। ইহা প্রাকৃত "হিংতো" প্রত্যয়েরই রূপভেদ মাত্র। ইহা হইতেই পরবর্ত্তী কালে "হইতে" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ২য় সং, ভূমিকা, ১৶০ পৃঃ।

বিভক্তির অপচয়ে যখন কারকগুলিও বিশেষত্ব বর্জ্জিত হইয়া পড়ে, তখন ভাব প্রকাশের জন্য নূতন শব্দের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সময়েই ইহার সূচনা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কর্ত্তৃকারকের একার, তৃতীয়ার এ, এঁ (এন জাত), কর্ম্ম, সম্প্রদান ও ষষ্ঠীর ক (কৃত জাত), ষষ্ঠীর র, এর (কেরক জাত), সপ্তমীর এ, এঁ, ত (অস্মিন্ ও অন্ত জাত) প্রভৃতি বিভক্তি চর্য্যার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্ব্বনামের উত্তমপুরুষে হাঁউ অপভ্রংশের প্রভাবে চর্য্যাতে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর তৎপরিবর্ত্তে বৈদিক অস্মে হইতে উৎপন্ন আহ্মা, আহ্মি, আহ্মে, এবং মম জাত মো, মোঁ প্রভৃতি প্রথমা বিভক্তিতে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত উল্লিখিত বিভক্তি যোগে অন্যান্য কারকের সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্যমপুরুষে অপভ্রংশের প্রভাব-জাত তুম্হইং—তুম্হই—তুম্হি হইতে তুহ্মি, তবজাত তো, তোঁ প্রভৃতি বিভক্তি-যোগে বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তিগুলি প্রায় চর্য্যার অনুরূপ।

সংস্কৃত হইতে পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাঙ্গালার মধ্য দিয়া কিরূপে আধুনিক বাঙ্গালা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে প্রদর্শিত হইল—

সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাং	আধুনিক বাং
অহম্	অহং	অহং	হউং	হাঁউ	হম্, হাম্ (অপ্রচলিত)
অস্মে	অম্হে	অম্হে	অম্হি	অহ্মে, আহ্মে, অম্ভে	আমি
ময়া	ময়া	মএ, মই	মই	মই, মোএ	মুই
অপর	অপর	অবর	অবর	অঅর, আঅর	আর

সংস্কৃত	পালি	প্রকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাং	আধুনিক বাং
অষ্টাদশ	অট্‌ঠাদস, অট্‌ঠারস	অট্‌ঠারহ	অট্‌ঠারহ	আঠার	আঠার
প্রবিংশতি	পবিসতি	পবিসই	পইসই	পইসই	পশে
ত্রীণি	তীণি, তিণ্ণি	তিণ্ণি	তিণ্ণি	তিণী	তিন
ভবতি	ভবতি, হোতি	হোই	হোই	হোই	হয়
রাধিকা	রাধিকা	রাহিআ	রাহিঅ	রাহী	রাই
কৃষ্ণ	কণ্হ	কণ্হ	কণ্হ	কাহ্ন, কান কাহ্নাঞি	কান কানু, কানাই ইত্যাদি

আধুনিক মাগধী ভাষাসমূহ

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পর হইতে মাগধী ভাষা আধুনিক ভাষায় রূপান্তর গ্রহণ করিতে থাকে। মাগধী অপভ্রংশ কিরূপে বর্ত্তমান ছিল তাহা এখন অনুমানের বিষয় মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। মাগধী প্রাকৃত ভাষা নিম্নশ্রেণীর ভাষারূপে সংস্কৃত নাটকাদিতে স্থান পাইয়াছে, এবং মাগধী সম্পর্কে এই চিরাচরিত ঘৃণা এবং অবহেলাই এতাবৎকাল (আধুনিক যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) ইহাকে স্থায়ী সাহিত্যিক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেয় নাই। এমন কি শৌরসেনী ভাষার প্রভাবের নিমিত্ত মাগধী প্রাকৃতের সকল বৈশিষ্ট্য আধুনিক মাগধী ভাষাসমূহে রক্ষিত হয় নাই। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বাংলা, আসামী এবং উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী এবং ভোজপুরিয়া এই ছয়টি ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাগধী প্রাকৃতের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (যথা—শ, ষ, স স্থানে শ, 'র' স্থানে 'ল', কর্ত্তায় 'এ' বিভক্তি প্রভৃতি) ইহাদের মধ্যে অল্পবিস্তর রক্ষিত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত মাগধী অপভ্রংশের

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, যথা—ষষ্ঠী বিভক্তি বুঝাইতে 'কঅ' (∠ কৃতক), কর, কের (∠ কার্য, কেরক), অতীত কাল-বোধক ইল্ল, অল্ল বা এল্ল ; ভবিষ্যৎ কাল-বোধক অব্ব, এব্ব প্রভৃতি প্রত্যয়ও উপরি উক্ত ভাষাগুলিতে পরিবর্ত্তিত রূপে প্রযুক্ত দেখা যায়। উপর্য্যোক্ত ভাষাগুলির প্রাচীন রূপ সমূহ তুলনা করিয়া এবং শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি অপভ্রংশ হইতে জাত আধুনিক ভাষা সমূহের সহিত উহাদের পার্থক্য আলোচনা করিয়া উহাদিগকে একশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া নির্ধারণ করা যায়। ইহাদের মধ্যে বাংলা এবং আসামী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত এবং সম্ভবতঃ শব্দের গঠন ও বিন্যাসের দিক দিয়া ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতক পর্য্যন্ত এই দুইটি একই ভাষারূপে পরিগণিত ছিল। অপর মাগধী ভাষাগুলির মধ্যে উড়িয়ার সম্পর্ক বাংলা এবং আসামীর সহিত সর্বাপেক্ষা নিকটতম। মৈথিলী, মগহী এবং ভোজপুরিয়াকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর মধ্যে স্থাপিত করা যায়। গ্রীয়ারসন সাহেব ইহাদিগকে বিহারী আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য মৈথিলী, মগহী এবং বাংলা, আসামী, উড়িয়ার মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়, (যথা—কর্ত্তায় 'এ', বহুবচনে 'রা', ষষ্ঠীতে 'কের', প্রথমপুরুষের অতীত কালের ক্রিয়ার সহিত বিশিষ্টার্থক 'ক' প্রভৃতি)। ভোজপুরিয়ার মধ্যে এই সকল সাদৃশ্য নাই দেখিয়া সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মৈথিলী এবং মগহীকে ভোজপুরিয়া হইতে একটি পৃথক্ শ্রেণী বলিয়াই মনে করেন। উপর্য্যোক্ত ভাষাসমূহের সাধারণ লক্ষণগুলি নির্দ্দেশ করা যাইতেছে :—

সংস্কৃতের সংবৃত 'অ' রক্ষিত হয় নাই। শ, ষ এবং স এর মধ্যে সাধারণ ভাবে উচ্চারণে 'শ' রক্ষিত হইয়াছে (বাংলায় শ, মগহী, মৈথিলী, ভোজপুরিয়ায় পশ্চিমা অপভ্রংশ প্রভাবে স এবং আসামীতে হ)। ই-কারের অপিনিহিতি। উচ্চারণ অপেক্ষা শব্দগঠনাদিতেই সাদৃশ্যের প্রাচুর্য্য অধিক, যথা—এঁ অথবা এ-দ্বারা তৃতীয়া বিভক্তি নির্দ্দেশ, ষষ্ঠীতে কর, কের, সপ্তমীতে এ, অতীত কালের ক্রিয়া বুঝাইতে 'ল', ভবিষ্যতে এবং ক্রিয়াবোধক বিশেষ্য বুঝাইতে 'ব'। সংস্কৃত ভবিষ্যৎ-কালের ক্রিয়ার 'স্য' হইতে উৎপন্ন হ স্থানে স্থানে ভবিষ্যৎ-ক্রিয়ার মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে (যথা বাং করিহ, দেখিহ=করিষ্যসি, দ্রক্ষ্যসি)।

সহায়ক ক্রিয়ারূপে হো, অহ, রহ এবং বট ধাতুর ব্যবহার। সকল মাগধী-ভাষাতেই সকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীতকালের রূপ কর্তৃবাচ্যের অনুগত এবং উহার সহিত পুরুষবোধক বিভক্তিসকল প্রযুক্ত হয়। যথা—বাংলা দেখিলি, দেখিল, দেখিলাহোঁ, দেখিলাম; আসামী—দেখিলোঁ; উড়িয়া—দেখিলি, দেখিলিউ; মগহী—দেখলী, দেখলুঁ; মৈথিলী—দেখলী, দেখলহুঁ; ভোজপুরিয়া—দেখলিঁ, দেখলোঁ। প্রথমপুরুষের সকর্ম্মক ক্রিয়া এবং অকর্ম্মক ক্রিয়ার মধ্যে রূপের পার্থক্য রহিয়াছে। যথা—বাংলা—দেখলে, কিন্তু চ'ল্‌ল। আসামী—দেখিলে, কিন্তু চলিল; মৈথিলী—দেখলক, কিন্তু চলল্; ভোজপুরিয়া—দেখলে, দেখলস, কিন্তু চলল্।

বাংলাভাষার উপভাষাসমূহ

বাংলার উপভাষাগুলি সাধারণতঃ বাংলাদেশের চারিটি ভৌগোলিক বিভাগ অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, যথা—রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গ, বরেন্দ্র বা মধ্য এবং উত্তরবঙ্গ, বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গ, এবং কামরূপ বা উত্তর-পূর্ব্ব-বঙ্গ। স্থান হিসাবে উপভাষাগুলি এইরূপ বিভক্ত হইলেও ইহা সম্পূর্ণ নহে, কারণ, অনেক স্থলে স্বতন্ত্র একটি বিশিষ্ট জাতি একরূপ ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, ইহাও কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু জাতি আসিয়া বাংলায় বাস করিতে থাকে এবং বাংলাভাষায় কথা বলিতে অভ্যস্ত হয়। তাহাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দু-একটি বিশিষ্ট জাতির ভাষায় এখনো পর্য্যন্ত তাহাদের বংশপরম্পরাগত উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য রহিয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বীরভূমের অন্তর্গত একশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ব এবং এর উচ্চারণ বিপর্য্যয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা পূর্ব্ববঙ্গেও লক্ষিত হয়। এইরূপে দু-একটি বিশিষ্ট জাতিগত ভাষাও স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। উপর্য্যোক্ত মূল চারিটি উপভাষার মধ্যে কোনোটিই আপনার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে নাই। লৌকিক এবং সংস্কৃতিমূলক আদান-প্রদান, এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে উপনিবেশ স্থাপন প্রভৃতির দ্বারা প্রত্যেক উপভাষাই অল্পাধিক পরিমাণে স্বকীয়ত্ব বিসর্জন ও পরকীয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়া

আসিয়াছে। এখন কলিকাতা বঙ্গদেশের কেন্দ্র, এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ইহার (অর্থাৎ সাধারণভাবে ভাগীরথী নদীর তীরবর্ত্তী মধ্য পশ্চিম বঙ্গের) ভাষা অধুনা সকল উপভাষাকেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে, যেমন অনুরূপ পরিস্থিতিতে পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা অন্যান্য উপভাষাগুলিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

নিম্নে উপর্য্যোক্ত উপভাষাসমূহের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা গেল—

স্বরধ্বনির উচ্চারণে বঙ্গ রাঢ় অথবা বরেন্দ্র হইতে অধিক সংরক্ষণশীল। বাংলাভাষার মধ্যযুগে ই-কারের যে অপিনিহিতি ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ব্ববঙ্গেই রক্ষিত আছে, অন্যান্য উপভাষাসমূহ (সর্বাপেক্ষা অধিক পূর্ব্বরাঢ়ের চলিত ভাষা) অভিশ্রুতি দ্বারা উহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছে। যথা—পূর্ব্ববঙ্গ—কইর‍্যা, রাইখ্যা; পূর্ব্বরাঢ়—ক'রে, রেখে। পশ্চিম বঙ্গের বিবৃত 'এ্যা' ধ্বনি পূর্ব্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে উচ্চ 'এ' ধ্বনি রূপে দেখা যায়। আবার পশ্চিম বঙ্গীয় সংবৃত 'এ' ধ্বনি পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে বিবৃত 'এ' ধ্বনিরূপে দেখা যায়। তেল, এক (এ্যাক) দেশ, কেন (ক্যানো) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়। পশ্চিম রাঢ়ে কখনও কখনও 'এ' ধ্বনি 'এ্যা' রূপে উচ্চারিত হইলেও ইহা সাধু চলিত ভাষার অন্তর্গত নহে। পশ্চিমবঙ্গে অ ধ্বনিকে সংবৃত ও-ধ্বনির মত উচ্চারণ করিবার প্রয়াস দেখা যায়। আবার সাধু চলিত ভাষার ও-ধ্বনি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্তভাগে এবং পূর্ব্ববঙ্গে উ-রূপে উচ্চারিত হইতেছে। যথা—কোকিল—কুকিল, ইত্যাদি। প্রাচীন খাঁটি অনুনাসিক স্বরধ্বনির প্রকৃত উচ্চারণ পশ্চিমবঙ্গ এবং অনেক পরিমাণে উত্তরবঙ্গ বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গে এই অনুনাসিক একেবারে লুপ্ত। পশ্চিম রাঢ়ের আনুনাসিকত্বের দিকে ঝোঁক একটু বেশি—বিশেষ করিয়া ইয়া প্রত্যয়যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া পদে। যথা—রাখিঞা ∠ রাখে। পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য শব্দের উচ্চারণে আদিতে শ্বাসাঘাত দেওয়া। পূর্ব্ববঙ্গের উপভাষার মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনির মহাপ্রাণত্ব লোপ হয়। ঘ, ধ, ভ=গ, দ, ব ; ঝ=জ ; ঢ, ঢ়=ড, রহ্।

অন্যান্য উপভাষায় স্বর-মধ্যবর্ত্তী মহাপ্রাণ বর্ণ অল্পবিস্তর মহাপ্রাণতা হারাইয়াছে। আদিতে ঠিকই আছে। চ, ছ, জ, ঝ পূর্ব্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে স, জ প্রভৃতিরূপে উচ্চারিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কোনও কোনও স্থানে 'ন'এর জায়গায় 'ল' এবং 'ল'এর জায়গায় 'ন' উচ্চারিত হয় (নদী=লদী, লাঙ্গল=নাঙ্গল)। উত্তরবঙ্গীয় একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা আদি অবস্থিত 'র' ব্যঞ্জনের উচ্চারণ করে না, আবার আদিতে উচ্চারিত স্বরধ্বনির স্থানে 'র' আগম করে। যথা, রাম—আম, আম—রাম, রেলগাড়ী—এলগারী, অঞ্জন—রঞ্জন। পশ্চিমবঙ্গে স্বর-মধ্যবর্ত্তী 'হ' অপেক্ষাকৃত কম জোরের সহিত উচ্চারিত হয়। আদিতে অবস্থিত 'হ'ধ্বনি পশ্চিমবঙ্গীয় এবং উত্তর-মধ্যবঙ্গীয় উপভাষায় রক্ষিত আছে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে ইহা একেবারে লুপ্ত (যথা হইবে=অইব)। বাংলা 'শ' উচ্চারণ উত্তর বঙ্গে 'হ', পূর্ববঙ্গে সাধারণতঃ আদিতে উচ্চারিত শ-কারই 'হ'এ পরিণত হয়। চট্টগ্রামের উপভাষায় ক, প যথাক্রমে 'খ' এবং 'ফ'এ পরিণত হয়—ফ আবার 'হ' হইয়া যায়, এবং স্বর-মধ্যবর্ত্তী অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিও বহুল পরিমাণে লোপ পায়।

দক্ষিণ-পশ্চিমের বঙ্গভাষা বিশেষ্যের রূপে বহুবচনে 'মান', 'মেন' ব্যবহার করে, ইহা উড়িয়ার সদৃশ। পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠীর বহুবচনে এবং তির্য্যকরূপের বহুবচনে দের, দিগ এবং দি প্রযুক্ত হয়। 'দের' বরেন্দ্রতেও পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ববঙ্গে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কুল শব্দ হইতে বহুবচনে পশ্চিমবঙ্গে গুল, গুলা, গুলাক, পূর্ব্বরাঢ়ে গুনো, বরেন্দ্রে, গুলা, উত্তরবঙ্গে গুলা, গিলা, গ্লা, বঙ্গে গুলাইন, গুন। গৌণ কর্ম্ম ও সম্প্রদানে রাঢ়, বরেন্দ্র এবং কামরূপে 'কে' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়, বঙ্গে সচরাচর 'রে'। অধিকরণে—রাঢ়ে -তে; বরেন্দ্রে— -তে, -ত; কামরূপ এবং বঙ্গে -ত। সহায়ক শব্দের ব্যবহারেও কোথাও কোথাও পার্থক্য লক্ষিত হয়। যথা রাঢ়ে—সঙ্গে, বঙ্গে—সাথে, লগে। ক্রিয়ার রূপেও উপভাষাগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ মধ্যমপুরুষে 'উ' ব্যবহার করে। যথা—'তুই চলু,' চলবু। বরেন্দ্র এবং উত্তরবঙ্গেও এই উ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পশ্চিম রাঢ়ে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে অতীত

কালের উত্তমপুরুষে 'ই' প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—মুই দিলি। পশ্চিমবঙ্গীয় উত্তমপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি লুম্=মধ্যযুগের লুঁ, লোঁ। কামরূপেও ইহাই। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে—লাম। সাধুভাষায় -লাম এবং -লাম 7 -লেম গৃহীত হইয়াছে। সংযুক্ত ক্রিয়ার বর্তমান ঘটমান রূপে রাঢ় এবং বঙ্গে পার্থক্য রহিয়াছে, যথা—সাধুভাষার চলিতেছে=পশ্চিমবঙ্গে চলছে, চলচে=বরেন্দ্র চল্-সে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ চইল্‌তেছে=চইল্‌তেসে।

বাংলাভাষার শব্দসম্পদ্

বাংলার শব্দসমষ্টিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—১। তদ্ভব, ২। তৎসম, ৩। অর্দ্ধ-তৎসম, ৪। দেশী, ৫। বিদেশী। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি আর্য্যভাষা হইতে আসিয়াছে, অতএব এগুলি মৌলিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। অপর দুইটি (দেশী এবং বিদেশী) আর্য্যভাষার সহিত অসম্পর্কিত, অতএব আগন্তুক। ইহাদের মধ্যে বিদেশী শব্দ বলিতে ভারতবর্ষের বাহিরের ভাষা হইতে যেগুলি আসিয়াছে সেগুলিকে বুঝায়।

তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃতের সমতুল্য। তৎ-শব্দে সংস্কৃত বুঝায়। যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাংলায় অবিকৃত ভাবে চলিতেছে, সেগুলি এক্ষেত্রে তৎসম; যেমন চন্দ্র, ধর্ম্ম, নূতন, দার্শনিক প্রভৃতি।

বৈদিক সংস্কৃত ভাষা হইতে যুগব্যাপী পরিবর্তনের ফলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আসিয়া যেগুলি বর্ত্তমানরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেগুলি তদ্ভব। এগুলি লইয়াই বঙ্গভাষা-নদীর আসল প্রবাহ। আমাদের কথাবার্ত্তার অধিকাংশ এই তদ্ভব শব্দগুলি অধিকার করিয়া আছে। উদাহরণ—আয়ান (∠মধ্য বাং আইহণ ∠অহিঅণ্ণ ∠অহিবণ্ণ ∠অভিমন্যু), ঝি (∠ঝিঅ ∠ঝীআ ∠ধীআ ∠ধীদা ∠দুহিতা), ওঝা (∠ওজ্‌ঝাঅ ∠উবজ্‌ঝাঅ ∠উপাধ্যায়)।

আবার কতকগুলি শব্দ রহিয়াছে যেগুলি অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ নহে, আবার বৈদিক সংস্কৃত হইতে যুগব্যাপী পরিবর্ত্তনের ফলেও আসে নাই। সংস্কৃত ভাষা

প্রাকৃত ভাষাকে প্রথম হইতেই শব্দ সম্পদের দিক্ দিয়া ধনী করিয়া আসিয়াছে। যুগে যুগে প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত হইতে শব্দের ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার আবির্ভাবের পর হইতে সংস্কৃত হইতে ধার করা হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা সংস্কৃত উচ্চারণ অবিকৃত রাখিতে পারে নাই, সেগুলির নাম পণ্ডিতেরা দিয়াছেন, অর্দ্ধ-তৎসম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে কৃষ্ণ শব্দটি বাংলায় তৎসম, কৃষ্ণ হইতে কনহ্ হইয়া উৎপন্ন কানু বা কানাই শব্দ তদ্ভব, কিন্তু কৃষ্ণ শব্দের বিকৃত উচ্চারণ 'কেষ্ট' শব্দটি অর্দ্ধতৎসম। এইরূপ শ্রদ্ধা 7 ছেদ্দা, কৈলাস 7 কৈলেস, অমৃত 7 অমেত্ত।

আর্য্যভাষার আগমনের পর হইতেই অনার্য্য ভাষা তাহাকে প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে। প্রাকৃত যুগের তো কথাই নাই, বৈদিক যুগেও আর্য্যভাষার মধ্যে কিছু কিছু অনার্য্য শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল। পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,— অম্ব, নানা, নীর, মীন, শব, পূজা প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ সম্ভবতঃ অনার্য্য। প্রাকৃত যুগের যে সকল অনার্য্য শব্দ যুগব্যাপী পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, প্রাকৃতের বিচারে সেগুলি দেশী পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও বাংলাভাষার দিক্ দিয়া সেগুলি তদ্ভবেরই সামিল। বাংলার প্রকৃত দেশী শব্দ সেইগুলি যেগুলি অপভ্রংশ হইতে বাংলা ভাষা গঠিত হইবার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলায় প্রবেশলাভ করিতেছে। এরূপ অনার্য্য শব্দ বাংলায় বহু রহিয়াছে। যথা—ডাহা, ডাক, ডিঙ্গা, ঝিঙা, ঝোল, ডাবর প্রভৃতি।

বিদেশী শব্দের পর্য্যায়ে পড়ে ফারসী এবং ফার্সীর মধ্য দিয়া কয়েকটি আরবী ও তুরকী শব্দ, আর পোর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ডাচ্ এবং ইংরেজি শব্দ। বাংলায় ফারসী শব্দ প্রথম প্রবেশলাভ করে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, তুর্কী আক্রমণের পর হইতে। তবে মোগল আমলের আগে ইহা বাংলা ভাষাকে তত বেশি প্রভাবিত করিতে পারে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই আমরা ইহার সন্ধান পাই। মুসলমানদের সংস্পর্শে আসিয়া বহু ফারসী শব্দ যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালায় প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভারতচন্দ্রের সময়ে ইহা একরূপ চরমে উঠে। মুসলমান ধর্ম্ম, রাজ্যশাসন, আইন, কুস্তি, বিলাসের দ্রব্য প্রভৃতি

বিষয়ক বহু শব্দ এইরূপ বাংলায় চলিয়া যাইতেছে। যথা—আমীর, উজীর, খেলাৎ, দরবার, খাস, তাঁবু, সরকার, দপ্তর, দরখাস্ত, নালিশ, দরবেশ, শহীদ্, মসজিদ, বুজরুক, আতর, আয়না, গোলাপ, চশমা প্রভৃতি।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে বহু পোর্তুগীজ শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। কতকগুলি একেবারে খাঁটি বাংলা হইয়া পড়িয়াছে। আনারস, আলপিন, জানালা, তোয়ালে, কেদারা, কামিজ, সাবান, নিলাম প্রভৃতি। ফরাসী এবং ডাচ্ শব্দ অধিক নহে। ফরাসী—কার্তুজ, কুপন, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি। ডাচ্—হরতন, ইস্কাবন, রইতন, তুরুপ প্রভৃতি তাসখেলা বিষয়ক কয়েকটি শব্দ।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইংরাজি শব্দের প্রবেশ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে এবং কিছুদিন হইল সম্ভবতঃ চরমে উঠিয়াছিল। বর্ত্তমানে মাতৃভাষার দিকে লেখকগণের দৃষ্টি অধিক পড়ায় সকল বিষয় বাংলা শব্দ দ্বারা রচনা করাই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তথাপি বহু ইংরেজি শব্দ বাংলায় আসিয়া উহার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে এবং কতকগুলি একেবারে খাঁটি বাংলা হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে কোনওক্রমে সরাইতে পারা যাইবে না। যথা,—গেলাস, হাসপাতাল, লাট, ইস্কুল, ডাক্তার, ট্রাজেডি, কমেডি, রোমাণ্টিক, ভোট ইত্যাদি।

বাংলা কারক-বিভক্তি

বাংলায় কারক-নির্দ্দেশ দুই প্রকারে হইতে পারে।

১। সহায়ক শব্দের দ্বারা বা অনুসর্গের দ্বারা

২। বিভক্তি-যোগে

আধুনিক বাংলায় বিভিন্ন কারকে নিম্নলিখিত বিভক্তিগুলি দেখা যায়।

কর্ত্তা—এ, য়

করণ—এ, য়

অধিকরণ—এ, য়, ত, তে, এতে।

তির্য্যক অধিকরণ—এ, য়

কর্ম্মে এবং চতুর্থী বিভক্তিতে—এ, য়

সম্বন্ধে—র, এর

চতুর্থী—কে, রে, এরে

উহাদিগের মধ্যে 'এ'-বিভক্তিটি (আকার ও ওকারের পর য়) বৈদিক সংস্কৃত কারক-বিভক্তির একমাত্র শেষ চিহ্ন। অপরাপর বিভক্তিগুলি আধুনিক কালে উৎপন্ন হইয়াছে, বৈদিক সংস্কৃত হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পওয়া যায় নাই। এখন এই এ' বিভক্তির মূল দেখা যাক্।

কর্ত্তায় মাগধী প্রাকৃতে বৈদিক অঃ, অং স্থলে 'এ' হইত। অপভ্রংশযুগে সম্ভবতঃ এই 'এ' 'ই'তে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু এই 'ই' বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। অতএব বোধহয় কর্ত্তায় অকঃ প্রত্যয় হইতে অএ 7 অই 7 এ বাংলায় কর্ত্তার বিভক্তিরূপে আসিয়াছে। পুত্রকঃ 7 পুত্তগে 7 পুত্তএ 7 পুত্তই 7 পুতে। প্রাচীন বাংলায় 'ভাদে ভণই' 'কুম্ভীরে খাই'। মধ্য বাংলায় 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে'। কর্ত্তার এই বিভক্তির উৎপত্তিতে করণ একবচনের এন-জাত এঁ, এ এবং বহুবচনের এভিঃ 7 অহি 7 অই 7 এ বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। রামে মারে, লোকে বলে, সবে মিলি প্রভৃতি দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে করণ কারকের বিভক্তির প্রভাব রহিয়াছে।

করণের 'এন'-জাত। চর্য্যায় মাংসেঁ, অকিলেসেঁ, নাবেঁ, বোহেঁ। কৃষ্ণকীর্ত্তনে হাথেঁ মারে। ক্রমশঃ অনুনাসিক লুপ্ত হইয়া বর্ত্তমান 'এ'তে পরিণত হইয়াছে। অধিকরণের 'এ' এবং করণের 'এ' মিলিয়া যাওয়াতে অধিকরণের ত প্রত্যয় করণে আসিয়াছে দেখা যায়, যেমন,—'ঘোড়াতে'।

অধিকরণ এবং তির্য্যকরূপের 'এ'—বৈদিক 'অধি', 'ধিং', প্রাকৃতে হি, হিং হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত অস্মিন্ হইতে জাত 'অস্মি'ও প্রাকৃতে দেখা যায়। ইহা উপরোক্ত অহি, অহিংতে মিশিয়া গিয়াছিল। এই অহি বাংলার সপ্তমীতে 'এ' বিভক্তিরূপে দেখা যায়। করণের 'এঁ' এর সহিত একরূপ হইয়া যাওয়াতে

অধিকরণের এই 'এ' এঁ রূপেও দেখা যায়। প্রাচীন বাংলা এবং মধ্য বাংলায় 'অহি'ও রহিয়াছে। যথা,—টাএ, হিঅহি, পহিলেঁ, ঘরে, খণহিঁ ইত্যাদি। চর্য্যাপদে বহুস্থানে -ত-যুক্ত অধিকরণ কারকের পদ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—মাঙ্গত, বাটত, সাঙ্কমত, টালত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে—'তোহ্মাত মজিল চিত'। ইহা সংস্কৃত 'অন্তঃ' শব্দজাত। প্রাচীনকাল হইতেই কর্ম্মে বা চতুর্থীতে 'এ' বা এঁ দেখা যায়। যথা,—'সহজে থির করি', 'দেহ মোরে সরসবচনে' প্রভৃতি ইহাও অধি 7 অহি প্রভাবজাত।

সম্বন্ধের 'র', 'এর' কার্য্য, কেরক হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় 'ক' যোগে সম্বন্ধ নির্দ্দেশিত হইতেছে দেখা যায়, যথা,—ছান্দক বান্ধ, আপণ কাজক লাগি সবই বিকলী। এই 'ক' কৃত-জাত। ইহা চতুর্থী এবং দ্বিতীয়াতেও প্রযুক্ত দেখা যায়।

ক্রিয়ার কাল

বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালভেদে বাংলায় ক্রিয়ার সর্ব্বশুদ্ধ দশ প্রকার রূপ দেখা যায়। যথা—

১। বর্ত্তমান—(১) নিত্যবৃত্ত
(২) ঘটমান
(৩) পুরাঘটিত
(৪) অনুজ্ঞা

২। অতীত—(৫) সাধারণ
(৬) নিত্যবৃত্ত
(৭) ঘটমান
(৮) পুরাঘটিত

৩। ভবিষ্যৎ—(৯) সাধারণ
(১০) অনুজ্ঞা

ইহাদের মধ্যে (১), (৪), (৫), (৬), (৯) এবং (১০) সংখ্যক কালের ক্রিয়ার

রূপ 'সরল' বলা যাইতে পারে, অপরগুলি যৌগিক অর্থাৎ অন্য ক্রিয়াপদের যোগে গঠিত। বাংলায় বচন ভেদে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্ত্তিত হয় না। পুরুষভেদে ইহাদের রূপ প্রদত্ত হইল। উদাহরণ—কর্ ধাতু : সাধুভাষার রূপ :—

	১মপুরুষ		মধ্যমপুরুষ		উত্তমপুরুষ
বর্ত্তমান	সাধারণ	সম্মানবাচক	তুচ্ছার্থক	সাধারণ	সম্মান-বাচক
(১) নিত্যবৃত্ত	করে	করেন	করিস্	কর	করেন	করি
(২) ঘটমান	করিতেছে	করিতেছেন	করিতেছিস্	করিতেছ	করিতেছেন	করিতেছি
(৩) পুরাঘটিত	করিয়াছে	করিয়াছেন	করিয়াছিস্	করিয়াছ	করিয়াছেন	করিয়াছি
(৪) অনুজ্ঞা	করুক	করুন	কর্	কর	করুন	রূপ নাই
অতীত—						
(৫) সাধারণ	করিল	করিলেন	করিলি	করিলে	করিলেন	করিলাম
(৬) নিত্যবৃত্ত	করিত	করিতেন	করিতিস্	করিতে	করিতেন	করিতাম
(৭) ঘটমান	করিতেছিল	—ছিলেন	—ছিলি	—ছিলে	—ছিলেন	—ছিলাম
(৮) পুরাঘটিত	করিয়াছিল	—ছিলেন	—ছিলি	—ছিলে	—ছিলেন	—ছিলাম
ভবিষ্যৎ—						
সাধারণ	করিবে	করিবেন	করিবি	করিবে	করিবেন	করিব
অনুজ্ঞা	করিবে	করিবেন	করিবি, করিস, করিও		করিবেন	রূপ নাই।

উপরি-উক্ত ক্রিয়ারূপগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রথম এবং মধ্যম পুরুষে সম্মানবাচক ক্রিয়ারূপ সর্ব্বদাই এক। নিত্যবৃত্ত বা সাধারণ বর্ত্তমান কালের এবং বর্ত্তমান অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদগুলি সংস্কৃত বর্ত্তমান কালের (লট্ বিভক্তির) ক্রিয়াপদ হইতে পরিবর্ত্তন ক্রমে আসিয়াছে। সাধারণ অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদগুলি প্রত্যয়মূলক, অর্থাৎ তাহারা প্রত্যয়যুক্ত সংস্কৃত ধাতু হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, আর অপর ক্রিয়াপদগুলি 'আছ' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন বলিয়া যৌগিক।

করে, খায় (খাএ), যায় (জাএ) প্রভৃতি প্রাকৃত করই, খাঅই, জাই,

সংস্কৃত করোতি, খাদতি, যাতি প্রভৃতি হইতে আসিয়াছে। সম্মানসূচক পদের 'ন' সং বহুবচনের অন্তি হইতে আসিয়াছে। আদি মধ্যবাংলায় ইহা 'অন্তি' রূপেই দৃষ্ট হয়, যথা,—করন্তি', গেলান্ত দেবরাজে। করিস্=সং করিষ্যসি 7 করিহসি 7 করিস্। কর=করহ=করথ। 'ই'-যুক্ত উত্তম পুরুষের পদ 'মি'-যুক্ত সংস্কৃত উত্তম পুরুষের একবচন হইতে আসিয়াছে। মধ্যবাংলায় চলোঁ, করোঁ প্রভৃতি পদ দেখা যায়। উহা 'চলামঃ', 'কুর্ম্মঃ' হইতে আসিতে পারে, আবার চল্ কর্ ধাতুর সহিত অহম্ 7 অহকং জাত ওঁ যুক্ত হইয়াও উৎপন্ন হইতে পারে। অনুজ্ঞার ১ম পুরুষের 'ক' স্বার্থে। 'উ' সংস্কৃত স্ব হইতে স্সু, তৎপরে 'থ'-জাত 'হ' এর প্রভাবে 'হু' হইয়া আসিয়াছে। মধ্যবাংলায় এই 'উ', 'ক' প্রত্যয়ের পরেও যুক্ত দেখা যায়—আধুনিক যাউক, হউক, দেউক প্রভৃতি স্থানে জাকু, হকু, দেকু প্রভৃতি। সংস্কৃত অ-বিভক্তিযুক্ত মধ্যমপুং অনুজ্ঞার পদ হইতে মধ্যমপুরুষ কর্ চল্ প্রভৃতির উৎপত্তি। কৃকীতে 'ই', ঈ যুক্ত ১ম পুরুষের অনুজ্ঞার পদ দেখা যায়, যথা,—'প্রভু হরিআঁ হেন নাহি করী', চর্যাতে হো-হী, জাহী। ইহা সংস্কৃত লোট্ 'হি'এর অনুসরণে গঠিত।

সংস্কৃত লুঙ্ লঙ্ এবং লিট্ এর ক্রিয়ারূপ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া ত-প্রত্যয়যুক্ত ভূতকালবাচক বিশেষণ পদই প্রাকৃতে অতীত কালের দ্যোতক পদরূপে গৃহীত হইল। এইরূপ গতঃ, কৃতঃ, চলিতঃ হইতে গদো কিদো চলিদো 7 গঅ, কিঅ, চলিঅ প্রভৃতি পদ প্রাকৃতে অতীতকালবোধক রূপে চলিতে লাগিল। অপভ্রংশযুগে এই সকল রূপের সহিত সংস্কৃত -'ল' প্রত্যয়জাত ইল, অল 7 ইল্ল, অল্ল যুক্ত হইল। এইরূপেই গেল, চলিল, করিল, মৈল প্রভৃতি পদ সৃষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয়ের অন্ 7 অন্ত, ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া করিত, যাইত প্রভৃতি নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ক্রিয়া পদের সৃষ্টি করিয়াছে। ভবিষ্যতের 'ব'-যুক্ত ক্রিয়াপদ 'তব্য' প্রত্যয় হইতে জাত। কৃ+তব্য=কর্ত্তব্য= করিঅব—এব্ব 7 করিব্ব 7 করিব। এইরূপ 'তব্য' প্রত্যয়জাত ক্রিয়াপদ প্রাচীন বাংলাতে এবং আদি মধ্যযুগের বাংলাতেও ভাববাচ্যে ছিল। পরে ইহার কর্ত্তৃবাচ্য-বোধকতা গড়িয়া উঠে। চর্য্যাপদে 'মই দিবি পিরিচ্ছা', কৃকীতে

'তোহ্মে জাইবে মার' প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার মধ্যম-তুচ্ছার্থক 'করিস্', 'করিষ্যসি' হইতে জাত। করিও ∠ করিহ—করিষ্যথ হইতে করিহহ হইয়া উৎপন্ন।

যৌগিক ক্রিয়াপদগুলি ধাতুর সহিত -ইতে অথবা -ইয়া যোগের পর 'আছ' ধাতুর যোগে উৎপন্ন। সাধুভাষায় যেখানে -ইতে+আছধাতু যোগে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়, চলিতভাষায় সেখানে মূলধাতু এবং আছ ধাতু এই দুই ধাতুর যোগে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেইরূপ করিয়া যাইয়া=করে' যেয়ে+ছে=করেছে, যেয়েছে ইত্যাদি।

বহুবচন

একবচন এবং বহুবচনের মধ্যে পার্থক্য অপভ্রংশ যুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ধ্বনি-পরিবর্ত্তনের ফলে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় সর্ব্বত্র উহা রক্ষিত হয় নাই। সংস্কৃত করণকারকের বহুবচনের এবং ষষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি বাংলা কর্ত্তৃকারকের বহুবচনরূপে কোথাও কোথাও রক্ষিত হইয়াছে দেখা যায়, যথা,—'লোকে বলে', 'সবে মিলি'=লোকেভিঃ, সর্ব্বেভিঃ=লোকৈঃ, সর্বৈঃ আমি, তুমি=অস্মাভিঃ, যুষ্মাভিঃ। ষষ্ঠীর বহুবচনের—আনাম্ 7 ণ, ন অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। গুলিন, গুলান, নানান=কুলানাম্, নানানাম্। সর্ব্বনাম তান (তাঁহার অর্থে)=প্রা°—তাণং=সং তেষাম্। ণং 7 ণ্‌হ 7 হঁ সর্ব্বনামে দেখা যায়, যথা—যেঁহ, তেঁহ, দোঁহে প্রভৃতি। 'সবাই' শব্দ (মধ্যবাং সব্বাই) সম্ভবতঃ সর্ব্বেভিঃ হইতে আগত হইয়াছে।

যাহাই হোক সংস্কৃত বহুবচনের বিভক্তি সাধারণভাবে প্রাচীন বাংলায় লুপ্ত হইয়াছে ইহা বলা যায়, এবং সহায়ক শব্দের দ্বারা বহুবচন জ্ঞাপন করা নিয়ম হইয়া পড়িয়াছে। চর্য্যাতেই এইরূপ, জণ, সএল (সকল), লোঅ প্রভৃতি শব্দের পরিচয় পাই, যথা—বিদুজন লোঅ, অন্তে কুলীনজণ, মণ্ডল সএল ভাজই প্রভৃতি। মধ্যবাংলায় ক্রমশঃ গণ, সকল, সব, সব্ব, আদি, কুল প্রভৃতি বহুত্ব-বোধক শব্দের পরিচয় পাই।

আধুনিক বাংলায় প্রাণীবাচক (সাধারণতঃ মনুষ্যবাচক) শব্দের তির্য্যকরূপে দিগ, ষষ্ঠী-দিগের চলিত ভাষায় (-দি, -দের) শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। আদি শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' যুক্ত 'আদিক' শব্দ হইতে—দিগ, দিগ্‌দি প্রভৃতি বিভক্তির উদ্ভব। সম্ভবতঃ মধ্যবাংলায় পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মানুষ+আদি=মানুষাদ, ষষ্ঠী মানুষাদের=মানুষেদের =মানুষদের এইরূপে আধুনিক বাংলায় আসিয়াছে। 'কার্য', 'কের' হইতে এর বিভক্তি আদিক শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া 'দিগের' শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা ব্যতীত সভা 7 সভ, কুল 7 গুলা প্রভৃতি বহুবচনবোধক শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছে। সাধুভাষায় অনেক সংস্কৃত বহুবচন বোধক শব্দের পরিচয় পাই, যথা—সকল, সমূহ, সমস্ত, বর্গ, কুল, লোক, চয়, নিচয়, রাশি প্রভৃতি। ফারসীর মধ্য দিয়া আগত 'মহল' শব্দটিও বহুবচনজ্ঞাপক বলিয়া বহুস্থানে চলিয়া গিয়াছে।

আধুনিক ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ বহুবচন জ্ঞাপক বিভক্তি হইতেছে, রা অথবা এরা। প্রথমে হয়ত ইহা অনুসর্গ ছিল, পরে বিভক্তিরূপে স্থান লাভ করিয়াছে। ষষ্ঠীর -র, -এর বিভক্তিই বিশিষ্টার্থক 'আ' যোগে রা, এরা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে হয়ত আহ্মি সব, তুহ্মি সব, আহ্মারা সব, তোহ্মারা সব প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দের সহিত 'রা' এর প্রয়োগ চলিত ছিল। পরে বহুত্ব বোধক 'সব' শব্দ উঠিয়া যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই 'রা' বিভক্তির ব্যবহার অত্যল্প। পরে ইহা বিস্তৃতি লাভ করে এইরূপ অনুমিত হয়।

কর্ম্মবাচ্য

সংস্কৃত কর্ম্মবাচ্যের 'য্‌' স্থানে প্রাকৃত 'ইঅ' বা 'ইজ্জ' ব্যবহার করিত। প্রাকৃতে আত্মনেপদীয় রূপ অচল হইয়া গিয়াছিল। তাই পরস্মৈপদ অনুসারেই ধাতুর রূপ চলিত। সুতরাং সংস্কৃত ক্রিয়তে, ম্রিয়তে প্রভৃতি পদের স্থানে প্রাকৃতে করিঅই, করিজ্জই, মরিঅই, মরিজ্জই পদ ব্যবহৃত হইত। ইহার মধ্যে 'ইজ্জ' যুক্ত পদ বাংলায় আসে নাই। 'ইঅ' যুক্ত পদই পরিবর্ত্তিতরূপে প্রাচীন বাংলায় ও মধ্য বাংলায় দেখিতে পাওয়া যায়। চর্য্যাপদে এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনে—

করিঅই, পাবিঅই, ভাবিঅই, দুহিএ, রাখিয়ে, জানী (=জাণিএ) প্রভৃতি শব্দের পরিচয় পাই। প্রাচীন বাংলায় 'এন'-জাত করণকারক কর্ত্তারূপে, এবং কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়ার সহিত যুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে কর্ত্তা এবং করণের রূপ প্রায় একই ছিল। 'অবলা পরাণে এত কি সহিএ', 'মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিএ' প্রভৃতি বাক্য এবং তাহাদের ক্রিয়াপদ কর্ম্মবাচ্যেরই প্রমাণ দেয়।

বাংলায় 'কলসী ভরে', বই কাটে, ছেঁড়ে, ভাঙ্গে প্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যের ক্রিয়ার প্রয়োগগুলি সম্ভবতঃ ভরিঅই 7 ভরে, ছিণ্ডিঅই 7 ছেঁড়ে, ভঞ্জিঅই 7 ভাঙ্গে প্রভৃতি কর্ম্মবাচ্যের রূপ হইতে আসিয়াছে। আধুনিক বাংলায়—'একাজ করে না, রবিবার দিন মাছ খায় না, জ্বর হ'লে নায় না' প্রভৃতি বাক্যে যেখানে কর্ত্তা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর সেখানে ক্রিয়াপদগুলিতে কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ নিঃসন্দেহ। আবার কতকগুলি ণিজন্ত রূপের ক্রিয়াও কর্ম্মবাচ্যের, যথা—বেশ মানায়, কথাটা ভাল শোনায় না, এটা তত ভাল দেখাবে না (=দেখায় না) (=এদং ণ ভদ্দঅং দক্খাবেই=এতৎ ন ভদ্রং দৃক্ষাপয়তি)।

বাংলায় -ইব, -ব যোগে যে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া গঠিত হয় তাহা সংস্কৃত তব্য প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে এবং মূলতঃ কর্ম্মবাচ্যের ছিল। যথা—তুম্হে হোইব (=যুষ্মাভির্ভবিতব্যম্), মই দিবি পিরিচ্ছা (=ময়া দাতব্যা পৃচ্ছা), আমি ভাত খাইব=মুই ভাত খাইবো=ময়া ভক্তং খাদিতব্যম্। কৃষ্ণকীর্ত্তনে—ইউ-যুক্ত অনুজ্ঞাবোধক কর্ম্মবাচ্যের রূপ দেখা যায়। যথা—করিউ (=ক্রিয়তাম্), যাইউ (=গম্যতাম্)।

আধুনিক বাংলায় কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়া বিশ্লেষণ-মূলক, অর্থাৎ একাধিক ক্রিয়া-পদের সহযোগে গঠিত। নিম্নলিখিতরূপে আধুনিক বাংলায় কর্ম্মবাচ্য গঠিত হয়: যথা, দেখ্ ধাতু—(১) আমি দেখা যাই (২) আমাকে দেখা যায় (৩) আমি দেখা পড়ি (৪) আমি দৃষ্ট হই। এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে (১), (২) ও (৪) সংখ্যক পদগুলি খাঁটি কর্ম্মবাচ্যের। (২) সংখ্যকটি এবং এইরূপ আমাকে দেখা যায়, আমাকে দেখন যায় প্রভৃতি বাক্য ভাববাচ্যের।

জা বা যা ধাতুর যোগে কর্ম্মবাচ্যের পদ গঠন করা বাংলার বিশেষত্ব। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে, কর্ম্মবাচ্যের এই 'যা' ধাতু প্রাকৃত ইজ্জ প্রত্যয় হইতে অবস্থান্তর গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ম্রিয়তে > মরিজ্জই > মরিযাই, মরিয়া যায় এইরূপ পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে। কৃকীতে জা ধাতুর বিভিন্ন কালের রূপের সহিত কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ রহিয়াছে। যথা—পড়ি গেল দিঠী, ভাঙ্গি জাএ, মরিআঁ জাইবি।

আছ ধাতুর যোগে অপ্রাণীবাচক অথবা নিম্ন প্রাণীবাচক শব্দের সহিত নিম্নলিখিত কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ আধুনিক বাংলায় দেখা যায়। যথা—এ বই আমার পড়া আছে, মাছ ধরা আছে। চল্ ধাতুর যোগেও কতিপয় বাংলা বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গী গঠিত হইয়াছে, দেখা চল্‌ল, কসে মার চল্‌ল। কর্ত্তাকে অনির্দ্দিষ্ট রাখিয়া নিম্নলিখিত রূপ যে উক্তি তাহাও কর্ম্মবাচ্যের, যথা—কি করা হয়, কোথা থাকা হয়, কোথা যাওয়া হচ্চে।

পুরুষবাচক সর্ব্বনাম

সং অহং শব্দজাত অহকং, হকং, হকে, হগে প্রভৃতি শব্দর্ব্ব প্রাকৃতে বর্ত্তমান ছিল। উহাদের মধ্যে হকে, হগে > হই বাংলায় দেখা যায় না। হকং হগং > হউঁ, হাঁউ প্রাচীন বাংলায় উত্তমপুরুষ-বাচক সর্ব্বনামরূপে দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বাংলার হাঁউ মধ্যবাংলায় লোপ পাইয়াছে, এবং বৈদিক ময়া > মই বা ময়া+এন > মই॰ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলাতে মই করণরূপে ব্যবহৃত রহিয়াছে। প্রাচীন বাংলায় অপর একটি রূপ মো, এবং ইহার সহিত এন-জাত এঁ, এ যোগ করিয়া মোএঁ, মোএ প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয়। আধুনিক বাংলায় ইহা 'মুই' রূপে দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমানে সাধারণতঃ আমি শব্দের দ্বারা উত্তমপুরুষের একবচন দ্যোতিত হইয়া থাকে। ইহা বৈদিক বহুবচন অস্মে > প্রাকৃত অমৃহে, অমহি > আহ্মে, আহ্মি-এর সহিত অস্মাভি > অম্‌হহি > আম্‌হহি > আহ্মে আহ্মির যোগে গঠিত। চর্য্যাপদে আমৃহে আম্‌হি প্রভৃতি বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ক্রমশঃ ইহা একবচনের রূপ পাইয়াছে। কৃকীতেও কর্ত্তায় মো এবং আহ্মে বা আহ্মির মধ্যে তফাৎ রহিয়াছে, যথা—মো করোঁ কিন্তু আহ্মে করিএ, করি।

কর্ত্তার 'মুই' এবং 'আমি' ব্যতীত আধুনিক বাংলায় তির্য্যকরূপে মো এবং আমা দেখা যায়। 'মো' বৈদিক 'মম' হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন বাংলায় ইহা কোথাও কোথাও 'ম'। চর্য্যায় এই মো কোথাও 'হ' (অস্ম-জাত) এর সহিত যুক্ত দেখা যায়। ইহাদের উপর বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে, যথা—মোর, মোহর, মোহ, মোহে, মোএ, মোএঁ, মুঞি, মোকে, মোতে ইত্যাদি। আমা বৈদিক অস্ম হইতে অম্হ, আমহ হইয়া 'আ' যোগে আসিয়াছে। এই 'আ' সম্ভবতঃ সম্বন্ধদ্যোতক ছিল। কারণ মধ্যবাংলায় বহুস্থানে 'র' বিহীন আহ্মা শব্দ ষষ্ঠীতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এজবুলি পদে মঝ, মঝু প্রভৃতি শব্দ দেখা যায়। ইহারা মম 7 মজ্ঝ এর অপভ্রংশ।

মধ্যমপুরুষে প্রাচীন বাংলায় 'তু' এবং তো দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বৈদিক ত্বং 7 তুমং-তুব-তু, হইতে আসিয়াছে। চর্য্যাপদে—তু লো ডোম্বী, সুন হরিণা তো। এই তু অধুনা লুপ্ত এবং তো+এন 7 এঁ, এ হইয়া আধুনিক 'তুই' চলিতেছে। তুই ব্যতীত আধুনিক কর্ত্তার তুমি—মধ্যবাংলা তুহ্মি, তোহ্মে =প্রাচীন বাং তুম্হি, তুম্হে—বৈদিক যুষ্মে 7 তুষ্মে 7 তুম্হে এবং যুষ্মাভিঃ 7 তুম্হহি—এই দুই পদের সহযোগে উৎপন্ন। চর্য্যার তুম্হে হোইব, তুম্হে যাইব =যুষ্মাভিঃ (তুষ্মাভিঃ) ভবিতব্যম্, যাতব্যম্।

মধ্যমপুরুষের তির্য্যকরূপে আধুনিক বাংলায় তো এবং তোমা ব্যবহৃত রহিয়াছে। এই তো 'তব' হইতে জাত। চর্য্যাপদে ইহা সম্বন্ধবাচক রূপে রহিয়াছে; যথা—তো মুহ, কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে। এই 'তো' এর সহিত হ, হো যোগ করিয়া এবং তাঁহার সহিত কার্য্য কর 7 র যোগে বিচিত্র সম্বন্ধ-বাচক পদ গঠিত হইয়াছে। যথা—তোহ, তোহর, তোর, তোরা ইত্যাদি। করণে ত্বয়া+এন 7 তুই রূপের সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্য বাংলায় 'তোঁ' পদ কর্ত্তায় ব্যবহৃত দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহা তম্হাণ 7 তুম্হহঁ 7 তোণ, তোহঁ রূপে আসিয়াছে।

তির্য্যক 'তোমা' 'আমা' র মত যুষ্ম 7 তুষ্ম হইতে আ যোগে আসিয়াছে। ব্রজবুলির তুহু, তুয়া, তুয় প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে তবকং, ত্বয়া, তুজ্ঝ প্রভৃতি শব্দের অপভ্রংশ রূপ।

প্রথম পুরুষের পুংলিঙ্গ কর্ত্তার 'সে' সম্ভবতঃ সকঃ 7 মাগধী শকে, শগে হইতে আসিয়াছে। তেন 7 তেঁ এর কিছু প্রভাবও থাকিতে পারে। ক্লীবলিঙ্গ কর্ত্তার তাহা তির্য্যক রূপের 'তাহা' হইতে আসিয়াছে। এই তির্য্যক তা, তাহা ষষ্ঠীর তস্য 7 তাহ (7 তা) হইয়া বিশিষ্টার্থক আ যোগে গঠিত হইয়াছে। ইহার উপর আবার সহায়ক শব্দ এবং প্রত্যয় যোগে বিভিন্ন কারকের পদ গঠিত হইয়াছে, যথা—তাহর, তাহার, তাক, তাহে, তায় তাহাকে, তাহাতে, তাহা দিয়া ইত্যাদি। চর্য্যায় আমরা কর্ত্তায় 'তে' রূপের ব্যবহার দেখি। ইহা সংস্কৃতের অনুকরণও হইতে পারে, আবার করণের তেন+হি হইতেও আসিতে পারে। মধ্যবাংলার সম্মানবাচক তেহঁ, তিহঁ প্রভৃতি শব্দ করণ ও ষষ্ঠীর বহুবচনের পদ হইতে আসিয়াছে। আধুনিক বাংলায় সম্মানবাচক তিনি এইরূপ ষষ্ঠী এবং করণের সহযোগে উৎপন্ন।

সাহিত্য

চর্য্যাপদ

এই জগৎ দুঃখ-বারিধি, আর মানব ইহাতে সতত সঞ্চরণশীল জীবমাত্র। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতির মধ্য দিয়া মানব অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, অথচ এই জীবনটাকে উপভোগ করিবার অদম্য বাসনার নিবৃত্তি হয় নাই। উষ্ট্র বদরিকা বৃক্ষের পত্র আহার করে, কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত মুখ বাহিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হয়, তথাপি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। সেইরূপ শত কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া আমাদেরও যখন "সদা আঁখি ঝুরে, মুছি এক করে, অন্য করে বোঝা তুলি যে মাথায়।" ইহাই মোহ বা অবিদ্যা। কবি সত্যই বলিয়াছেন—"জীবনটা উন্মাদের প্রলাপের ন্যায় অর্থহীন, ইহার বাহ্যাড়ম্বর কেবল ব্যর্থতায়ই পর্য্যবসিত হয়"।[১]

জীবনের এই শোচনীয় পরিণতি প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের চিন্তাধারাকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করিয়াছিল। সাংখ্য-দর্শনের প্রথম সূত্রেই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইহারও পূর্ব্বে উপনিষদে জগতের অনিত্যতা-বিষয়ক আলোচনা দ্বারা মোক্ষলাভের উপায় সম্বন্ধে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। এই যুগ-প্রভাব বুদ্ধদেবও অতিক্রম করিতে পারেন নাই। জন্ম-জরা-মৃত্যু প্রভৃতি জনিত দুঃখ, এবং তাহা প্রশমনের উপায় নির্দ্দেশ করাই বুদ্ধদেবের জীবনের ব্রত হইয়াছিল। সাংখ্য-বেদান্তের ন্যায় তিনিও প্রচার করিলেন যে, মোক্ষ বা নির্ব্বাণ-লাভই দুঃখ-নিরোধের প্রকৃষ্ট উপায়। বুদ্ধ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্য ঋষিগণের প্রতীক মাত্র। এইজন্যই হিন্দু-শাস্ত্র তাঁহাকে অবতার রূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

১। It is a tale told by an idiot,
Full of sound and fury signifying nothing.
—Shakespeare.

দুঃখ নিবারণের উপায় কি? এই বিষয়ে ধারণা করিতে হইলেই দুঃখের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, যেহেতু দুঃখের মূল উৎপাটিত করিতে পারিলেই ইহার আর অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। তত্ত্বের দিক দিয়া এই বিষয় নানাভাবেই আলোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে-প্রত্যেক কার্য্য আমাদের ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই কর্ম্মসমষ্টিই পঞ্চস্কন্ধ আশ্রয় করিয়া জন্মজন্মান্তরে রূপায়িত হইয়া উঠে। কর্ম্মের হেতু হইতেই প্রত্যয়ীভূত জগতের উদ্ভব হয়। এই জাগতিক ব্যাপার সমস্তই এইজন্য কার্য্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই কর্ম্মবশ্যতারই নামান্তর আধ্যাত্মিক অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে যথাক্রমে সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শাদি বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভাব, জাতি এবং দুঃখের উৎপত্তি হয়। অতএব এই অবিদ্যাকে চিরতরে ধ্বংস করিতে পারিলেই দুঃখের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির কল্পনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে পুরুষই নিত্যসংজ্ঞক, চিরমুক্ত ও বন্ধন-রহিত, কিন্তু প্রকৃতির সাহচর্য্যেই তাহার বন্ধনদশা, এবং তাহাতেই দুঃখের উৎপত্তি। অতএব এই প্রকৃতি বা অবিদ্যার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই আর দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বেদান্তের ব্রহ্ম মায়াধীশ, আর জীব মায়াবশ। এই মায়া-বশ্যতাই জাগতিক জ্ঞানের উৎপত্তি করিয়া জীবকে দুঃখ-সাগরে নিপাতিত করে। অতএব মায়ার ধ্বংস সাধনই জীবের পরমপুরুষার্থ, এবং দুঃখ-বিমুক্তির প্রকৃষ্ট পন্থা। এইরূপে একই তত্ত্ব নানাভাবে বিবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্ব-বিচারে বৌদ্ধগণ কিছু নূতন সংজ্ঞার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা আত্মা-পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যাহা প্রচারিত হইয়াছে তাহা প্রাচীন সত্যেরই প্রকারভেদ মাত্র। পরমাত্মা নাই, কিন্তু আছে ধর্ম্মকায়, যাহার স্বরূপ পরমাত্মার ন্যায়ই নিরুপাধি। যাবতীয় ধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু সমুহ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই ধর্ম্মকায়। ইহা বেদান্তের "ধর্ম্মাত্মস্য যতঃ" সূত্রেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। তারপর পরমাত্মা-জাত জীবাত্মার ন্যায় ধর্ম্মকায় হইতে উদ্ভূত হয় বোধিচিত্ত, যাহা আত্মার ন্যায়ই শাশ্বত

ও নিত্যসংজ্ঞক, কিন্তু অবিদ্যার মোহে বস্তু জগৎ প্রত্যক্ষ করে, আবার এই মোহমুক্ত হইলেই ধর্ম্মকায়ে লীন হইয়া স্বাধিষ্ঠানে তৎস্বরূপত্ব লাভ করে। ইহা বেদান্তের "সোঽহম্" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি নীতি বাক্যকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

যাহাই হউক, সাংখ্য-বেদান্তের ন্যায় বৌদ্ধশাস্ত্রেও প্রচারিত হইয়াছে যে, মোক্ষ বা নির্ব্বাণলাভই দুঃখ-নিরোধের প্রকৃষ্ট উপায়। নির্ব্বাণ অর্থে বাসনার নিবৃত্তি। বাসনাধার চিত্ত যখন অচিত্ততায় লীন হয়, তখনই নির্ব্বাণ-লাভ ঘটে। পরবর্ত্তী কালে নির্ব্বাণের স্বরূপ লইয়া বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন ইহা অবাস্তব ও অভাব-স্বভাব, আবার কেহ বলিয়াছেন ইহা বাস্তব ও ভাব-স্বভাব। প্রকৃতপক্ষে পার্থিব বস্তু সকলের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া অবিদ্যার মোহ ধ্বংস করত যাবতীয় তৃষ্ণার বিলোপ-সাধনেই নির্ব্বাণ লাভ হয়। এইজন্য নির্ব্বাণ স্বভাবতঃ করুণা-স্বভাব ও আনন্দময়। অবিদ্যাই আমাদিগকে অহং-ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই অহঙ্কার হইতেই দ্বৈতজ্ঞানের উদয় হয়। সীমাবিশিষ্ট আত্মজ্ঞান হইতেই ধারণা জন্মে যে, তুমি এবং সে প্রভৃতি আমা হইতে পৃথক্। ইহা হইতেই আত্মপর ভেদজ্ঞানের উদ্ভব হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে যখন বুঝিতে পারা যায় যে, আমি, তুমি, সে প্রভৃতি সকলেই এক পরম কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, এবং বাহ্যিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা স্বরূপতঃ ভেদ-রহিত, তখন পরই আপন পর্য্যায়ে গৃহীত হয়, আর সর্ব্ববিধ দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে সমদর্শিতাহেতু সর্ব্ব-সত্ত্বায় করুণার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য নির্ব্বাণের সহিত করুণার অভিনত্ব স্বীকৃত হয়। নির্ব্বাণ সুখময়ও বটে, কারণ কামনার ধ্বংসে দুঃখের নিবৃত্তিতেই নির্ব্বাণ লাভ হয়। অতএব নির্ব্বাণের সহিত করুণা ও মহাসুখ বিজড়িত রহিয়াছে। নির্ব্বাণের এই সুখবাদ হইতেই পরবর্ত্তী কালে সহজিয়া মতের উদ্ভব হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই মহাসুখ তত্ত্ব মাত্র, কিন্তু সহজিয়ারা ইহার রূপ প্রদান করিয়াছেন, ইহার নামকরণ করিয়াছেন, ইহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইনি নৈরাত্মা দেবী, নামান্তরে পরিশুদ্ধাবধূতিকা,

শূন্যতার সহচারিণী। সাধক যখন পার্থিব মোহ ছিন্ন করিয়া শূন্যতায় লীন হন, তখন নৈরাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি যেন মহাশূন্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন—

কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ-মেহেলী।
(চর্য্যা—৫০)।

সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।
(চর্য্যা—২৮)।

তান্ত্রিক মতে ইহার আবাস-স্থান দেহ-সুমেরুর শিখর প্রদেশে অর্থাৎ উষ্ণীষকমলে—

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসঈ সবরী বালী।
(চর্য্যা—২৮)।

সহজ অর্থে সহজাত। যে ধর্ম্ম যে বস্তুর সহিত জন্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহা তাহার সহজ। বৌদ্ধগণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু আমরা যে বোধিচিত্ত তাহার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন, আর এই বোধিচিত্ত যে ধর্ম্মকায় হইতে উৎপন্ন, তাহাও প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্মকায়ের বিশিষ্টতা এই যে ইহা নিত্য, করুণাময়, এবং আনন্দপূর্ণ। বৃহত্তম স্বর্ণপিণ্ড হইতে আহরিত ক্ষুদ্রতম পরমাণুতে যেমন স্বর্ণের বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়, সেইরূপ বিভু ধর্ম্মকায় হইতে উৎপন্ন বোধিচিত্তেও ধর্ম্মকায়ের বিশেষত্ব বর্ত্তমান থাকে। অতএব নিত্যত্ব, করুণা ও আনন্দ বোধিচিত্তের সহজাত ধর্ম্ম। সংসারে আসিয়া বোধিচিত্ত যেভাবেই আত্মগোপন করুক না কেন, তাহার ঐ স্বাভাবিক বিশেষত্ব গুপ্ত বা ব্যক্ত অবস্থায় সর্ব্বদাই তাহাতে বিদ্যমান থাকে। মোহমুক্ত বা নির্ম্মল করিয়া ইহাকে ইহার স্বাধিষ্ঠানে বা পূর্ব্বস্বরূপত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই সাধকের প্রধান উদ্দেশ্য। বোধিচিত্তের এই সহজাত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সাধনার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া এই জাতীয় সাধকগণকে সহজধর্ম্মী বলা হইয়া থাকে। প্রধানতঃ আনন্দ ও করুণার বিশেষত্ব লইয়া যে ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে তাহাই সহজযান-নামক বিশিষ্ট সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আনন্দ বা মহাসুখে নিমজ্জিত হওয়াই সহজ সাধনার চরম লক্ষ্য—

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ (চর্য্যা—১)।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা (চর্য্যা—৮)।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে (চর্য্যা—১৩)।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীলেঁ (চর্য্যা—১৮)।
—ইত্যাদি।

পূর্ব্বোদ্ধৃত উল্লেখে শূন্যতাকে মেয়ে রূপে কল্পনা করিয়া সহজানন্দের প্রকৃতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শূন্যতাই সহজিয়াদের চরম প্রাপ্তি, আর ইহার সহিত মহাসুখ ও করুণা অভিন্নভাবে জড়িত রহিয়াছে বলিয়া শূন্য-তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই সহজ ধর্ম্মের মুল তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

বুদ্ধের বাণীতে রহিয়াছে—"সর্ব্বং অনিত্যম্, সর্ব্বং অনাত্মম্, নির্ব্বাণং শান্তম্।" ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, এবং ইহা হইতেই শূন্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে। সর্ব্ব অর্থে সকল ধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু সমূহ। ইহারা যে অনিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, তাহা সাধারণ বোধের দুরধিগম্য নহে। আবার ইহারাই অনাত্ম অর্থাৎ স্ব-ভাববিশিষ্ট নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বস্ত্র নামক বস্তুটি গ্রহণ করা যাইতেছে। ইহা সূত্রের সমবায়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে বস্ত্রত্ব লোপ পায়। অতএব বস্ত্রের স্বভাবত্ব বা নিত্যত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। সেইরূপ সূত্রগুলি তূলা হইতে, এবং তূলা কারণান্তর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের কাহারও নিজস্ব সত্ত্বা নাই। পার্থিব যাবতীয় বস্তুই এইরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধে উৎপন্ন বলিয়া সকলই অনাত্ম বা স্ব-ভাবহীন! বস্তু সকলের এই স্বভাব-হীনতাই শূন্যতা। বস্ত্র, সূত্র প্রভৃতি ব্যবহারিক সংজ্ঞামাত্র, কিন্তু পরমার্থতঃ ইহারা সকলেই শূন্য-গর্ভ। বস্তু সকলের অনিত্যতা সম্বন্ধে এই জ্ঞানলাভ হইলেই সংসারবন্ধন দূরীভূত হয়, কারণ তত্ত্বজ্ঞ

ব্যক্তির চিত্ত তখন আর ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না। ইহাতেই হয় ভবমোহের নিরসন।

যদি দৃশ্যাবলীর প্রকৃত অস্তিত্বই না থাকে তাহা হইলে তাহারা দৃশ্যরূপে আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয় কিরূপে? এই বিষয়ে ইউরোপীয় দার্শনিক প্লেটো একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। একদল লোক কোন অন্ধকারময় গুহার অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের পশ্চাৎভাগ সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত থাকাতে পথচারী লোকের ছায়া সেই গুহার মধ্যে পতিত হয়। সঞ্চরণশীল সেই ছায়া দেখিয়া লোকেরা ভাবে ইহাই তাহাদের বাস্তব জগৎ, এবং এই জ্ঞানেই তাহারা বিভোর হইয়া রহিয়াছে। আজ যদি কেহ আসিয়া তাহাদের এই ভ্রান্তি দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহারা হয়তঃ বিস্মিত হইয়া ভাবিবে যে, যাহা লইয়া আমরা এতদিন উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছি, কত আনন্দ আহরণ করিয়াছি, তাহা যে বাস্তবতার ছায়া মাত্র ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহারই উত্তরে আমাদের শাস্ত্র সকল বলিয়া থাকে যে, ইহা বিকল্প (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম), প্রতিভাস (যেমন মরু-মরীচিকা), এবং আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক কল্পনা মাত্র। ৪১ সংখ্যক চর্য্যাটিতে এই তত্ত্বই বিবিধ উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দৃশ্যাদির জ্ঞানের উদয় তখনই হয়, যখন ইহাদের সাড়া ইন্দ্রিয়-দ্বারে আমাদের চিত্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব জ্ঞানের আধার চিত্তেরই সর্ব্ব-প্রথম চিকিৎসিত হওয়া উচিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের বোধি-চিত্ত ধর্ম্মকায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহা স্বভাবতঃ নিত্য এবং নির্ম্মল, কিন্তু অবিদ্যার আবরণে আবৃত থাকাতে ইহা সংবৃত্তবোধিচিত্তে পরিণত হয়। 'সংবৃত্ত'-অর্থে সম্যক্‌রূপে আবৃত্ত, আর 'অনাবৃত্ত'-অর্থে 'আকাশ' বা 'শূন্যতা'। অতএব বোধিচিত্ত যদি তাহার অবিদ্যা-আবরণ ছিন্ন করিতে পারে তবেই ইহা শূন্যতায় বা তথতায় লীন হয়। কিন্তু এই সংবৃত্ত-অবস্থায় থাকাতেই চিত্ত জগৎকে সত্য বলিয়া ধারণা করে, এবং তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া চিত্তের চঞ্চলতা

বা বিভ্রান্তির উদয় হয়। অতএব চঞ্চল চিত্তকেই সংযত করা বিধেয়। এইজন্য অনেকগুলি চর্য্যাতে চিত্ত, তজ্জাত বাসনা এবং তাহার দ্বার-স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের চিকিৎসা বিহিত হইয়াছে, যথা—

চঞ্চল চীত্র পইঠা কাল। (চর্য্যা—১)

চীঅ থির করি ধরহু নাহী (চর্য্যা—৩৮) ইত্যাদি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বৌদ্ধ মতে নির্ব্বাণের বিশেষত্ব প্রধানতঃ তিনটি—(১) শূন্যতা, (২) করুণা, (৩) মহাসুখ। আর এই মহাসুখকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া সহজপন্থীরা এক পৃথক্ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই সুখ তত্ত্ববিশেষ, যুক্তি দ্বারা ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু সহজিয়ারা শুষ্ক যুক্তি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই, তাঁহারা ইহার অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির স্বরূপ-সম্বন্ধেই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছেন। মহাযান-মতে নির্ব্বাণ অনির্ব্বচনীয়, কায়-বাক্-চিত্তের অতীত, আর সহজিয়া মতে নির্ব্বাণ-জাত মহাসুখও তদ্বিধ, অর্থাৎ অবাঙ্মনসগোচর। এই জন্যই মহাসুখ-স্বরূপিণী ডোম্বীকে—

'নগর বাহিরি ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ (চর্য্যা ১০) বলা হইয়াছে।

মহাসুখের স্বরূপ সম্বন্ধে উপনিষদেও আলোচিত হইয়াছে: "আনন্দই ব্রহ্ম। প্রকাশের রমণীয়তা ও কমনীয়তা দেয় আনন্দ, আনন্দ বিকাশের উল্লাস। সে বিকাশ বাধাহীন। পূর্ণতম বিকাশেই আনন্দের প্রতিষ্ঠা। এই বিরাট বিশ্ব, তার অপরূপ দৃশ্য, তার রূপরাশি, তার অনন্ত অবকাশ—সমস্তই আমাদের আনন্দ জাগায়। বিশ্বব্যাপী আত্মাকেই আমরা এর ভেতর দেখতে পাই। তাই এরা আত্মারই বিশ্বরূপ। বিষয়ের আনন্দও ব্রহ্মানন্দ, তবুও সেখানে নাই তার পূর্ণ বিকাশ। তাই সে চিরন্তন আকর্ষণের কারণ হয় না, কারণ আনন্দ এখানে বিষয়কে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়। বিষয়কে বিষয়রূপে না দেখে আনন্দ-রূপে দেখলে, বিষয় ব্রহ্মানন্দের দিকে বাধা না হয়ে বরং উপায় হয়। এই দৃষ্টি বিষয়-দৃষ্টি নয়, ব্রহ্ম-দৃষ্টি।" (উপনিষদের আলো, ২৮-৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বৈষ্ণব সহজিয়াগণ রূপ, প্রেম ও আনন্দের সাধনা করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ

সহজিয়া ধর্ম্মের মূলতত্ত্বও অরূপ বা শূন্যতা, করুণা বা প্রেম, এবং মহাসুখ বা আনন্দ। এই হিসাবে উভয় ধর্ম্মের তত্ত্বগত ঐক্য রহিয়াছে। সীমাবিশিষ্ট রূপই সাধনার বলে আত্যন্তিক অভিব্যক্তিতে অরূপে পরিণত হয়। দৃশ্যের দেহে রূপের অভিব্যক্তি আছে বলিয়াই আমরা দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা ভালবাসি সেই অভিব্যক্ত রূপকে, আর দৃশ্যের প্রতি আকর্ষণ আসে ইহা সেই রূপের আশ্রয়স্থল বলিয়া। কিন্তু এই মাটীর দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছে। এইজন্য যাহারা তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বত রূপের সন্ধান করিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, রূপ একস্থানেই সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু ইহা প্রতি দৃশ্যে বিভিন্ন প্রকারে পরিস্ফুট হইয়া আমাদের চিত্ত বিনোদন করিতেছে, তখন রূপের সীমারেখা অসীমে মিশিয়া যায়। ইহাই অরূপ, বৌদ্ধমতে শূন্যতা এবং উপনিষদের মতে পূর্ণতা। ইহার সঙ্গে মনে উদিত হয় অপরিসীম করুণা এবং মহাসুখ, কারণ শাশ্বতরূপের সন্ধান যে পাইয়াছে, সে সমগ্র জগৎকেই তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সর্ব্বাধারে মমতাযুক্ত হয়, এবং দুঃখের চিরনিবৃত্তিতে মহাসুখে কালাতিপাত করে। অতএব তত্ত্বের দিক দিয়া উভয় সম্প্রদায়ই প্রায় একই আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহাই সংক্ষেপে চর্য্যার মূল ধর্ম্মতত্ত্ব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি চর্য্যা লইয়া এখানে আলোচনা করা যাইতেছে।

চর্য্যা—১

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ-দুখেতে নিচিত মরিঅই॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনপাখ ভিতি লেহুরে পাস॥

ভণই লুই আম্‌হে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা॥

মর্ম্মার্থ

দেহকে এখানে বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বৃক্ষের শাখা-পল্লবের ন্যায় ষড়িন্দ্রিয়-বিষয়াদি গ্রাহ্যগ্রাহকভাবে কায়াতরুর শাখা-পল্লবরূপে কল্পিত হইয়াছে।

আমাদের এই বোধিচিত্ত ধর্মকায় (মতান্তরে পরমাত্মা) হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃ আনন্দময় প্রকৃতি-বিশিষ্ট, কিন্তু অবিদ্যার আবরণে ইহা সংবৃত্ত আছে বলিয়া বিষয়ের আকর্ষণে চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এবং তাহাতেই আমরা বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া কাল-কবলিত হই। অতএব এই চঞ্চলতা দূরীভূত করিয়া মহাসুখ লাভ করিবার জন্য দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার উপায় জানিতে হয়, ইহাই পদকর্ত্তা লুইপাদের উপদেশ।

যোগ-ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি দ্বারা দুঃখের প্রভাব হইতে ক্ষণকালের জন্য মুক্ত হইতে পারা যায় মাত্র, কারণ সমাধিস্থ অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় বলিয়া দুঃখের অনুভূতি হয় না বটে, কিন্তু ব্যুত্থানে অর্থাৎ সমাধিভঙ্গে পুনরায় পার্থিব জ্ঞান উদিত হওয়াতে দুঃখ-সাগরেই পতিত হইতে হয়। "জ্ঞান-নিরপেক্ষ সবিকল্প সমাধি দ্বারা দৃশ্য মার্জ্জন হয়, ইহা মনে করিও না, কারণ এই সমাধি-কালেও সংসারের সংস্কার থাকে। এইজন্য সমাধিভঙ্গের পর তাহার স্মরণ হয়, আর সেই স্মরণই পুনঃপুনঃ সংসারাঙ্কুর প্রসব করে। নির্ব্বিকল্প সমাধিতেও দৃশ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় না। যেমন সুষুপ্তির অবসানে পূর্ব্বতন জ্ঞানের উদয় হয়, তেমনি সমাধি হইতে উত্থিত হইলেও পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অখণ্ডিত দুঃখ-পরিপূর্ণ জগৎ প্রতিভাত হয়।" এইরূপে সমাধিতে ক্ষণকালের জন্য দুঃখের নবৃত্তি, এবং ব্যুত্থানে দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া ক্লিষ্ট হইতে হয়। অতএব

সমাধি প্রভৃতি চিরস্থায়ী মহাসুখ লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়রূপে স্বীকৃত হইতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে বাসনার বন্ধন, এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশাই আমাদের যাবতীয় দুঃখের কারণ-স্বরূপ, অতএব ইহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে মহাসুখ লাভ করা যায় না। এখানে সমাধি প্রভৃতি দ্বারা ক্ষণিক চিত্তবৃত্তি-নিরোধ অপেক্ষা দুঃখের মূলীভূত কারণ বাসনার নিবৃত্তিই মহাসুখলাভের প্রকৃষ্ট পন্থারূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

এখন এই বাসনা-নিবৃত্তির উপায় কি? যতদিন ভবের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় ধারণা থাকিবে, ততদিন ইহা আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবেই। কিন্তু সংসার অসৎ অর্থাৎ ইহার প্রকৃতপক্ষে কোনই অস্তিত্ব নাই, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তিবশতঃ জগৎ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, এই ধারণা জন্মিলে এই অসার বস্তুকে উপভোগ করিবার আর প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব বাসনার বন্ধন হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। সুতরাং এই শূন্যতত্ত্ব বা জগতের অসারতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিতেছেন যে, তিনি ধ্যানে অর্থাৎ আত্মস্থ হইয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, তিনি ভব অর্থাৎ গ্রাহ্য, এবং গ্রাহক বা মনেন্দ্রিয়াদির উপর আসন করিয়া উপবিষ্ট আছেন, অর্থাৎ তাঁহার এই সিদ্ধির অবস্থায় তিনি আর ভববিকল্প দ্বারা বিচলিত হন না।

চর্য্যা—২১

নিসি অন্ধারী মুসা আচারা।
অমিঅ-ভখঅ মুসা করঅ আহারা॥
মাররে জোইআ মুসা-পবণা।
জেণ তুটঅ অবণা-গবণা॥
ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতি।
চঞ্চল-মুসা কলিআ নাশক থাতী॥

কাল মুসা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি করঅ অমিঅ পাণ॥
তাব সে মুসা উঞ্চল-পাঞ্চল।
সদ্‌গুরু-বোহে করহ সো নিচ্চল॥
জবেঁ মুসাএর আচার তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ॥

মর্ম্মার্থ

এই চর্য্যাতে প্রথমতঃ চঞ্চল চিত্তের বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে, পরে বলা হইয়াছে যে, চিত্তের চঞ্চলতা দূরীভূত হইলেই ভববন্ধন লোপ পায়। উপমাটি এইরূপ ঃ—অন্ধকার রজনীতে যেমন চঞ্চল মূষিক যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া বিবিধ মিষ্ট দ্রব্য আহার করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ চঞ্চল চিত্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হইলে রূপাদি বিষয় সমূহে সতত বিচরণ করিয়া বোধিচিত্তজ স্বাভাবিক অমৃতধারা আহার বা বিনষ্ট করে। অতএব যোগীর পক্ষে পবণের ন্যায় সতত চঞ্চল চিত্ত-মূষিককে মারা উচিত, যেন তাহার সংসারচক্রে যাতায়াত রূপ বিচরণ লোপ পায়।

এখন চঞ্চলে চিত্তের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইতেছে। পূর্ব্বেই চিত্তকে চঞ্চল মূষিকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মূষিক চঞ্চলতা হেতু নিজের দেহ বিদীর্ণ করিয়া নানাপ্রকার দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চঞ্চল চিত্ত সেইরূপ করে না বলিয়া দুর্গতি লাভ করে। ভবের প্রকৃতপক্ষে কোনও অস্তিত্ব নাই। পুঞ্জীভূত বাসনার আগার চিত্তই ভ্রান্তি বশতঃ এই জগতের কল্পনা করিয়া থাকে, অতএব এই ভবই চিত্তের স্বকায়। বাসনা-চঞ্চল চিত্ত মূষিকের ন্যায় উক্তপ্রকারে ভবস্বরূপ স্বকায় বিদীর্ণ না করিয়া সংসারচক্রে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করতঃ তির্য্যক-নরকাদি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব হে যোগি, তুমি চঞ্চল চিত্তরূপ মূষিকের প্রকৃতি-দোষ সংগ্রহ করিয়া তাহার নাশকারী হও।

ভবের অস্তিত্বের কল্পনার মধ্যে আবদ্ধ চিত্তকে সংবৃত্ত বোধিচিত্ত বলা হয়।

ইহা উক্তপ্রকারে নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করে বলিয়া নিজেরই কাল-স্বরূপ। চিত্তের কায়ারূপ ভবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, চিত্তজ রূপাদি বিষয় সমূহের কোনই অস্তিত্ব নাই, অতএব ইহা প্রকৃতপক্ষে বর্ণহীন। সুতরাং অচিত্ততারূপ শূন্যতায় লীন হইলেই ইহা মহাসুখামৃত আস্বাদন করিতে পারে।

যে পর্য্যন্ত গুরুর উপদেশ অনুসরণ করিয়া তুমি চিত্তকে নিশ্চল না করিতে পার, সে পর্য্যন্ত ইহার স্বাভাবিক চঞ্চলতা দূরীভূত হইবে না। আর ইহার স্বাভাবিক চঞ্চলতা দূরীভূত হইলেই ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

চিত্তের চঞ্চলতা সম্বন্ধীয় দুইটি চর্য্যা লইয়া এখানে আলোচনা করা হইল। এখন জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে সিদ্ধাচার্য্যগণের ধারণা কি, তাহাই ব্যক্ত করা যাইতেছে—

চর্য্যা—৪১

আইঅ অনুঅনাএ জগরে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাঁচে কি তা বোড়ো খাই।
অকট জোইআরে, মা কর হথা লোহ্না।
অইস সভাধে জই জগ বুঝিষি তুটই বাসনা তোরা।
মরুমরীচি গন্ধর্বনঅরী দাপণ-পড়িবিম্বু জইসা।
বাতাবণ্ডেঁ সো দিঢ় ভইআ অপে পাথর জইসা॥
বান্ধি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা।
বালুআ তেলেঁ সসর-সিংগে আকাশ-ফুলিলা॥
রাউতু ভণই কট, ভুসুকু ভণই কট, সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরু পাব॥

মর্ম্মার্থ

যাঁহারা পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, এই জগৎ আদৌ উৎপন্ন হয় নাই, ইহা কেবল মনের বিকল্প মাত্র, কিন্তু যাহারা অবিদ্যা তিমিরাবৃত তাহাদের

মনে ভ্রান্তির বশে এই জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রতিভাত হয়। এই ভ্রান্তি কিরূপ? রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায়। রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইলে ভয়ে চমকিত হইতে হয় বটে, কিন্তু সেই রজ্জু প্রকৃত সর্পের ন্যায় দংশন করিতে পারে না। সেইরূপ এই জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানেরও প্রকৃতপক্ষে কোনও সার্থকতা নাই। অতএব ওহে বালযোগি, এই সংসার লইয়া বিব্রত হইও না [অর্থাৎ হাতলোনা করিও না]। এইরূপ ভাবে যদি এই সংসারটাকে বুঝিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমার ভরবিকল্পজাত সর্ব্ববিধ বাসনাদোষ তিরোহিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই সংসার মৃগতৃষ্ণিকা, গন্ধর্ব্ব-নগরী এবং দর্পণ-দৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় অসার। বাতাসের অবর্ত্তমানে স্থির ভাবে অবস্থিত জলের উপরিভাগ দেখিলে যেমন পাষাণ বলিয়া ভ্রম হয়, অথবা ঘূর্ণাবর্ত্তে উত্থিত জল স্তম্ভকে যেমন সুদৃঢ় পাষাণ-স্তম্ভ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, এই সংসারের বর্ত্তমানতাও সেইরূপ দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র। বন্ধ্যা নারীর পুত্র কেলি করিয়া বহুবিধ খেলা খেলিতেছে বলিলে যেরূপ অসম্ভব বোধ হয়, অজাত জগতের দৃশ্যাদির লীলাও সেই ভাবে বুঝিতে হইবে। বালুর তেল, শশকের শৃঙ্গ এবং আকাশ-কুসুমের ন্যায় এই জগতের অস্তিত্ব অলীক কল্পনাপ্রসূত। সিদ্ধাচার্য্য ভুসুক বলিতেছেন যে, এই জগতের সকল জিনিষেরই এইরূপ স্বভাব। কেহ যদি ভ্রান্তি বশতঃ ইহা বুঝিতে না পারে তাহা হইলে কোনও সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেই প্রকৃততত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে।

এই চর্য্যাতে যে সকল উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিতে এই সকল উপমা সাহায্যেই জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে বুঝাইবার জন্য হিন্দু-শাস্ত্র এই চর্য্যা রচিত হইবার বহুপূর্ব্বেই ইহাদের প্রয়োগ করিয়াছে। বিশেষত্ব এই যে, ঐ সকল শাস্ত্রে কেবল শুষ্ক তত্ত্বালোচনাই পাওয়া যায়, আর এই চর্য্যার প্রকাশভঙ্গীতে কিছু সাহিত্য-রসের আস্বাদন করা যায়। কবিতার মধ্য দিয়া এইরূপ সরলভাবে আনন্দের পরিবেশন সাহিত্যের বিষয়ীভূত। যাহা গান করা হইত, তাহাতে সাহিত্য-রসের সমাবেশ চর্য্যাকারগণ প্রয়োজন বোধেই করিয়া থাকিবেন।

এখন জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে সহজিয়াদের ধারণা কি, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—

চর্য্যা—৪ঃ

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥
ভণ কইসে কাহ্ন নাহি।
ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ-তরঙ্গ কি সোষই সাঅর॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তে ন দেখই॥
ভব জাই, ণ আবই এথু কোই।
অইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই॥

মর্ম্মার্থ

জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাতে ভবের মোহ ছিন্ন করিয়া এখন নির্ব্বাণে সর্ব্ব শূন্যতায় তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ইহা কৃষ্ণাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধাবস্থার বর্ণনায় বলিতেছেন। অতএব তিনি এখন জন্মমৃত্যুর অতীত অবস্থায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কাজেই মৃত্যুতে আর তাঁহার ভয়ের কারণ নাই। তাই তিনি পার্থিব জনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে মূঢ় জনগণ, তোমরা আমার অভাবে বিষণ্ণ হইও না, কারণ আমার অভাবে আমার অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে, ইহা তোমরা কি প্রকারে বলিতে পার? তখন আমি যে সর্ব্বদা ত্রৈলোক্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতে থাকিব (যেমন একবিন্দু জল মহাসাগরের সহিত মিশিয়া তাহার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে) তাহা কি তোমরা বুঝিতে পার না?

পরম কারণ হইতে রূপায়িত হইয়া আমার উদ্ভব হইয়াছিল, এই রূপ-ধ্বংসে আমি আবার সেই কারণ-সাগরেই বিলীন হইব। অতএব দৃষ্ট বস্তু নষ্ট হইতেছে দেখিয়া মূর্খেরাই কাতর হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ বিষণ্ণ হইবার কোনই কারণ নাই। সাগরে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া আবার তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, যদি ইহাতে তরঙ্গের ধ্বংস সূচিত হইত, তাহা হইলে এতদিনে সাগর শুষ্ক হইয়া যাইত। যেমন পুঞ্জীভূত জলরাশি তরঙ্গের আকারে প্রকাশিত হইয়া আবার সাগরেই মিশিয়া যায় মাত্র, সেইরূপ দৃশ্যাদিরও ভাবাভাব বুঝিতে হইবে। রূপের অপচয়ে বিলোপের পরিকল্পনা ভ্রান্তি মাত্র। দুধের মধ্যে যেমন স্নেহ-পদার্থ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে, অভাবের পরেও লোক সেইভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু মূর্খেরা ইহা কিছুই বুঝিতে পারে না। ভবে নূতন কিছু আসে না, এবং ইহা হইতে কিছু চলিয়াও যায় না, অর্থাৎ উৎপাদ-ভঙ্গাদির জ্ঞান বিকল্প মাত্র। ভবের এই প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণাচার্য্য শান্তিতে বিহার করিতেছেন।

চর্য্যার রোহভূমি

ভারতবর্ষে অশোক, কনিষ্ক, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি প্রতাপশালী বৌদ্ধ নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম যে রাজানুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয় নাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা তাহার জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। ইহা যে হিন্দুধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষের ফলে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এদেশের ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রক্তপাতের দ্বারা এক ধর্ম্ম অপরকে বিতাড়িত করে নাই, কিন্তু দার্শনিক যুক্তি-তর্কের দ্বারা একে অপরের উপর প্রভূত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। এখানেও আমরা এই মত-বিরোধ-জনিত সংঘর্ষেরই সন্ধান পাইতেছি। বুদ্ধদেব ছিলেন অসাধারণ চিন্তাশীল। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে একদিকে হিন্দুশাস্ত্র আত্মা-পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে বিবিধ যুক্তি-তর্কের জটিলতার সৃষ্টি করিতেছিল, অপরদিকে যাগযজ্ঞের বহু-

প্রচলন হেতু বাহ্যাচারই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় সেই সময়েই সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ প্রচারিত হয়। এই সকল মতবাদের প্রচার করিয়াছিলেন প্রধানতঃ সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থিত ঋষি-ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ, আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ইহার আলোচনায় রসাস্বাদ করিতে পারিতেন। এই গণ্ডীর বাহিরে অবস্থিত জনসাধারণ শিক্ষার অভাবে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতা হেতু এই জটিলতার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। ইহার প্রতিকার কল্পে বুদ্ধদেব সাধারণের মঙ্গলার্থে সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়া কথ্য ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহারই ফলে পালি সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রের জটিলতা সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি আত্মা-পরমাত্মা সম্বন্ধীয় আলোচনাতেও মনোনিবেশ করেন নাই। পশুহত্যা করিয়া যজ্ঞ করিলে পরমার্থ লাভ হয়, এই ধারণাও তিনি পোষণ করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সংক্ষেপে বলিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়—ভালভাবে চল, উত্তম গতি লাভ করিতে পারিবে। তাঁহার উপদেশগুলি পরবর্ত্তীকালে সংগৃহীত হইয়া প্রাথমিক বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পরেই ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বিখ্যাত শ্রমণগণ এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচারিত হইলেও ঐতিহাসিক আলোচনায় দেখা যায় যে, ইহা তখনও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, কারণ অশোকের সময়েও ত্রিপিটকের প্রচলন ছিল এইরূপ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ ভাষা সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেব যদি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কথ্য ভাষাই ব্যবহৃত করিয়া থাকেন, তবে তাহা মাগধী প্রাকৃত হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ তিনি প্রধানতঃ মগধ-কোশলেই প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু অধুনা যে ভাষায় হীনযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি রচিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম পালি, এবং ইহা পশ্চিম ভারতীয় প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মগধের ভাষার পরিবর্ত্তে বোধ হয় কোন স্থায়ী আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই সকল উপদেশ ভাষান্তরিত করিয়া পরবর্ত্তীকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই কার্য্যে যে দুই একশত বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত

হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ইহাতে প্রভূত সংস্কার, সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সংঘটিত হইয়া থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই তাহা ধারণা করা যাইতে পারে, কারণ ধর্ম্মতত্ত্ব স্থায়ী ভাবে লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহা লইয়া আলোচনার সুযোগ লাভ করিতে পারে না। যাহাই হউক, যখন হিন্দুগণ বৌদ্ধতত্ত্ব লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন তখন দেখা গেল যে, বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে প্রচার করিয়াছেন যে, আমাদের কর্ম্ম-সমষ্টিই বিচিত্রভাবে রূপায়িত হইয়া জন্মজন্মান্তরে প্রকটিত হয়। ইহাতেই প্রকৃতপক্ষে সংঘাতের সৃষ্টি হইয়াছিল। যে দেশে আত্মার অস্তিত্বের ধারণা বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, সে দেশে এই বিচিত্র মতবাদ যে প্রসারতা লাভ করিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আত্মা-পরমাত্মা সম্বন্ধীয় জটিলতা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবার জন্য বোধ হয় তিনি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যে তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে আত্মার উল্লেখ না থাকিলেও এই নূতন পুদ্‌গল আত্মারই সমপ্রকৃতি-বিশিষ্ট, কারণ ইহা জন্মান্তর গ্রহণ করে। কর্ম্মসমষ্টির এইরূপ বিচিত্র পরিণতির কল্পনা না করিয়া আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করাই যে যুক্তিসঙ্গত তাহা পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কারণ মহাযান মতের অভ্যুত্থানের সময়েই দেখা যায় যে, পরমাত্মা ধর্ম্মকায়ে, এবং জীবাত্মা বোধিচিত্তে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন পূর্ব্ব সংঘাতেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। শুধু ইহাই নহে, মহাযানী শাস্ত্রসমূহ পালিতে রচিত না হইয়া সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতের একটা আভিজাত্য আছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বেদ-উপনিষদ্-দর্শন-পুরাণ প্রভৃতি এই ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। তাহাদের সহিত সমপর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য একদিকে যেমন এইরূপে ঔপনিষদিক তত্ত্ব প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, অপর দিকে তত্ত্বের বাহন ভাষারও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অতএব সংঘর্ষ যে কিরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা ইহা হইতে ধারণা করা যায়। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম এক

সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইবার সুযোগের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সংঘাত এখানেই শেষ হয় নাই। মহাযানী মতে সর্ব্ব ধর্ম্ম যে শূন্যতা-স্বভাব বিশিষ্ট, এইরূপ নির্ম্মল পরমার্থিক জ্ঞান হইতে প্রজ্ঞার উদয় হয়, কিন্তু ইহা নিষ্ক্রিয়, কারণ জগতের অস্তিত্বের ধারণা লুপ্ত হইবার ফলে বৈরাগ্যের উদয়ে যাবতীয় প্রবৃত্তির নিরসন হয়। অথচ ইহাকেই প্রকৃতি বলা হইয়াছে। আর জগতের দুঃখ দূর করিবার প্রবৃত্তি হইতে চেষ্টার উদয় হয় বলিয়া করুণাকে উপায় বলা হইয়া থাকে। ইহা ক্রিয়াশীল, অতএব পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষই নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতিই ক্রিয়াশীল। অতএব এখানে পরস্পর বিরুদ্ধ মতই সমর্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার মহাযানী মতে প্রকৃতিরূপিণী শূন্যতা এবং করুণারূপ পুরুষের মিলনে নির্ব্বাণে মহাসুখ লাভ হয়। কিন্তু সাংখ্যের মতে পুরুষের বন্ধন নাই, প্রকৃতির সাহচর্য্যেই তাহার বন্ধন দশা। আর প্রকৃতি-পুরুষের বিচ্ছেদেই মোক্ষ বা নির্ব্বাণ। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাথমিক যুগে হীনযানীরা বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসরণ করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিতেন মাত্র, বুদ্ধত্ব লাভ করিবার কল্পনাও করিতে পারিতেন না। এইজন্য এই মতকে শ্রাবকযান বলা হইত। আর ইঁহাদের মধ্যেই অপর একদল মনে করিতেন যে, যাঁহারা বুদ্ধ বা তাঁহার শিষ্যগণের মুখে ধর্ম্ম-উপদেশ শুনিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাই মাত্র বুদ্ধত্ব লাভ করিবার অধিকারী, কিন্তু তাহাও নিজের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য নহে। এই মতকে প্রত্যেকবুদ্ধযান বলা হইত। অথচ ইহারই পূর্ব্ববর্ত্তীযুগে উপনিষদে সোঽহম্, তত্ত্বমসি প্রভৃতি নীতিবাক্যে মানবের ঈশ্বর-স্বারূপ্য স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহার সহিত তুলনা করিলে হীনযানী মত যে কত নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই মহাযানীরা ধর্ম্মকায় ও বোধিচিত্তের কল্পনা করিয়া উপনিষদের মতের সহিত সমতা রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এইরূপ নানাভাবে হিন্দু দর্শনের সহিত বৌদ্ধমতের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়াতে ইহা ভারতবর্ষ হইতে ক্রমে ক্রমে বিতারিত হইয়াছে। বৌদ্ধ তন্ত্রের ললনা, রসনা, অবধূতী হিন্দু তন্ত্রের ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারই

নামান্তর মাত্র। ইহাতেও নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। হিন্দুগণ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেবদেবীগণকে আত্মসাৎ করিয়া যে নিজেদের পরিপুষ্টি সাধান করিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে। এইভাবে রিক্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে স্থিতি লাভ করিতে পারে নাই।

জলপ্রবাহ প্রশমিত হইবার কালে যে উচ্চস্তর পরিত্যাগ করিয়া নিম্নস্তরে আসিয়া আশ্রয় লাভ করে তাহার দৃষ্টান্ত চর্য্যাপদগুলি আলোচনা করিয়াও পাওয়া যায়। এইসকল পদে শবর-শবরী, ডোম, চণ্ডাল, কাপালিক, শুণ্ডিনী, মদ্য, সাঁকো প্রস্তুত করিয়া ভবনদী পার হওয়া, হরিণ-শিকার, আসব-পান, বাঁশ-বেতীর সাহায্যে চাঙ্গাড়ি প্রস্তুত, পটহ-মাদল লইয়া ডোম্বীকে বিবাহ করিতে যাত্রা প্রভৃতি বিবিধ রূপকের সাহায্যে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সকল চিত্র চর্য্যাকারদের মনে ফুটিয়া উঠিয়াছে কেন? যাহাদের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত করিবার জন্য তাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাদের উল্লেখই এইসকল চর্য্যায় পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয়। ইহা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সেই সময়ে কোন্ শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। ইহারও পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় যে, ধর্ম্মপূজা ডোম জাতীয় লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং একজন ডোম পণ্ডিত শূন্যপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও ধর্ম্মঠাকুর স্বরূপ নারায়ণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ চিহ্ন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ অবশেষ কি ভাবে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আত্ম-গোপন করিয়াছেন, অথবা কিভাবে হিন্দুসমাজ বৌদ্ধগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় চর্য্যাকারগণ অপভ্রংশের পরবর্ত্তীস্তরে উদ্ভূত এবং এই জাতীয় লোকদের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ কথ্য ভাষায় পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। চর্য্যাপদেই বাঙ্গালা গীতি-কবিতার প্রাচীনতম রূপের সন্ধান পাওয়া যায়।

চর্য্যার সাহিত্যিক মূল্য

চর্য্যার সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষা যখন অপভ্রংশের গর্ভ হইতে সবেমাত্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, সেই সময়ে এই সকল পদ রচিত হইয়াছিল। ইহার ফলে শব্দগুলির বাহ্যিক রূপই প্রথমতঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই সকল শব্দের সহিত আমরা পরিচিত নহি, অতএব প্রথমতঃ ইহাদের অর্থ গ্রহণ করিয়া পরে চর্য্যাতত্ত্বে প্রবেশ করিতে হয়। এইজন্য ইহার সহজ রসানুভূতিতে ব্যাঘাত জন্মে। আধুনিক কোন রচনা পাঠ করিয়া যেমন আমরা সহজেই তাহার রসাস্বাদন করিতে পারি, চর্য্যাপদের বেলা সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণব পদগুলিও প্রায় এই পর্য্যায়ভুক্ত। শব্দের ব্যূহ ভেদ করিয়া ইহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। এই পরিস্থিতির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া চর্য্যার সাহিত্যিক মূল্য নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হইতে হইতেছে।

চর্য্যাগুলি প্রাচীন কবিতার পর্য্যায়ভুক্ত। কাব্য-বিচারে ছন্দ, অলঙ্কার, ভাব, রস প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিতে হয়। ইহাদের রাসায়নিক সংমিশ্রণজাত অপূর্ব্ব আনন্দানুভূতিতেই কাব্য-পুরুষের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করা প্রাথমিক আলোচনার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ আমরা চর্য্যার ছন্দ লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। সংস্কৃত কবিতায় সাধারণতঃ অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার নাই। কিন্তু চর্য্যাপদগুলিতে দেখা যায় যে, সংস্কৃতের জাতি-ছন্দ অনুসরণ না করিয়া পদকর্ত্তৃগণ বৃত্ত-ছন্দেই পদগুলি রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই বাঙ্গালা ছন্দের মূল ভিত্তি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক চর্য্যায় অন্ত্যানুপ্রাসের প্রয়োগ লক্ষিত হয়, যথা—

আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥

অন্যত্র—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।

চঞ্চল চীএ পইঠা কাল॥ ইত্যাদি

সর্ব্বত্রই এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা পয়ার এবং ত্রিপদীর সুরের সন্ধানও চর্য্যাপদে মিলিয়া থাকে, যথা—

বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী

বাটত ভইল উছারা।

সদ্-গুরু-পাঅ পসাএঁ জাইব

পুনু জিণউরা॥

অন্যত্র—

ঢেণ্টণ-পাএর গীত। বিরলে বুঝঅ। চর্য্যা—৩৩

এবং—

অমিঅ ভখঅ মুসা। করঅ আহারা। চর্য্যা—২১

কিন্তু ছন্দের সর্ব্বত্র অক্ষর-সমতা রক্ষিত হয় নাই, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন—

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।

হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥ চর্য্যা—৩৩

চর্য্যাগুলি গীত হইত, কারণ প্রত্যেক চর্য্যার শীর্ষদেশে রাগরাগিণীর উল্লেখ রহিয়াছে। গান করিবার সময় সুরের টানে উক্তপ্রকার অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইত না বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ সেই প্রাথমিক যুগে আধুনিক কালের সুগঠিত রচনারীতির প্রবর্ত্তন যে হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী-কালে যে আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া সঙ্গীতধর্ম্মী এই সকল পদের বিচার করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ অলঙ্কার। কবিতা-সুন্দরী অলঙ্কারে সুশোভিতা হইলে প্রাকৃত ললনার ন্যায় অতীত রমনীয় হইয়া মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। অলঙ্কার

দ্বিবিধ—শব্দালঙ্কার, ও অর্থালঙ্কার। শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাসের সন্ধান বিশেষরূপেই চর্য্যাপদে পাওয়া যায়, যথা—

সঅ-সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁ
অলক্খলক্খণ ণ জাই। (চর্য্যা—১৫)
আইস সভাবে, জই জগ বুঝসি
তুটই বাসনা তোরা। (চর্য্যা—৪১)
আণ চাহন্তে আণ বিণঠা (চর্য্যা—৪৪)
কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণ বখাণে (চর্য্যা—৩৪)
নিরন্তর গঅণন্ত তুসে ঘোলই (চর্য্যা—১৬)
ছাআ মাআ কাঅ সমাণা (চর্য্যা—৪৬)
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই (চর্য্যা—১) ইত্যাদি

এইরূপ অনুপ্রাসের প্রয়োগ অনেক চর্য্যাতেই লক্ষিত হয়। ইহার ফলে অর্থ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই শব্দ-ঝঙ্কারে শ্রবণের তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। চর্য্যাকারগণ যে রচনা-রীতির সহিত পরিচিত ছিলেন না, তাহা বলা যাইতে পারে না। ইহা ব্যতীত শ্লেষ অলঙ্কারের প্রয়োগও পদকর্তৃগণ করিয়াছেন। একই শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগের নাম শ্লেষ (যথা—গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত)। সন্ধ্যাভাষায় চর্য্যগুলি রচিত হওয়াতে অনেক স্থলেই শ্লেষ ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, যথা—

সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল ক গই মাগঅ॥ চর্য্যা—২
সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥ চর্য্যা—৮
মারিঅ সাসু নণন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী॥ চর্য্যা—১১ ইত্যাদি।

এখানে সুসুরা, বহুড়ী, রূপা, সাসু, নণন্দ, মাঅ প্রভৃতি পদগুলি দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা ও রূপকের বহুল প্রয়োগ চর্য্যার এক অনন্ত-সাধারণ বিশিষ্টতা। প্রয়োজন বোধে চর্য্যাকারগণ সর্ব্বত্রই ইহাদের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। নিরবয়ব তত্ত্ব কথাকে গণচিত্তের কাছে আবেদনশীল করিতে হইলে ইহার কায়াহীনতাকে একটা বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হয়। চর্য্যাকারগণের এই প্রচেষ্টাই প্রকৃতপক্ষে পদগুলিকে সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। মহাযানী মতে নির্ব্বণ তত্ত্বমাত্র, কিন্তু সহজিয়ারা ইহার নামকরণ করিয়াছেন, রূপ প্রদান করিয়াছেন, এবং বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। চর্য্যাপদে ইঁহাকে নৈরাত্মাদেবী বলা হইয়াছে—নামান্তরে ইনি ডোম্বী, শবরী বা চণ্ডালী। নৈরাত্মা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে বলিয়া দেহ-নগরীর বাহিরে অবস্থান করেন, কখনও বা হরিণীরূপে, কখনও বা শবরীরূপে মোহাবদ্ধ জীবকে নিজের সন্ধান বলিয়া দেন, আবার তাহার সহিত মিলিত হইয়া সহজানন্দের সৃষ্টি করেন। শুধু ইহাই নহে, বদ্ধ এবং মুক্ত উভয় প্রকার জীবকে লইয়াই তিনি ক্রীড়া করিতেছেন, এজন্য দুষ্টা স্ত্রীরূপেও কল্পিত হইয়াছেন। সাহিত্যে ইহাকেই "সাধারণী করণ" বলা হয়।

আবার চর্য্যাকারগণ তাঁহাকে লইয়া কিছু আদি রসেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধক যখন নির্বাণাবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি যেন—

সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাতি পোহাই। (চর্য্যা—২৮)

অর্থাৎ এই নৈরাত্মা দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহানন্দে (ক্লেশান্ধকার) রজনী অতিক্রম করেন।

অন্যত্র— তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী॥ (চর্য্যা—২৮)

অর্থাৎ (কায়বাক্‌চিত্তরূপ) তিন ধাতুকে খাটে পরিণত করিয়া কামুক সাধক নৈরাত্মাকে লইয়া রাত্রি যাপন করেন।

কখনও বা—

একসো পদুমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥ (চর্য্যা—১০)

অর্থাৎ নৈরাত্মরূপিণী ডোম্বীকে আয়ত্ত করিয়া সাধক যেন একটি পদ্মের উপরে উঠিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন।

অন্যত্র— মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণমেহেলী। (চর্য্যা—৫০)

অর্থাৎ শূন্যতারূপিণী মেয়েকে লইয়া শবর মহাসুখে বিলাস করিতেছেন। এইভাবে সর্ব্বজনগ্রাহ্য আদি রসের সন্ধান দিয়া নৈরাত্মকে প্রচার করা হইয়াছে।

চর্য্যাকারগণ সাধারণের রসবোধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তত্ত্বব্যাখ্যা করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন বলিয়া প্রায় সকল চর্য্যাতেই বিবিধ রূপকের প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথম চর্য্যায় কায়াকে তরুবরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, দ্বিতীয় চর্য্যায় নৈরাত্মাকে সাধকের বধূ বলা হইয়াছে, তৃতীয় চর্য্যায় মদের দোকানের রূপকে তিনিই শুঁড়ি-বধূরূপে কল্পিত হইয়াছেন, চতুর্থ চর্য্যায় তাঁহাকেই পাইবার আবেগে সাধক বলিতেছেন—

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমলরস পিবমি॥

পঞ্চম চর্য্যায় ভবকে প্রবাহিত নদীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, ষষ্ঠ চর্য্যায় হরিণ শিকারের উপমাসাহায্যে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইভাবে প্রত্যেক চর্য্যায় কোন না কোন উপমা বা রূপকের অবতারণা দৃষ্ট হইবে। এইজন্য চর্য্যাকারগণকে বাধ্য হইয়া সন্ধ্যাভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

প্রাণহীন ধর্ম্ম বা নীরস নীতিকথা দ্বারা যে কবিতা রচিত হইতে পারে না, তাহা চর্য্যাকারগণ বিশেষরূপেই বুঝিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা উপমা-রূপকাদির প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মানুভূতির সহিত কবির চিত্তের নিবিড় যোগ স্থাপিত হইলে ধর্ম্মতত্ত্বও কাব্য পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। অতএব লিরিক জাতীয় কবিতায় প্রথমতঃ চাই অনুভূতি, এবং তৎপর তাহার অভিব্যক্তি, যেন উভয়ের সমবায়ে পাঠকের মনে আনন্দানুভূতি জাগাইয়া রস সৃষ্টি করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি চর্য্যা এখানে উদ্ধৃত হইল—

তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে বিসঅ-মণ্ডল সঅল ভাজই॥

মাতেল চীঅ-গএন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅনন্ত তুসেঁ ঘোলই॥
পাপ পুণ্ণ বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠানা॥
গঅণ-টাকলি লাগিরে চিত্ত পইঠ নিবাণা॥
মহারাসপাণে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী।
পঞ্চবিসঅ নায়ক রে বিপথ কোবি ন দেখি॥
খররবি-কিরণ-সন্তাপেঁ রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।
ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা॥

এই চর্য্যার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারি কি না পারি, ইহা পাঠ করিলেই—"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম। কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ॥" ইত্যাদি বিখ্যাত পদটির সুর কর্ণে ধ্বনিত হয়। অনুভূতি এবং তাহার প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তির নিদর্শন এই পদে মিলিয়া থাকে। আদিরসাত্মক আর একটি কবিতাও এখানে উদ্ধৃত হইল—

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহড়া তোহোরী॥
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥ ইত্যাদি

এই চর্য্যার ছন্দের অনুকরণ যে গীতগোবিন্দে পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু চর্য্যাকার এখানে একটু পরকীয়া তত্ত্বেরও সমাবেশ করিয়াছেন। মোহাবদ্ধ চিত্ত-শবর নিজের গৃহিণীকে পরস্ত্রী বলিয়া ভুল করিয়া বসিয়াছে, কারণ শবরী বাহ্যিক বেশভূষায় নিজের স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। শবরের এই বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া নৈরাত্মাশবরী নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে যেন গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন, এইভাবে চর্য্যাটি রচিত হইয়াছে। চর্য্যার ধর্ম্মতত্ত্ব যাহাই

থাকুক না কেন, ইহার বাহ্যিক রূপ ইহাকে সর্ব্বজনগ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছে। ঢাকা মিউজিয়ামের ক্যাটালগ হইতে জানিতে পারা যায় যে, পর্ণ-শবরীর এই মূর্ত্তি এখনও বজ্রযোগিনী গ্রামের কালী বাড়ীতে পূজিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চর্য্যাপদগুলি বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। অপভ্রংশ ভাষা হইতে ইহারা বেশী দূরবর্ত্তী নহে বলিয়া একশ্রেণীর সমালোচক ইহাদিগকে লইয়া কেবল ভাষাতত্ত্বের দিক হইতেই আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু পদগুলি যে কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্বের প্রয়োজনই মিটাইয়াছে তাহা নহে, অনেক বিদগ্ধ চিত্তের রসানুভূতির প্রচুর উপকরণও যে ইহাতে সঞ্জীভূত রহিয়াছে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। তবে যে সাধারণ পাঠকগণ ইহার রসাস্বাদন করিতে পারেন না, তাহার কারণ চর্য্যার রসহীনতা নহে, কিন্তু—

১। প্রাচীন বাঙ্গালার দুর্ব্বোধ্যতা।

এবং— ২। পাঠক-চিত্তের সহৃদয়তার অভাব।

চর্য্যার দুর্ব্বোধ্যতা সম্বন্ধে এই নিবন্ধের প্রথমভাগে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহার রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে, কারণ বোধানন্দ হইতে ভাবানন্দ, এবং ভাবানন্দ হইতে রসানন্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাহা পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করাই কষ্টকর, তাহা হইতে সহজে রসবোধের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু পদগুলির মধ্যে একবার সহৃদয়তার সহিত প্রবেশ করিতে পারিলে ইহাদের কবিত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। পাঠক চিত্তের এই সহৃদয়তার অভাবই চর্য্যা পদের রসবোধের প্রধান অন্তরায়। সমানহৃদয়বিশিষ্ট পাঠক না হইলে কাব্যের ধ্বনি কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে না। এই বিষয়ে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিকটে যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ তাহা মনে পড়িতেছে। বঙ্কিমবাবুর সহিত নাকি শ্রেষ্ঠ রচনা সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু কালীপ্রসন্নের ভাষা অপেক্ষা তাঁহার উপন্যাসের ভাষা শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কালীপ্রসন্নবাবুকে শ্রেষ্ঠ

রচনার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"যে রচনা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই আনন্দদান করিতে পারে, তাহাই শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত।" এখানে "সর্ব্ব সাধারণ" স্থলে "উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই" প্রয়োগে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছিল। বস্তুতঃ দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সাধারণ লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারে না বলিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্বের হানী হয় না। প্রকৃতপক্ষে যাহাদিগের জন্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই গ্রন্থের সার্থকতা স্বীকৃত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গভীর তত্ত্বপূর্ণ কবিতাগুলি অপেক্ষা শিশুর নিকট ছেলে ভুলান ছড়ার মূল্য অনেক বেশী। চর্য্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে, আমাদের ইহাই মনে রাখা উচিত যে, ঐ সকল তত্ত্বপূর্ণ কবিতা গুলির নিকট আমরা শিশু মাত্র। যাঁহারা বিরক্ত সন্ন্যাসী, সংসার যাঁহাদের নিকট প্রতিভাস বা বিকল্প মাত্র, তাঁহাদের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যেই কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে, আর আমরা শিশুর ন্যায় ভ্রান্তিবশতঃ এই সংসার লইয়াই উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছি। এই বিভিন্নতা এত বেশী যে, সংস্কার বশে আমাদের পক্ষে চর্য্যাতত্ত্বের রসাস্বাদ করা সহজ নহে। কিন্তু আমরা যদি ঐ সকল সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসিদিগের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারি, তবেই চর্য্যাতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া আনন্দ লাভ করা সম্ভবপর হয়। এই সহৃদয়তার অভাবেই শূন্যবাদমূলক এই সকল কীর্ত্তন পদগুলির হ্লাদৈকময়ী বাণীমূর্ত্তি যে আমাদের নিকট অপরিস্ফুট রহিয়া যায়, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ বলিয়াছেন—"কাব্যং গ্রাহ্য মলঙ্কারাৎ", কেহ বা—"ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য", অথবা ইহাকে—"বক্রোক্তি জীবিত" বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ত্রিবিধ বিশেষত্বের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি চর্য্যাপদে লক্ষিত হইয়া থাকে। অলঙ্কার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বিবৃত হইয়াছে তদতিরিক্ত ইহাও বলা যাইতে পারে যে, দুজ্ঞেয় নৈরাত্মাকে ডোম্বী, শবরী বা চণ্ডালী রূপে উল্লেখ করাতে সমাসোক্তি অলঙ্কারের সমাবেশ হইয়াছে। সেইরূপ চঞ্চল চিত্তকে হরিণ বা মূষিক রূপে বর্ণনা করাতেও সমাসোক্তি

অলঙ্কারের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। "বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে" (বলদ বিয়াইল, গাভী হয় বন্ধ্যা), এবং—"জো সো চৌর সোই সাধী"। (যে চোর, সেই সাধু) প্রভৃতি উক্তিতে বিরোধ অলঙ্কারের অপূর্ব্ব প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাত ফলবাহা॥

এখানে সাঙ্গ-রূপকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বক্রোক্তি বা ধ্বনিবাদে সাধারণতঃ বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যাঙ্গার্থকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ধ্বনিবাদীরা বলেন যে, যখন বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যাঙ্গার্থের প্রাধান্য সূচিত হয়, তখনই ছন্দোবদ্ধ রচনা কাব্য-পর্য্যায়ে গৃহীত হইতে পারে। চর্য্যাপদের সর্বত্র এই বিশেষত্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে। কঠোর তত্ত্ব-কথাকে গণগ্রাহ্য সাঙ্কেতিক ভাষায় প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে অজস্র রূপক ও উপমার প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল।

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥ চর্য্যা—৩৩

অথবা—

নিসি অন্ধারী মুসা আচারা।
অমিঅ ভসঅ মুসা করঅ আহারা॥ (চর্য্যা—২১)

প্রভৃতি পদে পড়িবেশী, হাঁড়ী, ভাত, মুসা প্রভৃতি শব্দে লক্ষ্যার্থের ইঙ্গিত সুপরিস্ফুট।

এইভাবে বাচ্যার্থের ভিতর দিয়া বাচ্যাতীতকেই প্রকাশ করা হইয়াছে। অতএব যাঁহারা অলঙ্কার, বক্রোক্তি বা ধ্বনিবাদের সমর্থক তাঁহারা কখনও চর্য্যাগুলিকে কাব্য-পর্য্যায় হইতে নির্বাসিত করিতে পারেন না।

আবার রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলা হয়। রসের মধ্যে আদিরসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চর্য্যায় এই আদিরসের সমাবেশ রহিয়াছে—

দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ [(চর্য্যা—২)

অর্থাৎ—

দিবসে বধূটি কাঁদে ভয়ে হ'য়ে ভীত।
রাত্রিতে চলিয়া যায় কামে হ'তে প্রীত॥

উক্তিটি সরস বটে, কিন্তু তত্ত্বান্বেষিগণ এই বধূটির খোঁজ করিতে গলদ্‌ঘর্ম হইবেন। তত্ত্বের মরুভূমিতে কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত রসের ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। এই বিশিষ্ট অভিব্যক্তিই ইহাকে কাব্য-পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে।

অন্যত্র—

কইসণি হালো ডোম্বি তোহোরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলীণজণ মাঝেঁ কাবালী॥

অতএব—

ডোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী। (চর্য্যা—১৮)
আদিরসচর্চ্চার ইহাই শেষ সীমা।

অন্যত্র—

জোইনি তঁই বিনু খণহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমল রস পিবমি॥ (চর্য্যা—৪)

চিত্তের ব্যাকুলতার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি এই পদে মিলিয়া থাকে। আবার যখন—

সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই। (ঐ, ২৮) পাঠ করা যায়, তখন পুরুষ প্রকৃতির মিলন জনিত আদি রসের ইঙ্গিত স্পষ্টীভূত হয়। অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যাহাই থাকুক না কেন, প্রকাশ ভঙ্গীতে যে ইহাতে হৃদয়ে রসের সঞ্চার করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রসের সৃষ্টি হয় অলঙ্কার উপমাদির অতিরিক্ত এক পরম বিচিত্রতা হইতে, আর এই অনুভূতি লাভ করিবার জন্য লেখক ও পাঠককে সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে হয়। ভক্ত ও দার্শনিকের মানদণ্ডের আদর্শ পৃথক্ বলিয়া তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের একই কবিতা পাঠ করিয়া সমভাবে পরিতুষ্ট হইতে পারেন না। রসবাদীরাও এইজন্য সহৃদয়তার

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব বিরক্ত সন্ন্যাসীর মন লইয়া চর্য্যাতত্ত্বে প্রবেশ করিলে ইহাতে যে প্রচুর রসভোগের উপকরণ সঞ্জীভূত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অভিব্যক্তির রমণীয় উৎকর্ষও চর্য্যাপদে মিলিয়া থাকে, যথা—

জিম জিম করিণা করিনিরেঁ রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ॥ (চর্য্যা—৯)

অন্তে ন জানহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো॥ (চর্য্যা—২২)

জাহের বাণচিহ্নরূব ণ জানী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখানী॥ (চর্য্যা—২৯)

চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ।
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই॥ (চর্য্যা—৩১)

উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।
নিঅহি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক॥ (চর্য্যা—৩২)

ভব জাই ণ আবই এস্থু কোই।
আইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই॥ (চর্য্যা—৪২)

চর্য্যার অনেক উক্তি এখন প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে, যথা—

অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী। (চর্য্যা—৬)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহারই প্রতিধ্বনি মিলিয়া থাকে।

হাথেরে কাঙ্কণ মা লোউ দাপণ। (চর্য্যা—৩২)

অর্থাৎ হাতের কঙ্কন দেখিবার জন্য দর্পণের প্রয়োজন নাই।

কর্পূরমঞ্জরীতেও ইহা পাওয়া যায়।

সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালী কিমো দুঠ বলন্দেঁ। (চর্য্যা—৩৯)

অর্থাৎ দুষ্ট গরু হইতে শূন্য গোহাল ভাল ইত্যাদি।

ভাষা-ব্যবহারে প্রভূত দক্ষতা না থাকিলে ভাব দানা বাঁধিয়া প্রবচনের সৃষ্টি করিতে পারেনা। আবার চর্য্যাকার লিখিয়াছেন—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥ (চর্য্যা—৮)

যেন ইহারই প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথে মিলিয়া থাকে, যথা—

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী।
আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি॥

সুতরাং ছন্দে, অলঙ্কারে, অভিব্যক্তির অভিনবত্বে, এবং রসের স্ফুরণে চর্য্যাপদগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে পারে।

চর্য্যাপদগুলি যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমাদের নিকটস্থ প্রদেশগুলির কোন কোন পণ্ডিত আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, কোন কোন চর্য্যায় এমন দুই একটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা বিশেষরূপে এখন ঐ সকল প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৫ ও ২৬ সংখ্যক চর্য্যায় ব্যবহৃত বুলথেউ, বোলথি শব্দ দুইটি গ্রহণ করা যাউক। এই জাতীয় ক্রিয়াপদ এখন উড়িয়া ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া উড়িষ্যার পণ্ডিতগণ চর্য্যাগুলিকে দাবী করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু দ্রষ্টব্য এই যে, বিদ্যাপতির পদে "কেলি করথি মধুপানে" (১৭ সং পদ) রহিয়াছে। আবার অবহট্ট ভাষায় রচিত কীর্ত্তিলতায় বিদ্যাপতিই লিখিয়াছেন—"সবে কিচ্ছু কিনইতে পাবথি" (ঐ ১২ পৃঃ)। অপর-দিকে আসামের শঙ্করদেব-রচিত রুক্মিণীহরণ-নাটে পাওয়া যায়—"কন্যাক সদৃশাবর কোন থানে থিক" (ঐ, ১৫ পৃঃ)। অতএব এই হাড়টুকু কাহার পাতে দেওয়া যাইতে পারে? চর্য্যার পরে প্রথম দাবী মৈথিলীর, তৎপর আসামীর, অবশেষে উড়িষ্যার প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই অবস্থায় ইহাই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই শব্দটি প্রাকৃত অপভ্রংশের প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া মৈথিলী ও আসামী অতিক্রম করিয়া অবশেষে উড়িয়াতে যাইয়া স্থিতি লাভ করিয়াছে। সেইরূপ ২ সংখ্যক চর্য্যায় গাইড়, সমাইড় শব্দ দুইটি ব্যবহৃত

দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—"সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তির হীত।" অন্যত্র—"আর যত বান্ধগণ আছের কাহ্নাঞি।" আবার বিদ্যাপতির পদে—"দে মেরানী (=মেলানী) রে।" এবং আসামী রুক্মিনী-হরণ-নাটে—"আঞ্চোরে (=অঞ্চলে) আখি মুখ মুচিক হোঁ।" অতএব ইহার এই শেষ পরিণতি দেখিয়া চর্য্যার ভাষাকে উড়িয়া বলিয়া দাবী করা সঙ্গত নয়। তারপর উক্ত চর্য্যা দুইটি রচনা করিয়াছেন শান্তিদেব। তিনি ভুসুকু ও রাউত নামেও পরিচিত ছিলেন, এবং এক ভুসুকু রচিত ৮টি পদ চর্য্যাতে সঙ্কলিত রহিয়াছে। আর এই ভুসুকু সম্বন্ধে জানা যাইতেছে যে, তিনি ছিলেন বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান অতীশের শিষ্য (সা-প-প, ১৩৪৮, ৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ভুসুকু সে বিক্রমপুরের লোক ছিলেন, তাহার সন্ধান একটি চর্য্যা হইতেও পাওয়া যায়। ৪৯ সংখ্যক চর্য্যাতে তিনি পদ্মাখাল ও বঙ্গাল দেশের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বিক্রমপুরের লোক না হইলে তাঁহার মনে পউআঁ খালের ধারণার উদয় হয় নাই। বর্ত্তমানে পদ্মানদীর বিশালতা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বে ইহা খালের ন্যায় একটি ছোট প্রবাহ মাত্র ছিল। অতএব শান্তিদেব ও ভুসুকুকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলে, এই সকল চর্য্যা যে বঙ্গাল কর্ত্তৃক বঙ্গাল ভাষায় রচিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা পারা যায়। সরহ পাদের একটি চর্য্যাতেও (চর্য্যা, সং ৩৯) এই বঙ্গালদেশের উল্লেখ রহিয়াছে। এই উপলক্ষে চর্য্যায় প্রতিবিম্বিত চিত্র সম্বন্ধেও আলোচনা করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশ যে নদীবহুল ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। চর্য্যাকারগণের সহিত বঙ্গদেশের বিশেষ সংস্পর্শ না থাকিলে প্রায় অর্দ্ধাধিক চর্য্যায় নদী ও নৌকা বাহিবার উল্লেখ থাকিত না। ইহাও চর্য্যার জন্মস্থানের সাক্ষ্য প্রদান করে। এইজন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়া-ছিলেন—"চর্য্যাগুলি বৌদ্ধ সহজিয়ামতের বাঙ্গালা গান। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম চর্য্যাপদ। সেকালেও কীর্ত্তন ছিল, এবং কীর্ত্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্ত্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্য্যাপদ বলিত।"

আচরণীয় অর্থে চর্য্যা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। যে পুঁথি অবলম্বনে এই সকল পদ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, অর্থাৎ সহজিয়াদের আচরণীয় ও অনাচরণীয় বিধি-নিষেধ প্রভৃতির নির্দ্দেশ যে গ্রন্থে নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়। কিন্তু চর্য্যাগুলির সংস্কৃত টীকাকার তাঁহার বন্দনার শ্লোকে "আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়" লিখিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ গ্রন্থের নামই পরিবর্ত্তিত করিবার পক্ষপাতী। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহাই হউক, প্রত্যেক পদের শীর্ষদেশে বিবিধ রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রহিয়াছে। পটমঞ্জরী, বরাড়ী, মল্লার প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাবলীতে সুপরিচিত। এইরূপ বিবিধ সুরে চর্য্যাগুলি পদাবলীর ন্যায়ই গীত হইত। এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালা পদাবলীর প্রাচীনতম নিদর্শন এই সকল চর্য্যাপদে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ গীতগোবিন্দের রচনাই বাঙ্গালা ছন্দের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু চর্য্যাপদগুলি জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। অতএব প্রাচীনতার নিদর্শন হিসাবে, এবং বাঙ্গালার সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া চর্য্যাপদেই বাঙ্গালা ছন্দের আদিরূপের সন্ধান করা উচিত। বিশেষতঃ চর্য্যার ছন্দের অনুকরণ গীতগোবিন্দেও লক্ষিত হইয়া থাকে, যথা—

২১ ১২২ ১১২ ২১ ১১১ ১১ ১১ ২১
ধীর সমীরে। যমুনা তীরে। বসতি বনে বন। মালী।
২১ ১২১১ ১ ১১১ ২১১ ২১১ ১১১১ ২ ২
পীন পয়োধর। পরিসর-মর্দন। চঞ্চল-করযুগ। শালী।

তুলনীয়—

২২ ২২ ২১১ ২১ ১১১ ১১ ২২
উচা উচা। পাবত তঁহি। বসঈ সবরী। বালী।
২ ২১২১ ১১১১ ১১১ ১১১ ২১২ ২২
মোরঙ্গি পীচ্ছ। পরহিণ সবরী। গিবত গুঞ্জরী। মালী॥

(চর্য্যা—২৮)

চর্য্যার ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

চর্য্যার পাঠে অনাচার

কোন কোন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্ভূত রকমে চর্য্যার পাঠ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ৬ সংখ্যক চর্য্যার মূল পাঠে আছে—

কাহেঁরি ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।

পরবর্ত্তী সম্পাদকগণ ইহার কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া লিখিয়াছেন—

কাহেরে ঘেণি মেলি অচ্ছহু কীস।

(প্রবোধবাবুর পাঠ)

কাহেরে ঘিনি মেলি আছহুঁ কীস।

(শহীদুল্লা সাহেবের পাঠ)

কাহে রে ঘেনি মেলি আছোঁ হোঁ কীস।

(সুনীতি বাবুর পাঠ)

কিন্তু উক্ত সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিত হইয়াছে—

কায়-হরিণি মেলি অচ্ছহু বীষ।

এবং ইহার অর্থে লিখিত হইয়াছে—

কায়-হরিণী বিষ লেপিয়া ছাড়া আছে।

সুনীতি বাবু সংস্কৃত টীকাটি অনুসরণ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ওরে, কাহাকে লইয়া (ঘেনি) ও কাহাকে ত্যাগ করিয়া (মেলি) আছি আমি কিসে?" শহীদুল্লা সাহেব লিখিয়াছেন—"কাহাকে লইয়া ছাড়িয়া আছি কেমনে।" কিন্তু উক্ত গ্রন্থকার এই সকল মহারথিগণকেও অগ্রাহ্য করিয়া ফুটনোটে লিখিয়াছেন— "শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত, যদিও টীকায় এই পাঠের একটা সঙ্গত ব্যাখ্যার চেষ্টা আছে।" প্রাচীন পুথির পাঠে যদি "একটা সঙ্গত ব্যাখ্যার চেষ্টা" লক্ষিত হয়, তবে কোন্ যুক্তি বলে তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ অপপাঠ গ্রহণ করা যাইতে পারে?

কিন্তু অবিবেচনা এইখানেই শেষ হয় নাই। এই পাঠের সমর্থনকল্পে তিনি নরোত্তমের দেহকড়চা হইতে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিচয় উদ্ধৃত করিয়াছেন—

সে প্রকৃতির দরশনে আনন্দিত মন।
মন হরিণ আশে করিল গমন॥
ধনুরূপ (?) হৈয়া থাকে নাহি জানে আন।
সেইরূপ নিরবধি করয়ে ধেয়ান॥ ইত্যাদি

ইহাকেই বলে অনধিকার চর্চ্চা। এখানে মনকে হরিণের সহিত তুলনা করা হয় নাই। রামচন্দ্র যেমন মায়ামৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, মনও সেইরূপ প্রকৃতি-রূপিণী হরিণীর আশায় ধাবিত হয়, ইহাই অর্থ। ইহাতে যে কোথায় "কায়-হরিণী ও চিত্ত-হরিণের" পরিকল্পনা রহিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। ইহা সম্পূর্ণ ই কাল্পনিক উক্তি মাত্র। অথচ ইহাই অবলম্বন করিয়া চর্য্যার মূল পাঠ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

৪১ সংখ্যক চর্য্যার মূল পাঠে আছে—

"রাউত ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।" কিন্তু ইহা পরিবর্ত্তিত করিয়া উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"রাইতু ভণই বট ভুসুকু ভণই বট সঅলা অইস সহাব", এবং অর্থ করিয়াছেন—"রাউতু ভুসুকু বলে, ওরে বটু, সকলেরই স্বভাব এইরূপ।" অথচ এই চর্য্যারই তৃতীয় পঙ্‌ক্তির "অকট" শব্দের ব্যাখ্যায় "আশ্চর্য্যং" বলা হইয়াছে, এবং ৩১ সংখ্যক চর্য্যার "অকট" শব্দও "আশ্চর্য্যং" অর্থে গৃহীত হইয়াছে। অথচ উক্ত গ্রন্থকার অহেতুক "কট" স্থলে "বট" পাঠ গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এইভাবে তিনি যে কয়টি চর্য্যা উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই অহেতুক পাঠ-পরিবর্ত্তন এবং অপব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন পুঁথি সঙ্কলিত করিবার কালে যে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, ইহাতে তাহা প্রায় সর্ব্বত্রই অবহেলিত হইয়াছে। ইহা অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিলে

ভবিষ্যতে চর্য্যার মূল পাঠ সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া আমরা এই অনাচারের উল্লেখ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

কেবলমাত্র এই গ্রন্থেই নহে, তিনি অন্যত্রও এই বিষ ছড়াইতেছেন। "প্রাচ্যবাণী-মন্দির-প্রবন্ধাবলীর" দ্বিতীয়খণ্ডে (পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য) তিনি ১৭ সংখ্যক চর্য্যার শেষ দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেঈ।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই॥

এবং অর্থ করিয়াছেন—"নাচিতেছেন হেবজ্র, আর গাহিতেছেন দেবী; বুদ্ধনাটক হইতেছে বিপরীত" (বিহার নাকি? কারণ এখানে দেবদেবী উভয়ই রহিয়াছেন)। অথচ "বিসমা" অর্থে সংস্কৃত টীকায় রহিয়াছে—"বিশিষ্টাধিমাত্রং সত্ত্বানাং সমং নির্ব্বাণং ভবতীতি।" ভাষাতাত্ত্বিকগণ শুনিয়াছি সর্ব্ববিষয়েই পারদর্শী, বিশেষতঃ সংস্কৃত-জ্ঞানে। কিন্তু এখানে নির্ভরযোগ্য সংস্কৃত টীকাটি অবহেলিত হইয়াছে। প্রবোধ বাবু এবং শহীদুল্লা সাহেব উভয়েই "দেবী" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ এখানে বোধহয় তাঁহাদের ভ্রম সংশোধিত করিয়া "হোই"র সহিত মিলাইবার জন্য "দেঈ" পাঠের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন পাঠের এইরূপ যথেচ্ছা পরিবর্ত্তন সমর্থনযোগ্য নহে।

প্রতিবাদের উত্তর

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় বিশ্বভারতী পত্রিকায় (কার্ত্তিক—পৌষ, ১৩৫২, পৃঃ ১১৫-১২৬ দ্রষ্টব্য) আমা কর্ত্তৃক সম্পাদিত চর্য্যাপদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে,—"এই আলোচনা কিংবা সমালোচনার দ্বারাই চর্য্যাপদের প্রকৃত পাঠ ও অর্থ নির্দ্ধারণের দিকে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হতে পারি।" যদিও তিনি লিখিয়াছেন—"এ বিষয়ে কোন গ্রন্থকারেরই কোন মৌলিকত্বের দাবি রাখা সঙ্গত নয়," তথাপি তিনি আবার ইহার পরেই বলিয়াছেন—"মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে প্রায়

৩২৪টি নূতন পাঠ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ২৪০টি 'আমার' সংশোধিত পাঠ। যদিচ তিনি তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নি, তাতে কিছু আসে যায় না। 'আমার' প্রচেষ্টা যে তাঁর পাঠ-নির্ধারণের সাহায্য করেছে তাতেই 'আমার' শ্রম সার্থক জ্ঞান করি।" পুনঃ পুনঃ এই "আমার" শব্দ ব্যবহারে ইহা ধারণা করা সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয় যে, তিনি সেই মৌলিকত্বেরই দাবি করিয়া বসিয়াছেন। ইহা যে তাঁহার পক্ষে শোভনীয় হয় নাই, তাহা পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার সংশোধিত পাঠ আমি যাহা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিনি, তথাপি তাঁহার প্রচেষ্টা যে আমাকে পাঠ-নির্ধারণে সাহায্য করেছে তাহাতেই তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছেন যে, আমি গ্রন্থ-সম্পাদনে নূতন ব্রতী হইয়াছি। বিলাতের Pali Text Societyর নির্দ্দেশ অনুযায়ী Iti-vuttaka Vannana সম্পাদনের কালে কি ভাবে পাঠান্তরের উল্লেখ করিতে হয় তাহার শিক্ষা আমি লাভ করিয়াছিলাম, এবং সেই প্রথাতেই আমি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্কলন করিয়াছি। অতএব আধুনিক প্রথায় গ্রন্থ-সম্পাদনে আমি নূতন ব্রতী হই নাই, এই ধারণা থাকিলে তিনি কখনও "বিশেষভাবে উল্লেখ করি নাই" ইহা বলিতে পারিতেন না। আমার পক্ষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থের প্রারম্ভেই ভূমিকায় পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাকারিগণের উল্লেখ করিয়া (তাহার মধ্যে বাগচী সাহেবের গ্রন্থের নামও রহিয়াছে) আমি লিখিয়াছি—"এই সকল গ্রন্থ হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি" (ভূমিকা ।৶০ পৃঃ)। তৎপর "সঙ্কেত-বিবৃতিতেও" প্রবোধবাবুর গ্রন্থ "খ" রূপে চিহ্নিত হইয়াছে (ভূমিকা, ৫।৵০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। অতএব আমার পক্ষে অপরাধের কাজ কিছুই হয় নাই বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আধুনিক প্রথায় পাঠান্তর সন্নিবিশের নিয়ম এই যে, যে পাঠ গ্রহণ করা হয় না, কেবলমাত্র তাহারই নির্দ্দেশ প্রদান করা হয়। আমি তাহা করিয়াছি বলিয়াই বোধ হয় "বিশেষভাবে উল্লেখ করি নাই" এই ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু আমার প্রধান আপত্তির কারণ এই যে, প্রবোধ

বাবু লিখিয়াছেন—"তন্মধ্যে প্রায় ২৪০টি আমার সংশোধিত পাঠ।" অথচ কি কারণে যে এই পাঠ-সাম্য সংঘটিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিবার তিনি অণুমাত্রও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। অতএব বাধ্য হইয়া আমাকে প্রথমতঃ এই আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। আমার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রবোধ বাবুই লিখিয়াছেন যে, আমি প্রায় সর্ব্বত্রই সংস্কৃত টীকা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছি, আর তিনি ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ অবলম্বনে পাঠ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব উভয়ের আদর্শ একই বলিয়া যে পাঠ-সাম্যের কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা তিনি অণুমাত্রও বিবেচনা করা সঙ্গত মনে করেন নাই, বরং মৌলিকত্বের দাবী করিয়া বসিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম চর্য্যাটিই গ্রহণ করা যাউক। ইহার প্রথম পাঠান্তরে রহিয়াছে "পইঠো", অথচ ইহা পরিবর্ত্তিত করিয়া বাগচী মহাশয় "পইঠা" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। আমার ধারণা এই যে, মুদ্রিত গ্রন্থে যে পাঠ রহিয়াছে, উপযুক্ত কারণ ব্যতীত তাহা পরির্ত্তিত করিবার অধিকার আমাদের নাই। এই জন্যই আমি লিখিয়াছি—"পাঠান্তরে পইঠো—প্রবিষ্টঃ হইতে। কিন্তু এই চর্য্যার শেষ দুই পঙ্ক্তিতে "দিঠা" ও "বইঠা" রহিয়াছে বলিয়া "পইঠা" পাঠই গৃহীত হইল।" ইহা বাগচী মহাশয়ের অনুকরণ বলা যাইতে পারে কি? ইহা ত অস্বীকার করা যায় না যে, প্রবিষ্টঃ হইতে পইঠো পাঠই সংস্কৃতের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। এই সন্দেহ আমার মনে জন্মিয়াছিল বলিয়াই আমি পাঠ-পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশে যত্নবান হইয়াছিলাম। সংস্কৃত হইতে পালি-প্রাকৃতের মধ্য দিয়া কেবল শব্দগুলির অপচয়ই সংঘটিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু চর্য্যার সময়ে যে পুনরায় সংস্কৃত-আদর্শ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ঐ পইঠো (এবং পঞ্চ, চঞ্চল প্রভৃতি শব্দ) হইতেও বুঝিতে পারা যায়। আমার দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন দিঢ়, কারণ টীকাতে—"দৃঢ়ং যথা ভবতি" লিখিত রহিয়াছে। আমার তৃতীয় পরিবর্ত্তন মরিআই স্থানে মরিঅই, যেহেতু টীকাতে "ক্রিয়তে" এবং "ম্রিয়ন্তে" রহিয়াছে। অতএব অন্ত্যানুপ্রাসের সামঞ্জস্যের জন্য মরিঅই। আমি যে এই

টীকা দ্বারা চালিত হইয়াছি তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমার গ্রন্থেই লিখিত আছে—"করিঅই—ক্রিয়তে ; মরিঅই—ম্রিয়তে" (৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বাগচী মহাশয়ের গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়, যেখানে তিব্বতীয় অনুবাদের আলোচনা রহিয়াছে, তাহাতে এই ক্রিয়তে বা ম্রিয়তের উল্লেখ নাই, অথচ ঐ গ্রন্থেরই ১০৭পৃঃ তিনি যে করিঅই, মরিঅই লিখিয়াছেন তাহা এই সংস্কৃত টীকা অনুসরণ করিয়া নহে কি ? আমি যদি তাহাই অনুসরণ করিয়া করিঅই, মরিঅই লিখিয়া থাকি, তাহাতে তিনি কোন্ যুক্তিবলে মৌলিকত্বের দাবী করিতে পারেন ? কিন্তু ইহার পরেই আমাদের মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে। প্রবোধ বাবু লিখিয়াছেন—

এড়িএউ ছান্দকবান্ধ করণ কপটের আস।
সুনুপাখ ভিড়ি লেহুরে পাস ॥

এবং তাঁহার গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় তিব্বতীয় পাঠের সংস্কৃত অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—

পরিত্যজ্য ছান্দ-বান্ধ-করণং কপটস্য দানম্।
শূন্যতাপক্ষকে পাশ বন্ধনং [কুরু] রে ॥

অথচ ইহার সংস্কৃত টীকায় পাওয়া যায়—

পশ্চাচ্ছন্দমোড়িয়ান-করণাদিবন্ধস্থিহায় শূন্যতাপক্ষকেতি নৈরাত্মধর্ম্মপাশমিতি সমীপং তদীয়ালিঙ্গনং কুরু। রে সম্বোধনং। ভো মোক্ষশীলাঃ।

কিন্তু তিব্বতীয় অনুবাদ অনুসরণ করিয়া বাগচী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় চর্য্যায় ব্যবহৃত শব্দগুলির যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা অভিনব বলিয়াই বোধ হয়, যথা—ছন্দ-অর্থে—"to fasten together ; to attach, to fasten together—chāndogya, chandah, chānda (mod. chādā) in Bengali means to fasten together'. করণম্-অর্থে to make, to manufacture. ইহা ব্যতীত একটি 'কপট' শব্দের আমদানী হইয়াছে, যাহার অর্থ নাকি 'deceit'. ইহার পরে তিনি লিখিয়াছেন—"The meaning of 'bla' is not clear, it means 'superhuman gift and power'.

এখন আমার বক্তব্য এই যে, তিব্বতীয় এই অনুবাদে সংস্কৃত টীকাটির ভাব প্রকাশিত হইয়াছে কিনা ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সংস্কৃত টীকায় কোথাও 'কপট'-এর কথা নাই। যদি তিব্বতীয় টীকাটি সংস্কৃত টীকার আদর্শেই লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই কপটের সন্ধান ঐ টীকাতে পাওয়া যাইতেছে কেন? অথচ ইহা অবলম্বন করিয়া বাগচী মহাশয় "করণ কপটের আস" পাঠ ধার্য্য করিয়াছেন। 'ছন্দ'-অর্থে 'ছাদন', ইহাতেও আর এক নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই 'ছন্দ'ই যদি 'বন্ধ' হয়, তাহা হইলে টীকায় যে আর একটি 'বন্ধ' রহিয়াছে তাহাতে পুনরুক্তি দোষ হয় না কি? তিব্বতীয় টীকার উপরে যে আমি সর্ব্বত্রই আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই, তাহার একটি কারণ ইহাতেও নির্দ্দেশিত হইতে পারে। এই আদর্শ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই বলিয়াই নিম্নলিখিত পাঠ ধার্য্য করিয়াছি—

এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লেহুরে পাস॥

"এডিএউ" শব্দটি সুনীতি বাবুও সমর্থন করিতে পারেন নাই, অথচ ইহাকে পৃথক্ করিয়া 'এড়ি' এবং 'এউ' পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থসঙ্গতি ঘটে। এতদ্-শব্দ জাত 'এউ' সুনীতিবাবু তাঁহার গ্রন্থের ৮৩৪ পৃষ্ঠায় সমর্থন করিয়াছেন। ইহার অর্থ 'এই'। অতএব আমার পাঠের অর্থ হয়—ছন্দের (বাসনার) এই বন্ধন এবং করণের (ইন্দ্রিয়ের) পারিপাট্যের আশা পরিত্যাগ করিয়া শূন্যতা-পক্ষের দিকে (ভিতি) সামীপ্য লাভ কর।" ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পংক্তিতে ধ্যানধারণা প্রভৃতির দ্বারা যে চিরস্থায়ী মহাসুখ লাভ করা যায় না তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কি করিলে যে ইহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশের জন্য বলা হইল 'বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্রিয়ের পারিপাট্যের আশা পরিত্যাগ কর।' অনেক চর্য্যাতে, এবং এই চর্য্যার প্রথম ভাগেই বাসনার দ্বারাই যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তাহার উল্লেখ রহিয়াছে, এবং বাসনাধার চিত্ত হইতেই মোহ উদ্ভূত হইয়া আমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করে। বাসনা-জাত এই মোহ পরিত্যাগ করিলেই মুক্তি, ইহা পুনঃ পুনঃ চর্য্যাতত্ত্বে প্রচারিত

হইয়াছে। অতএব 'ছান্দক বান্ধ' এবং 'করণক পাটের আস' পাঠই সঙ্গত বলিয়া আমি বিবেচনা করি। তিব্বতীয় পাঠে 'করণক'-এর 'ক' মূল গ্রন্থের 'পাটে'র সহিত যুক্ত হইয়া 'কপটের' সৃষ্টি করিয়াছে। বাগচী মহাশয় "ভিড়ি" শব্দে আর এক নূতনত্বের আমদানী করিয়াছেন, কারণ মূল গ্রন্থে আছে "ভিতি" অর্থাৎ শূন্যতাপক্ষের দিকে। তিব্বতীয় অনুবাদে কি ছিল তাহার সন্ধান বাগচী মহাশয় প্রদান করেন নাই, এবং সংস্কৃত টীকাতেও ইহা পাওয়া যায় না, এই অবস্থায় "ভিতি"কে "ভিড়ি"তে পরিবর্ত্তিত করা সঙ্গত হইয়াছে কি? বিশেষতঃ যখন ভিতি পাঠ গ্রহণ করিয়াও অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হয়, তখন এই পরিবর্তন সম্পূর্ণই অধিকার-বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে। অন্যান্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে টীকার "ধ্যানবসেন" হইতে 'ঝাণে', এবং "উপবিষ্ট" হইতে "বইঠা"র উল্লেখ করা যাইতে পারে। অতএব সংস্কৃত টীকা অবলম্বন করিয়া যে আমি অগ্রসর হইয়াছি তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রবোধবাবুর গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া যে সকল পাঠ সংস্কৃত টীকা অবলম্বনে তিনি নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত আমার গৃহীত পাঠের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। তথাপি আমি যে বিনা বিচারে পাঠ-নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হই নাই তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত পাঠ-বিভিন্নতা হইতে অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমার গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে প্রবোধ বাবুর অন্যায় প্ররোচনায় একদল লোক (যাহারা কখনও চর্য্যা লইয়া আলোচনা করেন নাই) ইহাকে "চৌর্য্যপদ" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিল। ইহারা এতই গর্ব্বিত যে, অন্যের যে কিছু বলিবার আছে, তাহা বিবেচনা করিবার অণুমাত্রও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। আজ এই উপলক্ষে বাগচী মহাশয় আমাকে উত্তর দানের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আমার মহা অপরাধের কাজ হইয়াছে এই যে, আমি প্রবোধ বাবুর—I find out that it was almost impossible to interpret the songs without the help of Tibetan Text—উক্তির সমর্থন করি নাই।

আমার ধারণা এই যে, সংস্কৃত টীকা হইতে তাহার অনুবাদ যে অধিকতর নির্ভর-যোগ্য তাহা পাগলেও বিশ্বাস করে না। এই জন্য আমি লিখিয়াছিলাম—"টীকা রচিত হইবার কতকাল পরে এই অনুবাদ করা হইয়াছিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, এবং যিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁহার এই ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবেশাধিকার কিরূপ ছিল তাহাও জানা যাইতেছে না। এ অবস্থায় সংস্কৃত টীকাটি যে তাহার অনুবাদ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।" ইহা তিব্বতীয় ভাষায় পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণের সন্তোষ-বিধান করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা অতি সহজ। ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে উভয় ভাষাতেই প্রাজ্ঞ হওয়া প্রয়োজনীয়। কিন্তু কোন বিশেষ বিষয়ের (যেমন দর্শন শাস্ত্রের) কোন গ্রন্থের অনুবাদ করিতে হইলে পাণ্ডিত্য ব্যতীত দর্শনেও অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজনীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি ৩৩ সংখ্যক চর্য্যার প্রথম চারি পঙ্‌ক্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম—

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড়্‌হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ॥

শেষ দুই পঙ্‌ক্তির সংস্কৃত টীকায় রহিয়াছে—"বিগতাঙ্গ যস্য স ব্যঙ্গঃ। অঙ্গশূন্যত্বেন তৎ প্রভাস্বরবোদ্ধব্যং। অঙ্গস্য ষড়গতৌ সয়তি গচ্ছতীতি সয়ঃ তদেব বায়ুরূপং তেন ব্যঙ্গেন প্রভাস্বরেণ বিজ্ঞানপরশ্চোদিতঃ।"

প্রবোধ বাবু লিখিয়াছেন—"বেঙ্গ সংসার বড়্ হিল জাঅ" অর্থে—"It is the family of a frog which goes on increasing।" সংস্কৃত টীকাটি যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনি বেঙ্গের সংসার বাড়িয়াই যায়, ইহা বলিতে পারেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। টীকায় বলা হইয়াছে যে, নিরবয়ব সংসারের ধারণা বাড়িয়াই যাইতেছে। এখানে "অঙ্গ" এবং "প্রভাস্বর" শব্দ দুইটির অর্থ অতীব প্রয়োজনীয়। ২১ সংখ্যক চর্য্যায় চঞ্চল মূষিকরূপ চিত্তের "ভবং স্বকায়ং"

বলা হইয়াছে। আর ২০ সংখ্যক চর্য্যার টীকাতেও "সংবৃত্তবোধিচিত্তো হি ভবঃ" বলা হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সংবৃত্তবোধিচিত্তের (অবিদ্যাবৃত বা) এই ভব বা সংসারই স্বকায়। ইহাই চিত্তের অঙ্গস্বরূপ। এই অঙ্গের ধারণা যখন গত হয়, তখনই প্রভাস্বরতায় প্রবেশ করা যায়, অর্থাৎ—

ভবস্যৈব পরিজ্ঞানে নির্ব্বাণমিতি কথ্যতে।

ভবের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলেই নির্ব্বাণ লাভ হয়। এই অঙ্গ-তত্ত্ব এইভাবে বহু চর্য্যাতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রভাস্বর অর্থে ৫০ সংখ্যক চর্য্যার টীকায় "প্রভাস্বরচতুর্থেন শূন্যেন" বলা হইয়াছে, যাহার নামান্তর নির্ব্বাণরূপ শূন্যতা। অতএব ৩৩ সংখ্যক চর্য্যার টীকায় বলা হইয়াছে যে, অঙ্গশূন্যতা দ্বারা ঐ নির্ব্বাণরূপ প্রভাস্বর শূন্যতা বুঝিতে হইবে। অতএব এই চর্য্যার দার্শনিক ব্যাখ্যায় বেঙ্গ সাপকে তাড়না করে, বা বেঙ্গের সংসার বাড়িয়াই যায়, এইরূপ ব্যাখ্যার কোনই সার্থকতা নাই। সংস্কৃত টীকাটি বুঝিতে পারিলে উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারা যায় কি? অথচ প্রবোধ বাবু আমাদিগকে তাহাই প্রদান করিয়াছেন, এবং ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"সর্পতি (সন্তরতি বা) গচ্ছতীতি সর্পঃ," অর্থাৎ তিব্বতীয় অনুবাদে নাকি (যাহার কোন উল্লেখই তিনি পূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থে করেন নাই) সংস্কৃত টীকার "সয়তি" স্থানে সর্পতি, এবং সয়ঃ স্থানে সর্পঃ হইবে। অর্থাৎ ভেকেন সর্পঃ এব তাড়িতঃ, কারণ প্রবোধ বাবুর মতে বিজ্ঞান=বায়ু= সর্প, আর বেঙ্গ=ব্যঙ্গ=প্রকৃতি-প্রভাস্বর, অতএব প্রকৃতি-প্রভাস্বরের দ্বারা বিজ্ঞানরূপ সর্প নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দুঃখের বিষয় যে, ইহাও সংস্কৃত টীকা দ্বারা সমর্থিত হয় না, কারণ সেখানে আছে—"তেন ব্যঙ্গেন প্রভাস্বরেণ বিজ্ঞান-পরশ্চোদিতঃ", অর্থাৎ নিরবয়ব সংসারের ধারণা রূপ প্রভাস্বর-শূন্যতা আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের দিকে প্রেরণ করে। এখানে যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা কি? বিজ্ঞান অর্থে বিশিষ্টানুভূতি। তাহা যে কিরূপ, তাহা উক্ত চারি পঙ্‌ক্তিতেই বিবৃত রহিয়াছে, যথা—আমি এখন এমন স্থানে

অধিষ্ঠিত রহিয়াছি যে, প্রতিবেশীরূপ গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব আমার দূরীভূত হইয়াছে, আমার দেহের মধ্যে চিত্ত নাই, এবং এই অচিত্ততায় আমি সততই প্রবেশ করিতেছি। নিরবয়ব সংসারের ধারণা আমার বাড়িয়াই চলিয়াছে, আর আশ্চর্য্য এই যে, বজ্রাগার হইতে আগত আমার এই বোধিচিত্ত মূল মহাসুখ-চক্রে পুনরায় গমন করিতেছে। এই পরম-বিজ্ঞানের কথাই এই চর্য্যার বক্তব্য বিষয়।

তারপর প্রবোধ বাবু লিখিয়াছেন—The Carya text has "আবেশী" (আবেশিক) which means "a guest". The Tibetan translator had probably before him পরিবেশী (পরিবেশ) which means "to distribute, to serve." অথচ ইহার টীকাতে আছে—"যোগীন্দ্রো নিত্যং তমাবিশতি", অর্থাৎ নৈরাত্মতায় যোগী নিত্য প্রবেশ করেন। এই প্রবেশ করাকে যদি তিব্বতীয় অনুবাদে অতিথিতে পরিণত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, প্রবোধ বাবু তিব্বতীয় অনুবাদের যে প্রশস্তি রচনা করিতেছেন তাহা সঙ্গতই হইয়াছে! আমার পক্ষে কিন্তু এই জাতীয় আবর্জ্জনায় বিশ্বাস স্থাপন করার প্রবৃত্তি হয় নাই। হাঁড়ীতে ভাত নাই, অতিথি আসিয়াছে, এবং তাহাকে পরিবেশন করা হইতেছে, তিব্বতীয় অনুবাদে যদি এই সকল ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে তাহাকে সংস্কৃত টীকার অনুবাদ বলা যাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় কি? আর ইহাই অবলম্বন করিয়া চর্য্যার পাঠ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত কিনা, তাহা বিশেষজ্ঞগণ নির্দ্ধারিত করিবেন। এইজন্য আমি সর্ব্বত্র তিব্বতীয় অনুবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। প্রবোধ বাবু লিখিয়াছেন—"মণীন্দ্রবাবুর এ উক্তি যদি সত্য হয় তাহলে চর্য্যাপদের পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ে তিব্বতী অনুবাদের কোন মূল্য থাকে না।" আমার এই উক্তি সঙ্গত কিনা তাহা নির্দ্ধারণের ভার এখন পাঠকগণের উপর অর্পণ করা যাইতে পারে। কিন্তু একটি সন্দেহ আমার মনে জাগরিত হইয়াছে। সংস্কৃত টীকার অনুবাদ যদি তিব্বতীয় ভাষায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে এত বিভিন্নতার কারণ থাকিতে পারে না। আমার যেন বোধ

হয় প্রবোধ বাবুই আমাদিগকে ইহার প্রকৃত মর্ম্মের সন্ধান দিতে পারেন নাই। তিনি যদি টীকাগুলির অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিবার কষ্ট স্বীকার করেন তাহা হইলে আমাদের মহা উপকার হইতে পারে। নতুবা ৮ম পঙ্‌ক্তির সাঁধী (সাধু) যে কিরূপে কোট্টপালে পরিণত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বে কোটালদের সাধু খ্যাতি ছিল ধরিয়া লইলেও বলা যাইতে পারে যে অন্ততঃ ঐরূপ একটা শব্দ সংস্কৃত টীকাতে পাইবার আমরা আশা করিতে পারি। নতুবা তাহাকে অনুবাদ বলা যাইতে পারে না। ইহা নূতন আমদানী। এখন ইহা অবলম্বন করিয়া যদি সাধী স্থানে কোটাল, এবং আবেশী স্থানে অতিথি বসাইয়া চর্য্যার পাঠ-নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলেই বেতালের বৈঠক বসিতে পারে।

তারপর আমার প্রদত্ত কয়েকটি পাঠের উল্লেখ করিয়া প্রবোধবাবু তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"এ পাঠগুলিও ঠিক তাঁর নিজস্ব নয়, কতকগুলি পাঠে মূল পুঁথির লিপিকর প্রমাদগুলিই সংরক্ষণের চেষ্টা করা হইয়াছে, যেমন—ষষহর, ষহজ, ষিআলা, ষিহে প্রভৃতি।" প্রবোধবাবু কি মনে করেন যে, তিনি আমাকে প্রাচীন পুথি-সম্পাদনের রীতি শিক্ষা দিতেছেন? এ পর্য্যন্ত সকলেই প্রাচীন পুথির বর্ণ-বিন্যাস রক্ষা করিয়াই গ্রন্থ-সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন, বিশেষতঃ চর্য্যার ন্যায় প্রাচীনতম পুথির সম্পাদন কালে যে ইহা কত প্রয়োজনীয় তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই জন্যই আমি আমার গ্রন্থের ভূমিকায় (৪৵০-৶০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) লিখিয়াছিলাম—"বাঙ্গালায় বিভিন্ন জ, ন, ব, ও স'এর উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব বিশিষ্টতা। আমরা এখন এই বিভিন্নতা প্রদর্শন করিবার জন্য শব্দ ব্যবহার করিয়া (তালব্য) শ, (মূর্দ্ধন্য) ষ, (দন্ত্য) স প্রভৃতি পাঠ করিয়া থাকি। চর্য্যার আদর্শ পুথি লিখিত হইবার কালেই এই উচ্চারণ-বিভিন্নতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যথা—মণ (চর্য্যা—২০), অথচ মন (চর্য্যা—৩০)। ৫০ সংখ্যক একটি চর্য্যাতেই—শবর, ষবরালী, সবর লিখিত হইয়াছে। এমন কি সংস্কৃত টীকাতেও ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়, যথা—

'সুদ্ধ ধর্ম্মতাপীঠিকাঃ প্রাকৃত ভাসয়া রচয়িতুমাহ' ইত্যাদি (ক, ২ পৃঃ)। এখানে সুদ্ধ ও ভাসয়া লক্ষণীয়। পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে সংস্কৃতের আদর্শে এই বর্ণ-বিন্যাস শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।" আদর্শ পুথিতে যদি ষষহর থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা সংশোধিত করিয়া শশহর লেখা সঙ্গত কি? বিশেষতঃ যখন এই বর্ণবিন্যাস-রীতি লক্ষ্য করিয়া আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার উচ্চারণ-প্রথার সন্ধান পাই, তখন ঐ সকল পাঠ রক্ষা করা যে কত প্রয়োজনীয় তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাগচী মহাশয় ইহা লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াছেন। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইত কি? আমরা দেখিতেছি যে, বাগচী মহাশয় যেন শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় বুড়া দাদাকে তর্পণ শিখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অতএব ষষহর স্থানে শশহর বা সসহর লেখা স্বৈরাচার মাত্র।

তারপর তিনি লিখিয়াছেন—"কতকগুলি নূতন পাঠের সমর্থনে কোন যুক্তি দেওয়া হয় নাই—খাঅ, চোরে (২) ইত্যাদি।" ইহা ইচ্ছাকৃত সত্যগোপনের চেষ্টা মাত্র, কারণ ২ সংখ্যক চর্য্যার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়াই আমি লিখিয়াছি (ভূমিকা, ৪/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)—

"দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥

সাধারণতঃ বুঝা যায় যে, এই দুই পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যানুপ্রাসের মিল নাই, অতএব এখানে কবির অক্ষমতাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, কুম্ভীরে খাঅ=কুম্ভীরেণ খাদিতম্—কুম্ভীরে খাইঅ—কুম্ভীরে খাঅ। অতএব এখানে অকারের ই—শ্রুতি স্বাভাবিক। সেইরূপ এই চর্য্যাতেই জাগঅ, মাগঅ, ভাঅ, জাঅ প্রভৃতি পদ রহিয়াছে।" আমি ত মনে করি যে, পুথিতে যে পাঠ আছে যুক্তিসহ তাহার সমর্থন করাই সঙ্গত, না পারিলে অবশ্যই অন্য পাঠ গ্রহণ করা যাইতে পারে। অকারের এই ই-শ্রুতির সম্ভাবনা না থাকিলে যাতি—জাই—জাঅ হইত না।

আমার দ্বিতীয় অপরাধ এই যে, প্রবোধ বাবুর চৌরী পাঠের পরিবর্ত্তে আমি

চোরে পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এই পদেরই ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে প্রবোধ বাবুও "চোরে" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আবার ৩৩ সংখ্যক চর্য্যার পাঠেও "চৌর" না লিখিয়া "চোর" লিখিয়াছেন। একই চর্য্যায় এইরূপ পাঠ বিভিন্নতা দূর করিবার জন্য আমি সর্ব্বত্রই "চোর" পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। ইহা আমার অপরাধ হইয়াছে কি? সংস্কৃত টীকার "চোরেণ" হইতে "চোরেঁ" হইতে পারে, চৌরী হয় না। বিশেষতঃ ঐ চর্য্যারই পরবর্ত্তী টীকায় "প্রভাস্বর চোরেণ" রহিয়াছে। আমি সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছি মাত্র।

তৃতীয় চর্য্যায় আমি সান্ধ ও কান্ধ পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। প্রবোধ বাবুর পাঠ সান্ধে ও কান্ধে। এখন সংস্কৃত টীকাটি গ্রহণ করা যাউক। তাহাতে আছে—"ভো বালযোগিন্, * * যেনাভ্যাসবিশেষেণ অজরামরত্বং দৃঢ়স্কন্ধং লভসে তং কুরু।" অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইহা অনুজ্ঞার বচন। সুতরাং নাম ধাতু স্কন্ধ হইতে কান্ধ+অনুজ্ঞার ত, থ জাত অ যোগে কান্ধ। ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পঙ্‌ক্তির অন্ত্যানুপ্রাসের মিল রাখার জন্য সান্ধ। অতএব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সান্ধে স্থানে সান্ধ পাঠই সঙ্গত। কিন্তু প্রবোধ বাবু সান্ধে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া কান্ধ পরিবর্ত্তিত করিয়া কান্ধে লিখিয়াছেন। কান্ধে পদে অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশিত হয় না। টীকাটি যে আমি কত সতর্কতার সহিত অনুসরণ করিয়াছি, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়।

চতুর্থ চর্য্যায় প্রবোধ বাবুর পাঠ ঘাণ্ট এবং পীবমি। কিন্তু আমি ঘাণ্টি ও পিবমি পাঠ গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। ইহার উত্তর দিবার আমার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না, কারণ শহীদুল্লা সাহেবও ঘাণ্টি এবং পিবমি পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চম সংখ্যক চর্য্যাতেও প্রবোধ বাবুর ভবনই এবং পটির পরিবর্ত্তে উক্ত শহীদুল্লা সাহেবই ভবণই এবং পাটী পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ চর্য্যায় প্রবোধ বাবু পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তির পইসই'র সহ মিলাইবার জন্য দীসই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থে "দীসঅ" মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা যে ই-শ্রুতির জন্য হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় চর্য্যা-সম্বন্ধীয়

আলোচনায় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। আমি যথাসম্ভব মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

দশম চর্য্যায় "বাহিরি" ও "জাহ সো" পাঠ শহীতুল্লা সাহেবও গ্রহণ করিয়াছেন। শব্দসূচীতে আমি লিখিয়াছি সং—বহিঃ—বাহির+সপ্তমীর—হি জাত ই। ইহারই পরবর্ত্তী পরিণতিতে এ। অতএব "বাহিরি" পাঠই অধিকতর সমর্থনযোগ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভাষাতাত্ত্বিক প্রবোধ বাবু ইহা লইয়াও আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সংস্কৃত টীকার "গচ্ছসি" হইতে "জাহসি" হইতে পারে, "জাহসো" হয় না। অতএব এই সো যে সং-সঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া "সে" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা শহীতুল্লা সাহেবের অনুবাদ "যাও সো" হইতেও বুঝিতে পারা যায়। আমি চৌষঠ্ঠী লিখিয়াছি বলিয়া প্রবোধ বাবুর গোসা হইয়াছে, কিন্তু ১২ সংখ্যক চর্য্যায় তিনিই "চউষঠ্ঠি" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

১১ সংখ্যক চর্য্যায় প্রবোধবাবুর পাঠ "খাটে", আর আমার পাঠ "খট্টে"। তিব্বতীয় অনুবাদ অবলম্বন করিয়া প্রবোধ বাবুও "খট্টে" লিখিয়াছেন, তাহা হইতে পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনে "খাটে" হইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠেও "খট্টে" রহিয়াছে। অযথা ইহা পরিবর্ত্তিত করিয়া "খাটে" পাঠ সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

১৬ সংখ্যক চর্য্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ "লাগি রে", শহীতুল্লা সাহেবের পাঠও "লাগি রে", কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে প্রবোধ বাবু "লাগেলি রে" পাঠ গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। ছন্দ রক্ষার জন্যও এই পাঠ সমর্থিত হয় না।

১৯ সংখ্যক চর্য্যায় প্রবোধ বাবু নাকি উছলিলা এবং চলিলা পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠে উছলিআঁ এবং চলিআ রহিয়াছে। শহীতুল্লা সাহেবও ইহাই অবলম্বন করিয়াছেন। সংস্কৃত টীকার "প্রচলিতাঃ" হইতে "চলিআ" পাঠই সঙ্গত। তৎপরিবর্ত্তে চলিলা এবং উছলিলা পাঠে স্বৈরাচারের দৃষ্টান্তই প্রদর্শিত হইয়াছে। ২০ সংখ্যক চর্য্যায় অন্তউড়ি

পাঠ প্রবোধবাবু এবং শহীদুল্লা সাহেবও গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ইহার উল্লেখ যে কেন তিনি করিয়াছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলামনা। অবশিষ্ট "ভইলেসি" পাঠ শহীদুল্লা সাহেব কর্ত্তৃকও গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত টীকার "ভূতোসি" হইতে ভইলেসি পাঠই সঙ্গত। বিশেষতঃ যখন টীকাতে আছে "স্বয়মাত্মানং সম্বোধ্য বদতি" তখন ইহা যে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার দ্যোতক তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব প্রবোধবাবুর পাঠ "ভইলে সি" সমর্থন-যোগ্য নহে। এই "সি" যে মধ্যমপুরুষের ক্রিয়ার দ্যোতক তাহা না বুঝিতে পারিয়া তিনি "সি" পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ "ফেটলিউ", প্রবোধ বাবুর পাঠ "ফিটলে", শহীদুল্লা সাহেবের পাঠ "ফিটিলি"। সংস্কৃত টীকাতে আছে "স্ফুটম্"। সংস্কৃত কৃতম্ হইতে কিউ, গতম্ হইতে গউ পাঠ চর্য্যাতে ধৃত হইয়াছে। অতএব পদান্তে উ থাকাই সঙ্গত। এইজন্য ফিটলিউ, বা ফেটলিউ পাঠ গ্রহণ করাতে ভাগবত অশুদ্ধ হয় নাই। যাহারা এই উ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কারণ প্রদর্শন করা উচিত।

তারপর ২১ সংখ্যক চর্য্যায় প্রবোধ বাবু আমার কয়েকটি পাঠ বিভিন্নতার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—আচারা (আকারা নহে), আহারা, গাতি, কাল, তাবসে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ যথাক্রমে চারা, আহারা, গাতী, কলা, তবসে। শহীদুল্লা সাহেবের পাঠ-চারা, আহারা, গাতো, কালা, তাব সে। প্রবোধ বাবুর পাঠ অচারা, অহারা, গাতী, কালা, তবসে। আমি আমার গ্রন্থে (৮৩-৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এই সকল পাঠ বিভিন্নতার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছি। আমি লিখিয়াছি—"আচারা—পাঠান্তরে চারা, এবং অচারা রহিয়াছে, কিন্তু এই শব্দটির প্রকৃতরূপ একাদশ পংক্তির টীকা হইতে ধারণা করা যায়। সেখানে—"চিত্তমূষকস্যাচার" রহিয়াছে। তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শব্দটির প্রকৃতরূপ আচার বা আচরণ, অর্থাৎ চিত্তের স্বভাবিক চঞ্চলতা। আচারা অর্থে আচরণশীলতা। ইহা সংক্ষেপে "চারা"ও হইতে পারে।" শুধু ইহাই নহে, "অচারা" পাঠ গ্রহণ করিয়াও যে অর্থান্তরের পরিকল্পনা করা যাইতে পারে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা আমার গ্রন্থের ৮৪ পৃঃ

প্রদত্ত হইয়াছে। চঞ্চল চিত্ত-মূষিকের আচারা বা আচরণ (সংক্ষেপে চারা) টুটিলেই যে বন্ধন-মুক্ত হওয়া যায়, শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আচারা পাঠই সুসঙ্গত। শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং শহীদুল্লা সাহেবের গ্রন্থেও "আহারা" পাঠ ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত টীকাতে আছে—"গতীতি তির্য্যঙ্‌নরকাদিদুর্গতিপাতঞ্চ", অতএব গতি পাঠ গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তির "যাতী"র সহিত অন্ত্যানুপ্রাস রক্ষার জন্য "গাতি" লিখিত হইয়াছে। কিন্তু "গতি"ই যে আমার অভিপ্রেত পাঠ তাহা বুঝিতে পারা যায় আমার গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠার টীকা হইতে। প্রবোধ বাবু তাঁহার টীকায় (৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) গর্ত্তের পরিকল্পনা করিয়া সংস্কৃত টীকার দোষ ধরিয়াছেন। চর্য্যার এই সকল রূপকের অন্তরালে যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই লক্ষিত হয়, তাহার ধারণা থাকিলে গর্ত্তের পরিকল্পনা করিয়া সংস্কৃত টীকার দোষ ধরা যাইতে পারে না। তথাপি আমি আমার গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্টায় "গাতি" পাঠেরও সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছি। সংস্কৃত টীকায় আছে—"সংবৃত্তবোধিচিত্ত স্বনাশকত্বেন স এব চিত্তমূষকঃ কালঃ।" অতএব "কাল" পাঠ গ্রহণ করাই সঙ্গত। সংস্কৃত টীকাতেও "তাব সেত্যাদি" পাঠ পাওয়া যায়। অতএব "তাব" হইতে 'সে" পৃথক্। কিন্তু প্রবোধবাবু "তবসে" একত্র করিয়া আমারই দোষ ধরিয়াছেন।

২৯ সংখ্যক চর্য্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং শহীদুল্লা সাহেবের ধৃত পাঠ "ভাইব"। সংস্কৃত টীকার "ভাব্য" হইতে "ভাইব" সমর্থনযোগ্য, কিন্তু প্রবোধবাবুর "ভাবই" সমর্থিত হয় না। অথচ এই "ভাইব" পাঠ ব্যাকরণ-সম্মত নহে বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শহীদুল্লা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে হয় না? অপিনিহিতি এবং অভিশ্রুতির ফলে ভাইব হইতে পারে, ভাবই হয় না।

৩০ সংখ্যক চর্য্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ "তৈলোএ"। সংস্কৃত টীকাতেও রহিয়াছে—"এতস্মিন্ ত্রৈলোক্য" ইত্যাদি। অতএব "তৈলোএ" পাঠই সঙ্গত। তদ্ধিত প্রত্যয় না করিলে "ত্রিলোক" হইতে "তিলোএ"

হইতে পারে। ইহা লইয়া চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

৩১ সংখ্যক চর্য্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং শহীদুল্লা সাহেবের পাঠ করুণা। ১২, ৮, এবং ৩০ সংখ্যক চর্য্যাতে প্রবোধবাবু করুণা পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। হঠাৎ যে তিনি এই চর্য্যায় "করুণ" লিখিয়া মুদ্রিত পাঠ সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত হইয়াছে কি? করুণাই নির্ব্বাণের সহচরী, অতএব "করুণা ডমরু"ই অর্থ-সঙ্গত হয়। তারপর সংস্কৃত টীকার-"রাজতে শোভতে" হইতে রাজই হয়। অকারের ই-শ্রুতির জন্য যে, 'বাজঅ" এর সহিত "রাজই" সমধ্বনিযুক্ত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহা সেই সময়ে স্বীকৃত না হইলে "বাজঅ" ও "রাজই" লিখিত হইত না। পরবর্ত্তী 'পড়িভাসঅ' এর সহিত মিলাইবার জন্য প্রবোধবাবু যে 'পইসঅ' লিখিয়াছেন তাহাতেও এই নীতিই স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ প্রবেশতি হইতে পইসই হইয়া পইসঅ।

৩২ সংখ্যক চর্য্যার ভাইলা। সংস্কৃত টীকাতে আছে—"মহাসুখপুরগমনায় অবধূতীমার্গমতীব সুসারমবক্রঞ্চ।" অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই শব্দটি "ভাল" অর্থেই টীকাকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, হইলা বা ভাবিলে অর্থে নহে।

৩৮ সংখ্যক চর্য্যায় শাস্ত্রীমহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ "সুনকরুণরি", আমিও তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু প্রবোধ বাবুর পাঠ-"সুন করুণ রে"। সুন ও করুণার সন্ধিজাত একটি সমস্তপদ গঠিত হইয়াছে, তাহা এইভাবে পৃথক্ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, "রে" পৃথক্ করিলে পদটি বিভক্তি বর্জ্জিত হয়, অতএব ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। শহীদুল্লা সাহেবও "সুন করুণরে" পাঠ গ্রহণ করিয়া "শূন্যকরুণাকে" অর্থ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠে "তোহোরি"র ন্যায় ষষ্ঠী বিভক্তিতে "শূন্য করুণার" অর্থ-গৃহীত হইয়াছে। ইহা যে একটা বিভক্তিযুক্ত পদ তাহা প্রবোধবাবুর পাঠে বুঝা যায় না। প্রবোধবাবু তিব্বতীয় পাঠের যে অনুবাদ দিয়াছেন তাহা এই—"অলক্ষণ-লক্ষণম্

চিত্তম্ মহাসুখেন বিলসতি।" ইহাতে বুঝা যায়, চিত্তই বিলাস করিতেছে। কিন্তু চর্য্যার পাঠে এই বিলাস করার কর্ত্তা পদকর্ত্তা-দারিক। এইজন্য আমি "অলক্‌খলক্‌খণ—চিত্তা" পাঠ গ্রহণ করিয়া পদটিকে দারিকের বিশেষণরূপে পরিণত করিয়াছি। ইহা না করিলে এই দুই পংক্তির অর্থ-সমন্বয় করা যায় না। শহীদুল্লা সাহেবও লিখিয়াছেন "অলক্ষালক্ষচিত্ত (হইয়া)" ইত্যাদি। অতএব ইহা যে দারিকের বিশেষণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রবোধ বাবুর পাঠেই রহিয়াছে "অলক্‌খলক্‌খই", আমার পাঠে নহে।

৩৫ সং চর্য্যা। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ অচ্ছিলেঁ। টীকার "স্থিতো'স্মি" হইতে আমি ছিলাম, এই অর্থই সঙ্গত। প্রাচীন বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই অহম্ জাত ওঁ'র প্রয়োগ লক্ষিত হয়। মুদ্রিত পাঠে চন্দ্রবিন্দু সহ অচ্ছিলেঁ রহিয়াছে। বোধহয় ওকারের সম্মুখস্থ আকারটি লিপিকর প্রমাদে বাদ পড়িয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে "অচ্ছিল" পাঠে (আমি ছিলাম অর্থে) অত্যাধুনিকতার সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। অতএব অচ্ছিলোঁ পাঠেই প্রাচীনত্বের নিদর্শন রহিয়াছে, এইজন্য তাহাই গ্রহণ করা সঙ্গত। মকুঁ পাঠ শহীদুল্লা সাহেবও গ্রহণ করিয়াছেন। মম হইতে মো এবং ম প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত রহিয়াছে (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন দ্রষ্টব্য)। অতএব মোকু এবং মকুঁ পাঠ সঙ্গত হইলেও প্রবোধবাবুর পক্ষে ক'এর চন্দ্রবিন্দু লোপ করা সঙ্গত হয় নাই। প্রবোধবাবুর "সর্ব্বই" অপেক্ষা "সব্বই" অধিকতর প্রাকৃতগন্ধী বলিয়া সমর্থনযোগ্য।

৩৭ সং চর্য্যা। সংস্কৃত টীকাতে রহিয়াছে—"সহজং পৃথক্ ইতি মা কুরু।" অতএব আমি এবং শহীদুল্লা সাহেবও "মা" পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। তৎপরিবর্ত্তে প্রবোধবাবুর "নাহি" পাঠে অনাবশ্যক মূলের পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হয়! ইহাতে ভাবার্থ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু মূলের অনাবশ্যক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

৩৮ সং চর্য্যার মেল। সংস্কৃত টীকাতে আছে—"সহজানন্দোপায়ং গৃহীত্বা

নৌপরিত্যাগং কুরু।" অতএব এখানে একটিতে গ্রহণ করা, এবং অপরটিতে পরিত্যাগ করার ধারণা রহিয়াছে। এইজন্য দুইটি পাঠই একইরূপে গ্রহণ করা যায় না। ৬ষ্ঠ এবং ১৮শ চর্য্যায় মেলি শব্দ পরিত্যাগ করা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব নৌ-পরিত্যাগ করিয়া সহজানন্দ উপায় গ্রহণ কর। এইজন্য মিল ধাতু হইতে অনুস্বার ত, থ জাত অ যোগে মেল। তিব্বতীয় অনুবাদের "মিলিয়া মিলিয়া" পাঠ টীকা অনুসারী নহে।

৩৯ সং চর্য্যা। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ—"সুইনা হ অবিদার।" শহীদুল্লা সাহেবও এই পাঠই গ্রহণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন "অবিদ্যার দোষে।" তিব্বতীয় অনুবাদের ব্যাখ্যা হয়—"ওরে মন, তোর দোষে the hands of শূন্যতা are extended." এবং ইহাই অবলম্বন করিয়া প্রবোধবাবু চর্য্যার পাঠ-সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ প্রকৃত অর্থ এই—"ওরে মন, তুই অবিদ্যাবৃত আছিস্ বলিয়াই তোর স্বপ্ন (ভবের অস্তিত্বের কল্পনারূপ প্রতিভাস) বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটা পাঠ যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাতে সর্ব্বাগ্রে অর্থ-সঙ্গতি রক্ষিত হওয়া প্রয়োজনীয়। প্রবোধবাবুর পাঠে বিপরীত অর্থান্তরন্যাস হইয়াছে। এই জাতীয় তিব্বতীয় অনুবাদের সাহায্যে চর্য্যার পাঠ সংশোধিত হইতে পারেনা।

৪১ সংখ্যক চর্য্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং শহীদুল্লা সাহেবের ধৃত পাঠ "ভাংতিএঁ, সসরসিংগে, সহাব।" আর প্রবোধবাবু তৎপরিবর্ত্তে "ভন্তিএঁ, সসসিংগে, সহাবা" লিখিয়াছেন। সংস্কৃত টীকার "ভ্রাংত্যা" হইতে "ভাংতিএঁ" স্বাভাবিক, "ভন্তিএঁ" সমর্থিত হয় না, অথচ তিনিই এই চর্য্যার শেষভাগে "ভান্তী" লিখিয়াছেন। টীকায় আছে—"শশশৃঙ্গোপমং চ", তাহা হইতে সমাসবদ্ধপদ "সসসিংগে" হইতে পারে, কিন্তু এই সন্ধি-বিচ্ছেদ করিয়া মুদ্রিত গ্রন্থে "সসরসিংগে" লিখিত হইয়া থাকিলে তাহাতে অপরাধের কোন কাজ হয় নাই। "স্বভাব" হইতে "সহাব" ই হয়, "সহাবা" অনাবশ্যক।

৪২ সংখ্যক চর্য্যায় প্রবোধবাবু আবার "তৈলোএ"র উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত টীকার "ত্রৈলোক্য" হইতে "তৈলোএ" স্বাভাবিক, কিন্তু "তিলোএ"

পাঠ যে "ত্রিলোক" হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রবোধবাবু আমার মস্ত বড় একটা ভুল প্রদর্শন করিয়া আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ২০ সং চর্য্যায় আমার মুদ্রিত পাঠ "অন্তউরি"। যাঁহারা অন্যের গ্রন্থ সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন তাঁহাদের অন্ততঃ ঐ গ্রন্থ ভালভাবে পাঠ করা উচিত। আমার গ্রন্থের ১৭৯ পৃষ্ঠায় শব্দসূচীতে "অন্তউড়ি" রহিয়াছে। অতএব ছাপার ভুলে যে, "অন্তউরি" হইয়াছে তাহা তাঁহার বুঝা উচিত ছিল। বিশেষতঃ চর্য্যার পাঠ পরিবর্ত্তিত করিয়া যদি আমি "অন্তউরি" লিখিতাম, তাহা হইলে নীচে একটা পাঠান্তরের নির্দ্দেশ নিশ্চয়ই থাকিত। এই ছাপার ভুলটাকে ভিত্তি করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"র ও ড় এর মধ্যে কি কোন ধ্বনিগত পার্থক্য নাই? এই কয়েকটি উদাহরণ হতেই তাঁর বানানগত সংশোধনের ভিত্তি যে অতি শিথিল তা বোঝা যাবে।" এই কথা লিখিবার পূর্ব্বে তিনি যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটির আলোচনা করিয়া উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা তাঁহার পক্ষে শোভনীয় হয় নাই।

সে যাহাই হউক, প্রবোধবাবু নিতান্ত কৃপণের ন্যায় আমাকে একটু প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। মূল পুথির ফাড্ডিঅ, নিয়ড্ডী প্রভৃতিকে আমি ফাড়িঅ, নিয়ড়ি'তে পরিণত করিয়াছি। "এগুলি প্রাকৃত শব্দ হিসাবেই গ্রহণ করা চলে বলিয়া এ সংশোধনের কোন প্রয়োজন আছে" বলে তিনি মনে করেন না। অথচ তাঁহার গৃহীত পাঠে ফাড্ডিঅ, নিয়ড্ডীই রহিয়াছে। শহীদুল্লা সাহেব কিন্তু ইহাদিগকে সংশোধিত করিয়া আমার ন্যায় পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন।

৩ সংখ্যক চর্য্যার আলোচনায় প্রবোধবাবু লিখিয়াছেন—"মূল—স ড়ুলী, লিপিকর-প্রমাদে "ঘ" "স" হয়েছে—আমার সংশোধিত পাঠ ঘড়ুলী সংস্কৃত টীকায়—ঘড়ুলী। মণীন্দ্রবাবু লিখেছেন ঘড়লী এবং তার পূর্ব্বে "সে" শব্দ যোগ করেছেন।" কেবল মণীন্দ্রবাবুই করেন নাই, শহীদুল্লা সাহেবও "সে ঘড়লী"

পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ইহার জবাবের জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল হয়। সংস্কৃত টীকাতে আছে—"সৈব ** ঘটতীতি কৃত্বা ঘটী।" অতএব ঘটী হইতে ক্ষুদ্রার্থে ঘড়লী হইলেই চলিতে পারে, ঘড়ুলী অনাবশ্যক।

৫ সংখ্যক চর্য্যার মূল পাঠ "কোহিঅ", প্রবোধবাবুও ইহাই রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু টীকাতে আছে—"দৃঢং করোতি"। এইজন্য সমগ্র পঙ্‌ক্তির অন্বয় সাধন করিয়া আমি টীকাতে লিখিয়াছি—"অদঅ টাঙ্গী (দ্বারা) নিবাণে দিঢ কোরিঅ।" শহীদুল্লা সাহেব "কোড়িঅ" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কৃ ধাতু হইতে শব্দটি "কোরিঅ" হওয়াই সঙ্গত। প্রবোধবাবু আপত্তি তুলিয়াছেন যে, টাঙ্গী দিয়ে কাটা হয়, দৃঢ় করা হয় না। তিনি কি কাঠের মিস্ত্রীদিগকে কাজ করিতে দেখেন নাই? কুঠার দ্বারা তক্তা সমান্তরাল করিয়া যখন জোড়া হয়, তখনই জিনিষটি দৃঢ় হয়, নতুবা সংস্কারহীন সাধারণ তক্তা কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। এখানে আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে, চিত্তের দোষ উক্ত প্রকারে সংস্কৃত করিয়া নির্ব্বাণকে দৃঢ় কর। যাহাই হউক, যখন টীকাতে "দৃঢ়ং করোতি" রহিয়াছে, তখন কোরিঅ পাঠই সঙ্গত, প্রবোধবাবুর "কোহিঅ" নহে।

৭ সংখ্যক চর্য্যায় "মোহিঅহি" পাঠ রহিয়াছে, অথচ টীকায় তাহার কোন ব্যাখ্যা নাই। চর্য্যার পাঠের অর্থ এই যে, মহাসুখপুর আমার সন্নিহিত রহিয়াছে। পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তির অর্থ—"ইহা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে না" ইহা হওয়া সঙ্গত, না, "মোহাভিভূত অবস্থায় আমি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারি না" ইহাই সঙ্গত? চর্য্যাকার যদি মহাসুখপুরের সন্ধানই পাইয়া থাকেন, তবে "ইহা তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না" বলিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু অবিদ্যাবৃত অবস্থায় প্রবেশ করিতে পারি না, এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অর্থ-সঙ্গতির জন্য ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৮ সংখ্যক চর্য্যায় মূলে রহিয়াছে—"ডোম্বি তআগলি", আর সংস্কৃত টীকাতে

আছে—"ডোম্বীব্যতিরেকাৎ"। অতএব এখানে অপাদানের অর্থ অতিশয় স্পষ্ট। ত্বম্ হইতে তুম্ হইয়া তো হইতে পারে, ত হয় না। তব হইতেও তো হইতে পারে, ত হয় না। অতএব প্রবোধবাবুর পাঠ "ডোম্বী ত আগলী" ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। তারপর যখন ত আছে, তখন তাহাকে "তো" তে পরিবর্ত্তিত না করিয়া অপাদান অর্থে (তু° —মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহী) গ্রহণ করিলেই কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয় না। অপাদান না হয়ে সম্বোধন হলে, এক্ষেত্রে যে ব্যাকরণগত সামঞ্জস্য থাকে না (কারণ প্রবোধবাবুর দৃষ্টান্ত "তোহোরে", "তোরে" প্রভৃতিতে "তো" ই রহিয়াছে, ত নহে) তাহা আমি ভালরূপেই বিচার করিয়া দেখিয়াছি। প্রবোধবাবুও "রে ডোম্বী তোর চাইতে" লিখিয়াছেন। ইহাতে অপাদানের অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে।

২০ সংখ্যক চর্য্যার মূল পাঠ-"জাণ জোবন"। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন —"গানে জাণ জোবণ, টীকায় নবযৌবন"। অতএব মূল পাঠের সহিত টীকার বিভিন্নতা রহিয়াছে। এইজন্য মূল পাঠ রক্ষা করা যায় কিনা তাহা দেখা কর্ত্তব্য। আমার গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় আমি লিখিয়াছি—"জ্ঞান—জাণ"। প্রবোধবাবুর যে,—"বিজ্ঞান যৌবন" এর উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে ছন্দে ১৪ অক্ষর পূর্ণ করিবার জন্য বি উপসর্গ-যোগ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান। প্রবোধবাবু ভুল করিয়া কল্পনা করিয়াছেন যে, আমি বিজ্ঞান হইতে "জাণ" এর উদ্ভব সিদ্ধ করিয়াছি। "নব যৌবন" পাঠের আপত্তি এই যে, সেই সময়ে কেবল অনর্থেরই সূত্রপাত হয়, পরমার্থসত্যানুভূতি নব যৌবনে হয় না। অতএব বিশিষ্ট জ্ঞানরূপ যৌবন দ্বারাই একমাত্র "বিষয়মগুলোপ-সংহার" করা যাইতে পারে। চর্য্যার পরবর্ত্তী পঙ্ক্তির অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে "জাণ জোবণ" পাঠই গ্রহণীয়। কিন্তু এই আলোচনায় অগ্রসর হইয়া এখন আমি টীকার "নবযৌবন" প্রয়োগের হেতু সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। ১২ সংখ্যক চর্য্যায় "নঅবল" রহিয়াছে। তাহার ব্যাখ্যায় টীকাতে বলা হইয়াছে "চতুর্থানন্দবলম্"। অতএব এখানেও

চতুর্থানন্দের ধারণা জন্মিয়াছে. এইরূপ যৌবনকেই নব যৌবন বলা হইয়া থাকিবে। ইহার অর্থ নূতন যৌবন নহে। সংস্কৃত টীকাতে ভাবার্থমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

৩০ সংখ্যক চর্য্যার মূল পাঠ "এত বিষারা"। ইহার টীকায় রহিয়াছে—"চতুর্থানন্দ ব্যতিরেকান্নান্যোপায়ো'স্তি॥" অতএব প্রবোধবাবু যে বলিয়াছেন আনন্দের কোন উল্লেখ নাই, তাহা তাঁহার মনগড়া উক্তি মাত্র। চতুর্থানন্দ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই, ইহাতে চতুর্থানন্দের বিস্তৃতিই লক্ষিত হইয়াছে। সংস্কৃত টীকাই আমার পাঠ সমর্থন করে। "এত বি সার' পাঠে অহেতুক মূল পাঠের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এই পাঠেও দেখা যায় যে, আনন্দই সার পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অতএব আনন্দের উল্লেখ নাই, ইহা প্রবোধবাবুর ইচ্ছাকৃত সত্যের অপলাপ মাত্র।

প্রবোধবাবুর এইরূপ খামখেয়ালীর আর একটি দৃষ্টান্ত ৩২ সংখ্যক চর্য্যায় পাওয়া যায়। ইহার মূল পাঠে আছে "গজিই"। আর টীকাতে আছে—"যোগিবরৈরনুগম্যতে"। অথচ প্রবোধবাবু লিখিয়াছেন—"টীকায় কোথাও 'অনুগম্যতে' নাই"। ইহা ইচ্ছাকৃত সত্যের অপলাপ নহে কি? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি যে "মজিই" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যায় টীকাতে ধৃত হইয়াছে,—মোহাদিতর্জ্জনসঙ্গমেন সংসারসমুদ্রে মজ্জংতি।" "ইহা পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তির "অবসরি জাই" এর অর্থ, আলোচ্য পঙ্‌ক্তির সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। তিব্বতীয় অনুবাদে যদি "সানন্দে যায়" এই ব্যাখ্যা ধৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা অবলম্বন করিয়া চর্য্যার পাঠ সংশোধিত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। প্রবোধবাবুর গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, তিনি পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তির "মজ্জন্তি" অবলম্বনে ভ্রান্তি বশতঃ "মজিই" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

৩৩ সংখ্যক চর্য্যার মূল পাঠে আছে—"সো ধনি বুধী"। প্রবোধবাবু তাঁহার পূর্ব্বের পাঠ সংশোধিত করিয়া লিখিয়াছেন—"তিব্বতীতে আছে—"যঃ প্রাজ্ঞঃ স এব প্রজ্ঞাহীনঃ—জো সো বুধী সো নিবুধী।" তাহা হইলে মূল পাঠের

"ধ" কোথায় গেল? এইভাবে কাটিয়া ছাটিয়া পাঠ-নির্ণয় করিতে হয় নাকি? টীকাতে আছে—"বালযোগিনাং যা বুদ্ধিঃ সবিকল্পজ্ঞানং সা পরমার্থবিদাং গুরুপ্রসাদাৎ নিরুপলম্ভরূপা"। অতএব পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ হইয়া গুরুপ্রসাদে চিত্ত পরিশুদ্ধ হইলে সবিকল্প জ্ঞান থাকে না। এইজন্য শুদ্ধ হইতে "সোধ" পাঠ গ্রহণ করিলে আর উক্তপ্রকার ছাটা-কাটার প্রয়োজন হয় না। প্রবোধ-বাবু লিখিয়াছেন—"মণীন্দ্রবাবুর "শোধ নিবুধী"র শোধ অর্থহীন"। যে ইচ্ছাপূর্ব্বক না বুঝিবার ভাণ করে, তাহাকে বুঝাইতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা মাত্র। আমার টীকায় "শুদ্ধ" হইতে যে "সোধ" হইয়াছে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

৩৫ সংখ্যক চর্য্যার মূল পাঠে রহিয়াছে—পণিআঁ। আমি ইহার পরিবর্ত্তে "পসিআ" পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। প্রথমতঃ আমার পক্ষে ইহার কারণ প্রদর্শন করা প্রয়োজনীয়। "অহারিল" যেমন ৮ম পঙ্‌ক্তিতে রহিয়াছে, সেইরূপ দশম পঙ্‌ক্তিতেও আছে—"অহার কএলা"। ইহার টীকায় আছে "অনাদিভববিকল্পাধারচিত্তরাজো ময়া সর্ব্বধর্ম্মানুপলম্ভসমুদ্রে প্রবেশিতঃ"। অতএব "অহার কএলা" অর্থে-সর্ব্বধর্ম্মানুপলম্ভসমুদ্রে প্রবেশ করা। এই অহারিউ শব্দটি ১৯ এবং ২৬ সংখ্যক চর্য্যাতেও রহিয়াছে। তাহার অর্থ যথাক্রমে—"অহারিতম্ বিনষ্টীকৃতম্", এবং ২৬ সংখ্যক চর্য্যার "সুণে অহারিউ" অর্থে—"প্রভাস্বরে চিত্তং প্রবেশিতং ময়া"। অতএব "পণিআঁ" স্থানে "পসিআ" পাঠ গ্রহণ করা নিতান্ত স্বাভাবিক। এই চর্য্যার মূল বক্তব্য বিষয় এই যে, আমার চিত্তরাজ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব "মই অহারিল গঅণত পসিআ" অর্থে—আমি সর্ব্বধর্ম্মের অনুপলম্ভরূপ মহাশূন্য-সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছি। "আমা দ্বারা গগন হইতে পাণি আহার করা হয়েছে" এই অর্থ অতিশয় হাস্যকর। এই পাণি কি? জল নাকি? অথচ চর্য্যার টীকায় কোথাও পাণির উল্লেখ নাই। সে যাহাই হউক, আমি গগনে পশিয়া অহারিত বা বিনষ্ট হইয়াছি এই অর্থ করিলেই মূল চর্য্যাতত্ত্বে প্রবেশ করা যায়, এবং টীকার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। ইহাতে "অহারিল" পদের কর্ম্ম

খুঁজিবার প্রয়োজন হয় না। টীকাতে "সমুদ্রে"র উল্লেখে অধিকরণের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি ১৮শ চর্য্যার "ডোম্বীত" পাঠের অপাদানত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন দায়ে পড়িয়া তিনিই "গগণত" পাঠে অপাদানের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবোধবাবু আমার ভাবানুবাদের "গগনসমুদ্রে আমি করেছি প্রবেশ" এর উল্লেখ করিয়া যে টীপ্পনী করিয়াছেন, তাহা অনাবশ্যক, কারণ ভাবানুবাদ ভাবানুবাদই। তৎপরিবর্ত্তে যদি বলা যায়—"গগনে প্রবেশি আমি বিনষ্ট হয়েছি", তাহা হইলে ভাগবত শুদ্ধ হইবেত ?

৩৬ সংখ্যক চর্য্যার পাঠে আছে—"সঅল সুফল করি। এই "সুফল" শব্দটি যে বিশিষ্টার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় সংস্কৃত টীকা হইতে—"সকলং ত্রৈলোক্যং পরিশোধ্য"। একটি সংস্কৃত শ্লোকে আছে—"দেবতার ঋণ যজ্ঞ দ্বারা, শোধ করিতে হয়।" এখানেও ত্রিলোকের কথাই পাওয়া যাইতেছে। তারপর আমার গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় আমি লিখিয়াছি—"গয়া—কার্য্যের পরে সর্ব্বশেষে সুফল-গ্রহণের প্রথা আছে। সব নিঃশেষে পরিশোধ করিয়া এই অর্থ। অতএব সুফল শব্দটি পরিশোধ করা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তিব্বতীয় অনুবাদে যদি "মুক্তীকৃত্য" থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা সমস্ত দায় হইতে মুক্ত করার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব ইহা পরিশোধ করার ভাবার্থ মাত্র। এখন ইহা অবলম্বন করিয়া অর্থযুক্ত "সুফল" শব্দের পরিবর্ত্তে "মুকল" পাঠ গ্রহণ করিলে ভাবার্থের প্রাধান্য দিয়া মূল পুঁথির পাঠের পরিবর্ত্তন করা হয় মাত্র। ইহা কেহই সমর্থন করিতে পারে না। তারপর "ঘোরিঅ"। টীকাতে আছে—"চন্দ্রসূর্য্যয়োর্ঘাতায়াতং পগুয়িত্বা। ঘানিকেতি। অবধূতিকা পবনঞ্চ সহজানন্দং প্রবেশয়িত্বা॥" তিব্বতীয় অনুবাদে "মিশ্রীকৃত্য" রহিয়াছে। কি মিশ্রিত করিয়া ? টীকার অবধূতিকা, পবন এবং সহজানন্দ কি ? অতএব তিব্বতীয় অনুবাদও কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিতেছে না। যাহাই হউক, এই পঙ্‌ক্তিটি পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, এই "ঘোরিঅ" শব্দটি যেন "অবণাগমণ বিহীনের" বিশেষণরূপে ব্যবহৃত

হইয়াছে। এইজন্য শব্দসূচীতে আমি লিখিয়াছি—"ঘূর্ণিত হইতে ঘোরিঅ; বিশেষণ।" ঘ্রাণিক হইতে ঘাণিক—ঘাণী। সরিষার তেলের কলে প্রবেশ করা মাত্র নাক জ্বলিয়া যায়। এইজন্য ঘ্রাণিক হইতে ঘাণিকের উৎপত্তি কল্পিত হইতে পারে। ঘাণী ঘোরে বলিয়া বোধহয় ঘোরিঅ। অতএব গমনাগমনের ঘুরপাক বলা হইয়াছে। মিশ্রীকৃত্যকে ঘোলিঅতে পরিবর্ত্তিত করাই বরং বহু অনুমান-সাপেক্ষ।

৩৭ সংখ্যক চর্য্যার "অছিলেসি"। টীকায় রহিয়াছে—'উৎপাদকালে পরিধরনৈরাত্ম্যাভিস্বঙ্গাৎ মহাসুখময়োৎপন্নোহং মহাবজ্রধরঃ। পুনরপি বজ্রগুরুণা তস্মিন্নেবার্থে দৃঢ়ীকৃতোস্মীতি তস্মাৎ ভো সিদ্ধাচার্য্য সহজং পৃথক্ ইতি মা কুরু। নিঃশঙ্কং সিংহরূপেণ ভ্রম।" অর্থাৎ উৎপাদকালে মহাসুখ লইয়াই আমি উৎপন্ন হইয়াছিলাম। এখন গুরুর উপদেশে তাহাতে দৃঢ় হইয়াছি। অতএব সহজকে পৃথক্ ভাবিও না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে তুমি যেমন ছিলে, এখনও সেইরূপই আছে, ইহাই টীকার অভিপ্রেত। এইজন্য "অছিলেসি" পাঠই সঙ্গত। প্রবোধবাবু তিব্বতীয় অনুবাদের দোহাই দিয়া ইহাকে "ইছিলেসি"তে পরিণত করিতে যাইয়া "নিঃশঙ্কং সিংহরূপেণ ভ্রম" ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাত টীকার ফলশ্রুতি মাত্র, মূল টীকার সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। অথচ ইহাকে অবলম্বন করিয়াই "ইছিলেসি" পাঠের সমর্থন করা হইয়াছে:

প্রবোধবাবু একটি বিষয় বিবেচনা করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ আমার গ্রন্থের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব আমি যে পাঠান্তর গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশেষ বিবেচনার সহিতই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সংস্কৃত টীকা, তিব্বতীয় অনুবাদ, ব্যাকরণ প্রভৃতি বহু বিষয় বিবেচনা করিয়া যে আমি পাঠ নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তিনি আমার যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা যে তাঁহারই ভ্রান্তি মাত্র, এবং ধোপে টিকেনা, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তথাপি তিনি লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বের পাঠালোচনা

হতেই বেশ বোঝা যাবে যে, পাঠ-নির্দ্ধারণে মণীন্দ্রবাবু কোন একটা সুচিন্তিত প্রণালী অনুসরণ করেন নাই", ইত্যাদি। ইহা তাঁহার হামবড় ভাবের উক্তি মাত্র। আমার বিশ্বাস (বাধ্য হইয়া ইহা বলিতে হইতেছে বলিয়া আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি) চর্য্যার একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত করিবার দিকে যে আমার গ্রন্থ অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছে তাহা এখন তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য। তিনি না করুন, আমার গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকেই লিখিয়াছেন যে, এতদিনে চর্য্যার একটি নির্ভর-যোগ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইল, এবং চর্য্যার দুর্জ্ঞেয় তত্বের মধ্যে সাধারণ পাঠকের প্রবেশাধিকার জন্মিয়াছে।

আমার গ্রন্থের প্রতি যে প্রবোধবাবুর বিদ্বেষের কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা এখানে বলা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। সাহিত্য-পরিষদে যাতায়াত করিবার কালে ইহার বর্ত্তমান কর্ণধার ব্রজেন্দ্রবাবু একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন—"প্রবোধবাবু বহুকাল যাবৎ চর্য্যা-সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ আজ পর্য্যন্ত কোন কপি দেন নাই। আমি আপনাকে এই ভার প্রদান করিলাম।" ইহার পরে আমি কার্য্য আরম্ভ করি। তিন চারি মাস পরে তিনি বলিলেন—"প্রবোধবাবুই সম্পাদন করিবেন, অতএব আপনাকে আর এই ভার দিতে পারি না।" কিন্তু তখন আমি কার্য্য প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহা প্রকাশিত করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। আজ পর্য্যন্ত পরিষদ্ প্রবোধবাবুর নিকট হইতে কোন কপি পাইয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহার এই আলোচনা হইতে মনে হয় তিনি যেন কিছু প্রসব করিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু প্রায় দশ বৎসর তিনি চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন কেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? প্রবোধবাবু তাঁহার এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাত বিচারসহ নহে। চর্য্যার পাঠ ছিল, সংস্কৃত টীকা ছিল, ইহার উপর আবার তিব্বতীয় অনুবাদও তিনি পাইয়াছিলেন। এই সকল উপকরণ থাকা সত্বেও তিনি এতদিন কিছুই করিতে পারেন নাই কেন? আর আজ আমার গ্রন্থ

প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া যে তিনি অহেতুক আক্রমণে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আমার গ্রন্থ প্রামানিক সংস্করণরূপে গৃহীত হইতে পারে, প্রবোধবাবুর এই ভীতি সম্পূর্ণই অহেতুক, কারণ আমি জানি যে, দলবদ্ধ হইয়া "পরস্পর প্রশংসাকারী-সমিতি" (Mutual Admiration Society) গঠিত করিতে না পারিলে বর্ত্তমানে সকল পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়। অতএব তাঁহার বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই।

বিদ্যাপতি

ব্রজবুলি

বিদ্যাপতির পদাবলী যে অবস্থায় আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ইহার অধিকাংশ পদই তথা-কথিত ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। অতএব প্রথমতঃ পদের বাহন ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরে পদান্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ব্রজবুলির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় অদ্ভুত তত্ত্ব এদেশে প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে মুসলমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু তখনও মিথিলায় হিন্দুরাজগণ স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া মৈথিলী পণ্ডিতগণ ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের চর্চ্চায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য মিথিলায় গমন করিতেন। তাঁহারা মিথিলার কবিগণের সুমধুর পদাবলী কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রমে বঙ্গ-কবিগণ তাহাদের মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া মৈথিলী ও বাঙ্গালার মিশ্রণে উৎপন্ন ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই নাকি ব্রজবুলির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় ইতিহাস। ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, ব্রজবুলি বাঙ্গালার উপভাষা মাত্র, এবং ইহা বঙ্গদেশে উৎপন্ন, পরিপুষ্ট, এবং বঙ্গীয় কবিগণ দ্বারাই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে।[১] কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে। ব্রজবুলির উৎপত্তি যদি বঙ্গদেশেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ

১। Brajabuli is really a dialect of Bengali, and in the sense that it had originated and developed in Bengal and had been cultivated exclusively by Bengali poets. (History of Brajabuli Literature, by Dr. S. K. Sen, P. 1.)

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই, ইহার প্রচলন মাদ্রাজের সীমান্ত প্রদেশ হইতে আসাম পর্য্যন্ত কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে? চৈতন্যদেবের সহিত রামানন্দ রায়ের সাক্ষাৎ ১৫১১।১২ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। তিনি সেই সময়ে ব্রজবুলিতে রচিত একটি পদ চৈতন্যদেবকে শুনাইয়াছিলেন। অতএব ইহা সেই সময়ের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। তাহা হইলে এই গীত রচনার সময় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। সেই সময়ে তিনি ছিলেন গোদাবরী-তীরে অর্থাৎ মাদ্রাজের সীমান্ত প্রদেশের সন্নিকটে। আর বঙ্গদেশের প্রথম ব্রজবুলিতে রচিত পদের সন্ধান নাকি পাওয়া যায় যশোরাজ খানের রচনায়। কবি এই পদটিতে হোসেন সাহের উল্লেখ করিয়াছেন। হোসেন সাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ। অতএব এই সময়ের মধ্যে পদটি রচিত হইয়া থাকিবে। ইহা প্রায় রামানন্দ রায়ের রচনার সমসাময়িক। সেই সময়ে রেডিও যন্ত্রের উদ্ভাবন হয় নাই। অতএব বঙ্গদেশে উৎপন্ন ব্রজবুলি রামানন্দ রায়ে সংক্রামিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ রামানন্দের পদ ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু যশোরাজের পদ ইহার পরেও রচিত হইতে পারে। কারণ হোসেন সাহ সুশাসক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার পরেই ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা সঙ্গত। এই অবস্থায় ব্রজবুলির উৎপত্তি বাঙ্গালা দেশে হইয়াছিল ইহা বলা যাইতে পারে না। অতএব বাঙ্গালা ও মৈথিলীর মিশ্রণে ব্রজবুলির উৎপত্তির সিদ্ধান্তও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষার সহিত মৈথিলীর মিশ্রণে ব্রজবুলির উৎপত্তি হইয়াছিল, এই ধারণাও সঙ্গত নহে, কারণ তাহা হইলে আমরা রামানন্দ রায়ের পদে উড়িয়া ও মৈথিলীর সংমিশ্রণ দেখিতে পাইতাম। অতএব ব্রজবুলির উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করিবার কালে মৈথিলীর কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

তাহা হইলে ব্রজবুলির উৎপত্তির ইতিহাস কি? ইহা যে কথ্য ভাষা নহে, কাব্যের ভাষা, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বেও এইরূপ কৃত্রিম ভাষায় রচনা-রীতির প্রচলন ছিল। এখানে আমরা বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যে উদ্ধৃত গাথার

কথাই বলিতেছি।[১] সায়ণাচার্য্য গাথা শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"গাথা সর্বৈর্গাতুং যোগ্যা গীতিঃ" এবং "সুভাষিতত্বেন সর্বৈর্গীয়মানা গাথা।" অর্থাৎ "যাহা সকলের গানের যোগ্য, অথবা সুভাষিত বলিয়া যাহা সকলেই গান করিয়া থাকে, তাহাই গাথা।" ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের বহু স্থানে গাথার উল্লেখ রহিয়াছে। ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্রের পদ্য অংশকে গাথা বলা হয়। জাতকে "তেন বুত্তং" বলিয়া এক একটি গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল গাথা পূর্ব্বে লোকের মুখে মুখে গীত হইত, পরে তাহা সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ললিত-বিস্তর হইতে এখানে একটি গাথা উদ্ধৃত হইল—

অধ্রুবং ত্রিভবং শরদভ্রনিভং
নটরঙ্গসমা জগি জন্মি চ্যুতি।

ইহার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি শুদ্ধ সংস্কৃতে এইরূপ হইবে—নটরঙ্গসমং জগতি জন্ম চ্যুতিঃ। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই গাথার ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃতও নহে, প্রাকৃতও নহে, কিন্তু উভয়ের বিচিত্র সংমিশ্রণ হইতে উৎপন্ন। অপভ্রংশের প্রভাবও গাথার ভাষায় লক্ষিত হয়, যথা—"উদকচন্দ্রসমা ইমি (ইমে) কামগুণাঃ" (ললিতবিস্তর), অথবা "সদেবকু (সদেবকে) লোক" (ঐ)। অপভ্রংশের স্থান সাধারণতঃ প্রাকৃতের পরবর্ত্তী স্তরে নির্দ্দেশিত হয়, কিন্তু এখানে ললিত-বিস্তরের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থেও ইহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে, এই ভাষার মধুরতা হেতু ইহা তখনই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, পরে সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। এক একটি গাথায় আবার সংস্কৃত, মাগধী, ও অপভ্রংশের বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"দ্রুমপত্র ফলা নদি শ্রোতু যথা।" এইরূপ মিশ্র ভাষায় কবিতা

১। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত পালিপ্রকাশ, প্রবেশক, ৪৮-৬৪ পৃঃ হইতে পরবর্ত্তী অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে।

রচনার নিদর্শন পরবর্ত্তীকালেও পাওয়া যায়। এখানে ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি পুথি হইতে ফকিররামের অঙ্গদরায়বারের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

অঙ্গদকো অঙ্গ দেখি, সব রাখস পাতিল মায়া।
শত শত রাওন হোকে বঅঠে, ধরকে অদভুত কাআ॥
ইনকো বাত সুনা হো সেই রোজ বিভিসনকো আগে।
রোজ রোজ জপ জজ্ঞ করে, উএ রাওনগণকে লড়কা।
আট ঘড়ি ললাটমে রহে, জজ্ঞ ভসমকি ঠড়কা॥
নহি সে এতেক জোর লঘুগুরু না মানিস্ রে।
এতেক দাউ-তেজ বিনু ইন্দ্র পকড়িস্ রে॥
কোন দাউ তেরে মান্ধাতার বাণমে ঘাস কিআথা দাঁতে।

ইত্যাদি।

ইহা সংস্কৃত তৎসম, তদ্ভব, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি মিশ্রিত এক কৃত্রিম ভাষা মাত্র। লোক-মনোরঞ্জনের জন্য যে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। ব্রজবুলির উৎপত্তিও এইভাবে হইয়াছে।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর পঞ্চম খণ্ডে ব্রজবুলির ব্যাকরণ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন (ঐ, ২৩৮-২৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে সঙ্কলিত করিয়া এই ভাষার আংশিক বিশিষ্টতা এখানে প্রদর্শিত হইল—

প্রথমার একবচনে এবং দ্বিতীয়ায় প্রায়ই কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। কখনও কখনও সপ্তমীতেও। চর্যা এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই রীতি পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কর্ত্তৃকারকে কখনও এ।

তৃতীয়ায় এ, হি, হিঁ।
ষষ্ঠীতে ক, কা, কি, কে।
সপ্তমীতে এ, হি, হিঁ।

এই সকল বিভক্তির ব্যবহার চর্য্যাপদে পাওয়া যায়। অতএব ইহা নূতন সৃষ্টি নহে।

সর্ব্বনামে উত্তমপুরুষে—হম্, হাম্, মুঝে, হমে, মোর, মঝু, হামক ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষে—তুহুঁ, তোহে, তুয়া, তোর—ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষে—সো, সেহ, তাহে, তছু, তাক, তাকর, ইত্যাদি।

ধাতুর উত্তর উত্তমপুরুষে—অ, ই, উ, ও; মধ্যমপুরুষে—অ, অসি; প্রথম-পুরুষে—অ, অই, উ ইত্যাদি।

অতীত কালে অল, এবং ভবিষ্যৎ কালে অব, অনুজ্ঞায় উ। এই সকল বিভক্তির অধিকাংশই চর্য্যাতে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, ও আসামে রচিত ব্রজবুলির প্রাথমিক পদগুলি লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে।

রামানন্দ রায়ের পদ

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানু-ঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥
না খোজলুঁ দূতি না খোজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতি।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥ ইত্যাদি।

প্রথমতঃ এই পদটির উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। পদটি চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যের অষ্টমে উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি দামোদরস্বরূপের করচা অনুসারে রামানন্দ-মিলনলীলা প্রচার করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, তথাপি ইহা যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাপ্রভু ছিলেন

বাঙ্গালী, আর রামানন্দ উড়িয়্যাবাসী, কিন্তু উভয়েই সংস্কৃতজ্ঞ, অতএব তাঁহাদের কথাবার্ত্তা সংস্কৃতে হইলেই উভয়ের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এই পদটির অনুবাদ সংস্কৃত ভাষাতেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ১৫৩২।৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে ইহাকে ব্রজবুলী-ভাষায় পাওয়া যায়।[১] কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বরূপের করচা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত গ্রন্থে এই পদটি ছিল। তাহা হইতে কবিকর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে ইহা যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু নাটকে তিনি ইহার সংস্কৃত অনুবাদ মাত্র প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইলে পদটি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত হওয়াই সম্ভবপর। অতএব সেই সময়ে বঙ্গদেশে উৎপন্ন তথাকথিত ব্রজবুলীর প্রভাব রামানন্দের উপর পতিত হইতে পারে না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পদটি রচনার জন্য তিনি বঙ্গদেশের নিকট ঋণী নহেন। রামানন্দ যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহা জগন্নাথবল্লভ নাটক হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার এই বিদ্যা যথাযথ

১। ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" নামক গ্রন্থে কবি কর্ণপূরের এই উভয় গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবি কর্ণপূরের উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনেক স্থানের ভাবানুবাদ বা আক্ষরিক অনুবাদ করিলেও তাঁহার ঋণ স্বীকার করেন নাই। ইহাতে ঐ বৃদ্ধ বৈষ্ণবের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণদাস যখন স্বরূপের করচার উল্লেখ করিয়াছেন, তখন বুঝা যায় যে, ঐ গ্রন্থ তখন তাঁহার নিকট ছিল, এবং তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া রামানন্দমিলন-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। বিমানবাবুও স্বীকার করিয়াছেন যে, কৃষ্ণদাস ও কবি কর্ণপূর উভয়েই অন্য কোন গ্রন্থ আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের স্বীকৃতি হইতে জানা যায় যে, ইহা স্বরূপের করচা। অতএব বিমানবাবুর সিদ্ধান্ত হইতেও প্রমাণিত হয় যে, কবিকর্ণপূরও ইহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, কারণ ইহা অপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রামাণিক গ্রন্থ কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল বলিয়া আজও জানা যায় নাই। যাঁহার নিকট এই গ্রন্থ ছিল, এবং রূপ-রঘুনাথ যাঁহার শিক্ষাদাতা তাঁহার নিকট করচার আদর্শে রচিত কর্ণপূরের গ্রন্থের কোনই মূল্য থাকিতে পারে না। এইজন্যই তিনি তাহার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বিশেষতঃ নাটকের শ্লোকে লিখিত ১৫৭৯।৮০ খ্রীষ্টাব্দ ইহার রচনা কাল হইলে, কৃষ্ণদাসের পক্ষে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকাও সম্ভবপর। এই সকল বিষয় তৃতীয় খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

প্রয়োগ করিয়া তিনি স্বাধীনভাবেই এই পদটি রচনা করিতে পারেন কিনা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করা যাউক।

উদ্ধৃত পদের মধ্যে রাগ, নয়ন-ভঙ্গ, অনুদিন, অবধি, রমণ, রমণী, মন, মনোভব, সখি, প্রেম-কাহিনী, দূতী, মিলন, মধ্য, পাঁচবাণ, বিরাগ প্রভৃতি শব্দ তৎসম। অন্যান্য শব্দের মধ্যে—

ভূত+ইল্ল=ভইল—ভেল। এই উভয় রূপই চর্য্যাপদে পাওয়া যায় (১১, ১৪, ২৩ প্রভৃতি চর্য্যা দ্রষ্টব্য)।

ভেলি শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে ইকার যুক্ত হইয়াছে। ক্রিয়ার এই বিশেষত্বও চর্য্যাপদে লক্ষিত হয় (তু°—ভইলী—চর্য্যা—৪৯)।

সেইরূপ গত+ইল=গেল (তু°—চর্য্যা ২,৪৭ ইত্যাদি)। অতএব অন্ততঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎপন্ন এই সকল পদের জন্য মৈথিলী প্রভাব স্বীকার্য্য নহে।

পেশিত+ইল=পেশিল, পিশিল—পেশল। ইহাতে মধ্যবর্ত্তী শকারের ইকার লোপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে রচিত (পরে প্রমাণিত হইয়াছে) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও এইরূপ বহু প্রয়োগ লক্ষিত হয়, যথা—কাল পাত করলোঁ মো উত্তরে (ঐ, ২য় সং, ১১৪ পৃঃ)। এখানে করিলোঁ স্থানে করলোঁ, কিন্তু অন্যত্র "করিলোঁ" (ঐ, ১০, ১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য), এবং "করিহ" (ঐ, ৮ পৃঃ) স্থানে "করহ" (ঐ, ৯ পৃঃ)। এই ভাবেই "বাঢ়ল", "কহবি" পদদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। শব্দের মধুরতা সম্পাদনের জন্য এই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়াছে। তথাপি ইহাতে প্রাকৃত—প্রভাবও লক্ষিত হইতে পারে, কারণ প্রাকৃতে হসামি, হসিমি, হসমি এই ত্রিবিধ প্রকার প্রয়োগই দেখা যায়। অতএব ইহার জন্য মৈথিলী প্রভাবের কল্পনা করা সঙ্গত নয়। প্রাকৃতের প্রভাবে মৈথিলীতে হয়তঃ একটা বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই প্রভাব যে বাঙ্গালাতেও পড়িয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উদ্ধৃত প্রয়োগ হইতে স্পষ্টই ধারণা করা যায়। বিশেষতঃ প্রাচীন ক্ত প্রত্যয়-জাত পদের সহিত বিশেষণের ল যুক্ত হইয়া হল, অল প্রভৃতির উদ্ভব প্রায় দুই হাজার বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী (চা, ৯৪০-৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। রামানন্দ রায় ইহার প্রভাবাধীনে আসিয়াই

এই সকল পদ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। প্রাকৃতে অস্মদ্ শব্দের প্রথমার একবচনে অহং, হং প্রভৃতি পদের প্রয়োগ রহিয়াছে। অহম্ জাত অহকম্ হইতে অ এবং ক লোপে হম্ বা হং হয়। ইহার সহিত অপভ্রংশের উ (কারণ অপভ্রংশে সর্ব্বত্র উকার-প্রবণতা দৃষ্ট হয়) যোগে হউং পদ অপভ্রংশে প্রথমার একবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইতে চর্য্যার হাঁউ পদের উৎপত্তি (ঐ, ১০, ২০ সং চর্য্যা দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে উৎপন্ন হাম, হামি, হামারা প্রভৃতি পদ এখনও বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে (চা, ৮১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তু°—"হাম সে অবলা, হৃদয় অথলা, ভালমন্দ নাহি জানি" (বৈষ্ণব পদাবলীতে)। অতএব প্রাকৃত প্রভাব জাত "হাম" মৈথিলীর সংস্পর্শে না আসিয়াও রামানন্দ রায় ব্যবহার করিতে পারেন। জগন্নাথ-বল্লভ নাটক হইতে দেখা যায় যে, প্রাকৃতের সহিত তিনি বিশেষরূপেই পরিচিত ছিলেন।

প্রাকৃতের সম্বন্ধ ও সম্প্রদানের দোণ্হং হইতে দুহুঁ (অপভ্রংশের উকার প্রবণতার প্রভাবে) উৎপন্ন হইয়াছে। তুলনীয় দুইহো (কৃঃ কীঃ, ২য় সং, ৯৭, ১০৬ পৃঃ)। ইহার সহিত ষষ্ঠীর ক যোগে দুহুঁক।

সং—যাদৃশন হইতে জেহেন—জেহ্ন—জেন। ইহাই জনি রূপে উদ্ধৃত পদে পাওয়া যাইতেছে। গাথা ভাষায় পদের অন্তে কখনও ই-কার, এবং উ-কার ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা[১]—"বিপশ্য ধর্ম্মং ইমি (ইমং)", এবং —"কুশলং ইমু (ইদং) সর্ব্বং।" প্রাচীন বাঙ্গালা রচনাতেও এই উভয় রূপই পাওয়া যায়, যথা—"না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে" (পদাবলী) এবং—"চণ্ডীর আজ্ঞায় হনু হাতে পাজি দ্বিজ জনু" (কবিকঃ)। অতএব গাথা-অপভ্রংশের প্রভাবে "জনি" পদের উৎপত্তি হইতে পারে। ইহা বাঙ্গালা এবং মৈথিলী এই উভয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

বৈদিক এব হইতে এবং, এববম্—এববহি—এবৈ হইয়া এবে (চা, ৮৫৬—৭

১। পালিপ্রকাশ, প্রবেশক, ৫৩-৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহারই স্বরের তরলতা সম্পাদনে অব রূপের উদ্ভব হইয়াছে।[১] অতএব মৈথিলীর প্রভাবাধীন না হইয়াও কেবল শব্দের মধুরতা সম্পাদনের জন্য অব রূপ ব্যবহৃত হইতে পারে।

তুহুঁঃ—কাহারও মতে ত্বকম্ হইতে শৌরসেনী অপভ্রংশ তুহুঁ হইয়াছে। মতান্তরে ত্বম্ হইতে তুম্ হইয়া তুঁ+বিশিষ্টার্থক হু—তুহুঁ (চা, ৮১৯ পৃঃ)। মতান্তরে প্রাকৃতের ষষ্ঠীর বহুবচনের তুম্হাণং হইতে মাগধী অপভ্রংশে তোহ্—তুহঁ (চা, ৮১৮ পৃঃ)। ইহার সহিত অপভ্রংশের উকার যুক্ত হইয়াও তুহুঁ হইতে পারে, অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের প্রভাবে তুহুঁ। এই সকল শব্দ ভাষার মধুরতা সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র, অতএব ইহাদের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে এইরূপই বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইবে।

অবশিষ্ট পহিলহি, সো, ঠাম, ঐছন প্রভৃতি শব্দ প্রাকৃত প্রভাবজাত। মৈথিলী-প্রভাব রামানন্দের উপর সুদূর গোদাবরী তীরে সংক্রামিত হইয়াছিল, এই ধারণা অপেক্ষা তিনি স্বীয় প্রাকৃতজ্ঞান-প্রভাবে শব্দ চয়ন করিয়াছেন, এই মতই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

যশোরাজ খানের পদ[২]

এই কবির নিম্নোদ্ধৃত পদটিকে বঙ্গদেশে রচিত ব্রজবুলির আদি নিদর্শন রূপে প্রচারিত করা হইয়াছে—

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত
আরে সহজই গোর[১]।
হিম-ধরাধর কনক ভূধর
কোলে মিলল জোর॥
মাধব, তুয়া দরশন-কাজে।

১। The form abe, ab would seem to be merely a weakening of ebai, ebe. (চা, ৮৫৭ পৃঃ)।

২। ব্রজবুলির ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত।

আধ পদচারি করত[১] সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে ॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে[৩]
চাঁদ[৪] পূজল কাম[৪] ॥
শ্রীযুত হুসন জগত-ভূষণ
সোই[৫] ইহ[৬] রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর
ভণে যশোরাজ-খান ॥

কিন্তু এই পদের পাঠান্তর রহিয়াছে, যথা—

১। গৌর ২। করিঞা ৩। দুই চাঁদ

৪-৪। পূজল কোটি কাম; ০ কত কোটি কাম ৫। সোহ ৬। এ

এই পদের মধ্যে দেহলী শব্দটি তৎসম (তু০—"দেহলী-দত্ত পুষ্পৈঃ"—মেঘদূত)। মিলল, পূজল, রহল পদত্রয়ের রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, এই জাতীয় প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও লক্ষিত হয়। গোর স্থানে গৌর, করত স্থানে করিঞা, যুগলে স্থানে দুই চাঁদ, এবং ইহ স্থানে এ পাঠান্তরে পাওয়া যায়। মূল রচনা পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে কিনা তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। "শ্রীযুত হুসন" নিশ্চয়ই মধুরতার জন্য লিখিত হইয়াছে। এখানে মৈথিলী প্রভাবের কল্পনা বৃথা। "খান"এর সহিত মিলাইবার জন্য "জান" লিখিত হইয়াছে। ইহাও মৈথিলী প্রভাবের সাক্ষ্য প্রদান করে না। আর, আধ, ডাহিন, বাম প্রভৃতি প্রাকৃতজ শব্দগুলি মৈথিলী ও বাঙ্গালাতে সমভাবেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সং—তব হইতে তুব, তুহ প্রাকৃত রূপ। তাহা হইতে বিশিষ্টার্থক আ যোগে তুআ মৈথিলী—প্রভাব ব্যতীতও সৃষ্ট হইতে পারে। পড়ুয়াদের নিকট মৈথিলী গান শুনিয়া বাঙ্গালার কবিগণ এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা কল্পনা করা

অপেক্ষা কবি নিজের রসবোধ হইতেও ইহার সৃষ্টি করিতে পারেন, এই ধারণাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

আসামের ব্রজবুলি

শঙ্করদেব "রুক্মিণীহরণ-নাট" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহা "বিন্দু রন্ধ্র বেদ চন্দ্র" শকে অর্থাৎ ১৪০০ শক বা ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, মতান্তরে ১৫৩১।২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ইহার গীত এবং পাত্রপাত্রীর কথোপকথন প্রভৃতি সমস্তই এই কৃত্রিম ভাষায় রচিত হইয়াছে। তথাপি রামানন্দ রায় ও যশোরাজ খানের উদ্ধৃত পদদ্বয়ের সহিত ইহার ভাষাগত বিভিন্নতা রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

বসতি দিগন্তর নাথ হামারু।
ভেণ্ট কেমনে হোই স্বামী মুরারু॥
হামু কিঙ্করী হরি নাথ হামার।
কহ শঙ্কর রুক্মিণীক ব্যবহার॥ ১৫ পৃঃ

অন্যত্র—

যোহি ভয়ো অবতার।
হরলি ভূমিকু ভার॥ ২ পৃঃ
ইতি জ্ঞাত্বা সবে সাবধানে থাক। ৫ পৃঃ
তোহো সম পুরুষ কতিহুঁ নাহি পাই। ৯ পৃঃ
মূর্চ্ছিত হয়া তৎকালে পরল। ১৯ পৃঃ
তোহো হামাক বিবাহ করিতে আবল। ২২ পৃঃ
তব পদ-পঙ্কজ জীবন আগবাস। ২৫ পৃঃ
তুহু যব জীবন বালা ছোড়হ
হঞু তব তুয়া বধ ভাগী। ৩০ পৃঃ
পরম পুরুষ পিউ ভেলি মুরারু। ১৬ পৃঃ

এই ভাষা যে কবির নিজের সৃষ্ট তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রথমতঃ "হামারু" ও "মুরারু" পদদ্বয় দ্রষ্টব্য। এই উকার অপভ্রংশের প্রভাবে আসিয়াছে। মৈথিলীতে এইরূপ পাওয়া যায় না। তারপর "হাম" স্থানে "হামু"। ইহাও অপভ্রংশের প্রভাবে গঠিত। মৈথিলীতে, এবং রামানন্দের পদেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। অথচ "ব্যবহার" এর সহিত মিল রাখার জন্য "হামার" পদও প্রযুক্ত হইয়াছে। রামানন্দের "পুরুখ" স্থলে এখানে "পুরুষ" পাওয়া যাইতেছে। সংস্কৃত "ভূত্বা" স্থানে "ভয়ো" এবং "হয়া" এই উভয় রূপই পাওয়া যায়। আবার "জ্ঞাত্বা" পদও অপরিবর্ত্তিত রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। "তব" এবং "তুয়া" উভয়ই পাওয়া যাইতেছে। সেইরূপ "তোহো" এবং "তুহু" ইত্যাদি। ক্রিয়া পদে "হরলি", "আবল", "পরল" ব্যবহৃত রহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কোন সুপ্রচলিত আদর্শ অনুসরণ করেন নাই। বঙ্গদেশে ব্রজবুলির উৎপত্তি হইয়া তাহা উড়িষ্যা ও আসামে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে সর্ব্বত্রই একই আদর্শ অনুসৃত হইত। এই সকল পদ রচিত হইবার পূর্ব্বে বিদ্যাপতি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকিবেন, এবং তাহার পদও হয়ত অন্যত্র প্রচারিত হইয়া থাকিবে। তাহা হইলেও আমরা একটা সুগঠিত আদর্শের আশা করিতে পারি, কিন্তু শঙ্করদেবের রচনায় ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি যে স্বাধীনভাবে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বুঝা যাইতেছে। সম্ভবতঃ ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহার নাটক রচিত হইয়াছিল, নতুবা ১৫৩১।২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলে তাঁহার শব্দচয়নে এত অসাদৃশ্য লক্ষিত হইত না। যাহাই হউক, তিনি যে নিজ প্রতিভার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আসামী ব্রজবুলির আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কেবল কবিতা নহে, গদ্যও রচিত হইয়াছে, যথা—

"হে প্রাণ সখি, সে পাপী শিশুপাল তোহাক নাহি পাবে, কি নিমিত্ত আকুল ভেলি, সে ভকত-বান্ধব মাধব তোহাক অবশ্যে রক্ষা করব।"

আসামী "সি"র পরিবর্ত্তে এখানে "সে" ব্যবহৃত হইয়াছে, আবার বাঙ্গালা

"করিবে" স্থানে "করব" আসামে যাইয়া স্থান লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ কি? রুক্মিণীহরণ-নাট একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা, সর্ব্বসাধারণের নিকট অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। এইজন্য সকলের বোধগম্য সহজ ও মধুর ভাষায় ইহা রচিত হইয়াছে। এখানে ভাষা আসিয়াছে উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক রূপে। প্রাচীন গাথা, এবং ফকিররামের অঙ্গদরায়বারের ভাষাও এইজন্যই বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মৈথিলী, বাঙ্গালা, আসামী ও উড়িয়া একই গোষ্ঠীভুক্ত ভাষার বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি মাত্র। অতএব তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই কারণেই কবিগণ মিশ্র ভাষা সৃষ্টিতে রসবোধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শব্দ চয়ন করিয়াছেন। ব্রজবুলির উৎপত্তি এইভাবেই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নতুবা মুষ্টিমেয় পড়ুয়াদের নিকট গান শুনিয়া সারা বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও আসামের কবিগণ ব্রজবুলিতে পদ-রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, ইহা ধারণা করা যাইতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—২৬ সং চর্য্যায় "বোলথি শাস্থি" পাওয়া যায়। উড়িয়া ভাষায় "করিথিলা, যাইথিলা" প্রভৃতি পদ সুপ্রচলিত। রুক্মিণীহরণ নাটকে—"কন্যাক সদৃশ বর কোন থানে থিক" (ঐ, ১৫ পৃঃ)। আবার বিদ্যাপতির পদাবলীতে—"কেলি করথি মধুপানে" (১৭ সং পদ), এবং অবহট্ট ভাষায় রচিত কীর্ত্তিলতায়—"সবে কিচ্ছু কিনইতে পাবথি" (ঐ, ১২ পৃঃ) পাওয়া যায়। এই একই রূপ উড়িষ্যা, বঙ্গ, মিথিলা ও আসামে পাওয়া যাইতেছে। কে কাহার নিকট হইতে ধার করিয়াছেন? ইহা সমাধানের জন্য প্রাচীন কোন মূলরূপের সন্ধান করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ এই আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছিল। সকলেই তাহা হইতে যে শব্দ চয়ন করিয়াছেন, শঙ্করদেবের রচনায় তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রজবুলি বঙ্গদেশে সৃষ্টি হইয়াছিল, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে বিদ্যাপতির পদ মৈথিলী ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, কিন্তু কবি নিজেই এই কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন কিনা ইহাও বিচার্য্য বিষয়, কারণ কীর্ত্তিলতায় তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"দেসিলবঅনা সবজন মিঠ্‌ঠা। তেঁ তৈসন জম্পঞো অবহট্‌ঠা॥

এই উক্তিটিই ব্রজবুলির উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মধুরতার জন্য এই কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রজবুলিতে যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম, এবং বিভক্তিগুলিও প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ব্যঞ্জনবর্ণের লোপে অধিকাংশ স্থলেই স্বরবর্ণ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবে ভাষার কোমলতা সাধন করা হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী ভাবমুখর রচনা, এবং ইহা গান করা হইত। এই উভয় উদ্দেশ্য সাধন করার পক্ষে এই কৃত্রিম ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়া থাকিবে। বিদ্যাপতি অনেক পদের প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই "প্রথম," "প্রথমহি" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আবার তিনিই যে ইহার পরিবর্ত্তে "পহিলহি" লিখিয়াছেন তাহা মধুরতা সম্পাদনের জন্য নহে কি? এইভাবে কঠোরতা কোমলতায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব ব্রজবুলির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় ধারণা করিবার জন্য মৈথিলী ও বাঙ্গালার সংমিশ্রণের পরিকল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। সম্প্রতি প্রতাপরুদ্রের পিতার রচিত ব্রজবুলির পদেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১] তাহা হইলে তিনি যশোরাজ খানেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। অতএব ব্রজবুলির আদি কবি দুইজনই উড়িষ্যার লোক হইতেছেন। এই অবস্থায় এই কৃত্রিম ভাষার উৎপত্তি বঙ্গদেশে হইয়াছিল, ইহা সমর্থন করা যায় না।

ব্রজবুলির উৎপত্তি-সম্বন্ধে আর একটি কারণও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা মূর্ত্তিপূজক, কিন্তু মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের বিধি এই যে, বর্ণে ও আকৃতিতে ইহা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বিশিষ্টতাসম্পন্ন হইবে। সংস্কৃত দেবভাষা বলিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, অতএব দেবতার লীলা-বর্ণনায় সংস্কৃত ব্যবহৃত হইতে পারে। যদি তাহা না করা হয়, তাহা হইলে মূর্ত্তি-গঠনের বিধির অনুকরণে সাধারণ কথ্য ভাষা ব্যবহার না করিয়া বিশিষ্টতাসম্পন্ন এক কৃত্রিম ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ব্রজলীলা মাধুর্য্যময় বলিয়া এই কৃত্রিম ভাষার নামকরণ হইয়াছিল ব্রজবুলি, অর্থাৎ মধুর ভাষা। ব্রজভাষার সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই।

১। The Seeker, April, 1945, pp. 6-8.

বিদ্যাপতির পদাবলী

বিদ্যাপতির রাধা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য্য ঢল ঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয়, এবং চারিদিকে একটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি।" "বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভাল করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য, সতৃষ্ণ, লীলাময়ী; নিকটে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে। আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে, তাই লজ্জায়, ভয়ে, আনন্দে, সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীর চঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীততরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।"

আবার চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির তুলনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—'বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য, চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক। এইজন্য ছন্দ, সঙ্গীত এবং বিচিত্ররঙ্গে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্য্যসুখ-সম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা। ইহা কেবল যৌবনের প্রথম আরম্ভের আনন্দোচ্ছ্বাস। চণ্ডীদাসের যেমন—

নয়ন-চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি হয়।

বিদ্যাপতিতে সেরূপ উতরোল ভাব নয়—কতকটা উতরোল বটে। কেবল আপনাকে আধখানা প্রকাশ, এবং আধখানা গোপন; কেবল হঠাৎ উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে। তথাপি

বিদ্যাপতি একটি শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে শেষ কথা বলা যাইতে পারে, অশেষ কথাও বলা যাইতে পারে। এত লীলাখেলা নব নব রসোল্লাসের পরিণাম কথা এই যে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ল না গেল॥

নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া গেল। ইহার পরে ছন্দ এবং রাগিণী পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। চিরনবীন প্রেমের ভূমিকা সমাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাস আসিয়া চির পুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ যে চণ্ডীদাসের উল্লেখ করিয়া এই তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন, তিনি প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস নহেন। তথাপি তিনি এই মহাসত্যের সন্ধান দিয়াছেন যে, বিদ্যাপতির পরে চণ্ডীদাস আসিয়া "চির পুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়াছিলেন।" শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত যাঁহাদের অণুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বড়ু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। রাধার পরিকল্পনায় বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস যে একই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা পরবর্ত্তী আলোচনায় ব্যাখ্যাত হইবে, কিন্তু বিদ্যাপতির পরে চণ্ডীদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার হেতু কি ইহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। আর বিদ্যাপতির কবিতা পড়িতে পড়িতে সমীর-চঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগই তাঁহার মনে পড়িয়াছে কেন? তিনি কবিতার অভিব্যক্তি দেখিয়াই বিচার করিয়াছিলেন, অতএব এইরূপ অভিব্যক্তির কারণ কি তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হওয়া উচিত।

বিদ্যাপতির সময়ে উজ্জ্বলনীলমণি রচিত হয় নাই, অতএব এই গ্রন্থের প্রভাব যে তাঁহার উপরে পতিত হয় নাই তাহা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু

সকল রসশাস্ত্রেই ত্রিবিধ নায়িকার উল্লেখ রহিয়াছে। নায়িকাগণের বয়স, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিচারে ইহারা যথাক্রমে মুগ্ধা, মধ্যা, এবং প্রগল্‌ভা বা প্রৌঢ়া। তন্মধ্যে মুগ্ধা—"নববয়ঃকামা রতৌ বামা মৃদুঃ ক্রোধি।"

অন্যত্র—

অভিনববিকশিতযৌবন-মদনবিকারা মৃদুর্মানে।

বার্ত্তায়ামপি সুরতেঃ পরাঙ্মুখী সত্রপা মুগ্ধা॥

অর্থাৎ—যাহার যৌবন অভিনববিকশিত, মদনবিকার অভিনব সমুদিত, লজ্জা যাহার প্রিয়সখী, সুরতসম্বন্ধীয় কথোপকথনেও যে পরাঙ্মুখী, মানগ্রহণে যে মৃদু, তাদৃশ নায়িকা মুগ্ধা বলিয়া কথিত হয়।

তন্মধ্যে অভিনবযৌবনার উদাহরণ, যথা—

নয়নযুগল চরণযুগলের চঞ্চলতা হরণ করে, স্তন ও নিতম্বদেশ মধ্যভাগের গুরুত্ব গ্রহণ করে, বাক্যবিন্যাসভঙ্গী বুদ্ধিমান্দ্যের ন্যায় লজ্জামান্দ্যকেও আক্রমণ করে, ফলতঃ দেহরাজ্যে শৈশবের অধিকার স্খলিত হওয়ায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল যেন লুণ্ঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

এইরূপ বিবিধ অবস্থার বর্ণনা রসশাস্ত্রে পাওয়া যায়। রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে আবার মুগ্ধা দ্বিবিধা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—জ্ঞাতযৌবনা ও অজ্ঞাতযৌবনা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রথমভাগে এই অজ্ঞাতযৌবনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

মধ্যা নায়িকা সুললিত-সুরতা (মোহান্তসুরতক্ষমা), মধ্যমরূপ সমুদিত-যৌবনা, অনধিকলজ্জাবতী, ঈষৎ প্রাগল্‌ভা এবং গূঢ় বৈদগ্ধা হইয়া থাকে।

প্রগল্‌ভা নায়িকা তরুণী, যৌবনান্ধা, মদনোন্মত্তা, রতিকুশলা, এবং "বিলীয়মানেবানন্দাৎ রতারম্ভেঽপ্যচেতনা" হইয়া থাকে।

ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা এই ত্রিবিধ ভেদবশতঃ মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ষড়বিধ। আবার কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ রূপত্ব হেতু ইহারা দ্বাদশবিধ। ইহার সহিত মুগ্ধা নায়িকা যোগ করিলে হয় ত্রয়োদশ ভেদ। পরোঢ়াও অলৌকিকস্থলে নায়িকামধ্যে গণনীয় হওয়ায় তাহারও ঐরূপ ত্রয়োদশ ভেদ লইয়া ষড়বিংশতি ভেদ গণনা

করা হয়। উহাদের প্রত্যেকের আবার অভিসারিকা বাসকসজ্জাদি অষ্টবিধ অবস্থাভেদে নায়িকা দুইশত অষ্টবিধ। (দশরূপ, সাহিত্যদর্পণ, অলঙ্কার-কৌস্তুভ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইল)। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস রসশাস্ত্রের এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া রাধার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির পদে প্রথমেই মুগ্ধার অন্তর্গত জ্ঞাতযৌবনার বর্ণনা পাওয়া যায়—

মুকুর লই অব করত শিঙ্গার।
সখি পুছই কৈসে সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হসইত আপন পয়োধর হেরি॥

(নগেন্দ্র বাবুর সং, পৃঃ ২)।

অন্যত্র—

অব সব খন রহু আঁচরে হাত।
লাজে সখিগণে ন পুছয় বাত॥
শুনইতে রসকথা থাপয় চীত।
যইসে কুরঙ্গিনি শুনএ সঙ্গীত॥

(ঐ, ৪ পৃঃ)

অন্যত্র—

চউকি চলয়ে খনে খন চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়-মুকুলি হেরি হেরি থোর।
খনে আচর দেই খনে হোয় ভোর॥

(ঐ, ৬ পৃঃ)

অন্যত্র—

কেলিক রভস যব শুনে আনে।
অনতএ হেরি ততহি দএ কানে।

ইথে যদি কেও করএ পরচারী।
কাঁদন মাখী হসি দএ গারী॥

(ঐ, ৭ পৃঃ)।

যৌবন-সমাগমের ধারণা রাধার জন্মিয়াছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, ইহা দেখিয়া রাধা নিজেই মুগ্ধ হন, এবং গোপন করিতে চেষ্টা করেন। রসের কথা শুনিতে ভালবাসেন, আবার কেহ কিছু বলিলে ছল করিয়া গালি দেন। মন্মথের পাঠের প্রথম শিক্ষা তাহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। স্নান করিবার সময়ে রাধার সহিত কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইয়াছে। কৃষ্ণকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য রাধা ছল করিয়া মুক্তার মালা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সকলে যখন মুক্তা কুড়াইতে ব্যস্ত, তখন তিনি কৃষ্ণকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। রাধার এই কৌশল তাহার হৃদয়ে মন্মথের আধিপত্যের কথাই ঘোষণা করে।

সখি হে অপরুব চাতুরি গোরি।
সব জন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড়বদন তঁহি ফেরি॥
তঁহি পুন মোতিহার টুটি ফেকল
কহইত হার টুটি গেল।
সবজন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি লেল॥

(ঐ, ২৫ পৃঃ)

এখন নিজের যৌবন সম্বন্ধে রাধা সম্পূর্ণই সজাগ, এবং তাহার কার্যাও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতি এইভাবে জ্ঞাতযৌবনার চিত্র অঙ্কিত করিয়া পদাবলী আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাই লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির রাধা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের প্রথমাংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইহার পরে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে বিদ্যাপতির রচনা-রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যাপতির পদাবলী প্রধানতঃ সংগ্রহ-গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। সুদূর নেপালেও কিছু কিছু পদের সন্ধান

পাওয়া গিয়াছে। কবি আখ্যায়িকা-মূলক পালা গানের আকারে পদরচনা করেন নাই। এইজন্য পদগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা কষ্টকর। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে নগেন্দ্র বাবু যে পদাবলী সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিষয়-বিভাগে পদগুলি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, কবি বিচ্ছিন্নভাবেই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। একই বিষয়ের পুনরুক্তি এবং বিবিধ অস্বাভাবিক অবস্থার বর্ণনায় রসবোধের ব্যাঘাত জন্মে। যাহাই হউক, এই বিচ্ছিন্ন পদগুলিকে নিম্নলিখিত প্রকারে শৃঙ্খলিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে—প্রথমতঃ রাধার বয়ঃসন্ধি, তৎপর মাধবের পূর্ব্বরাগ, রাধিকার পূর্ব্বরাগ, মাধবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া রাধার নিকট সখীর উক্তি, রাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়া মাধবের নিকট সখীর উক্তি। এখানে গীতগোবিন্দের প্রভাব লক্ষিত হয়। তৎপর মিলনের পরামর্শ, অবশেষে মিলন। ইহাই প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ। এই মিলনেই মুগ্ধাবস্থার পরিসমাপ্তি। মিলনের পূর্ব্বে সখীগণের উপদেশে রাধা বলিতেছেন—

তোহর বচনে যব করব পিরীতি।
হম শিশুমতি অতি অপযশভীতি॥
ন জানিয় প্রেম-রস নহি রতি রঙ্গ। ইত্যাদি।
(ঐ, ৮৬ পৃঃ)

আবার মিলনের সময়েও রাধা বলিতেছেন—

তুহু রস আগর নাগর ঢীঠ।
হম ন বুঝিয় রস তীত কি মীঠ॥
(ঐ, ১০২ পৃঃ)

জ্ঞাতযৌবনা রাধার মনে অভিলাষের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু প্রেমলীলায় তিনি অনভিজ্ঞা। মিলনের অভিজ্ঞতায় তাঁহার মুগ্ধা দশার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইহার উপসংহারে সখার নিকট কৃষ্ণের, এবং সখীর নিকট রাধার উক্তিতে কবি ইহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পরে অভিসার হইতে রাধার মধ্যা দশার আরম্ভ। এখন মিলনে

প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাঁহার ভীতি চলিয়া গিয়াছে, তিনি নিজেই অভিসার-যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। দিনে, রাত্রিতে, জ্যোৎস্নায় ও তমসায়, বর্ষার দুর্য্যোগে অভিসারের বিরাম নাই। রাধা এখন অপেক্ষাকৃত চতুরা, গুরুজনের অজ্ঞাতে নানা কৌশলে ঘরের বাহির হইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেছেন। অতএব প্রেমের ভয় তাঁহার কাটিয়া গেলেও, সমাজ ও গুরুজনের ভীতি তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় মানের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সখীগণের নিকট মানের শিক্ষা লাভ করিয়া রাধা মানবতী হইয়াছেন। কৃষ্ণ আসিয়া সাধিতেছেন, রাধা তাঁহার দোষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। এই অবস্থায় কবি মধ্যার অন্তর্গত ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা, খণ্ডিতা, বাসকসজ্জিকা প্রভৃতি বিবিধ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিরহ ও ভাবসম্মিলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাধার এই মধ্যাবস্থার বর্ণনাই চলিয়াছে।

বিরহাবস্থা হইতে রাধার প্রগল্ভা দশার বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। বিরহের সম্ভাবনাতেই রাধা ব্যাকুলা হইয়া পড়িয়াছেন। রাধা বলিতেছেন—

জকর পরশ-বিসলেষ জর আগি।
হৃদয়ক মৃগমদ শোভ নহি লাগি॥
সে জদি দূরহি করতহি বাস।
হা হরি সুনতহি লাগ তরাস॥

(৬২২ সং পদ)

যাহার স্পর্শ-বিচ্যুত হইলে হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিয়া যায়, বক্ষে মৃগমদ লেপনও শোভা পায় না, সে বিদেশে যাইবে শুনিলেই ত্রাস উপস্থিত হয়। অতএব—

নিজ করে ধরি দুহুঁ কানুক হাত।
যতনে ধরল ধনী আপন মাথ॥

(৬২১ সং পদ)

এবং বলিলেন—

হীরা মণি মাণিক একো নহি মাগব
ফেরি মাগব পহু তোরা ॥

(৬২০ সং পদ)

আমি মাণিক্য চাইনা, তোমাকেই চাই। তথাপি কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণের অদর্শনে রাধার—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী ॥

(৬২১ সং পদ)

তখন রাধা বলিতেছেন—

সঙ্গ জইতঁও যোগিনী বেশ।
হৃদয় বড় দারুণ রে পিয়া বিনু বিহরি ন যায়॥

(৬২৬ সং পদ)

আগে জানিতে পারিলে আমি তাঁহার সহিত যোগিনী হইয়া চলিয়া যাইতাম। আমার হৃদয় বড় কঠিন, প্রিয়-বিরহে বিদীর্ণ হইতেছে না। এখন—

জীবন লাগ মরণ সম
মরণ সোহাবন রে।

(৬৩৫ সং পদ)

জীবন মৃত্যু-তুল্য মনে হয়, আর মরণ সুন্দর বোধ হয়।

তিলা এক লাগি রহল অছ জীবে।
বিনু সিনেহে বরই জনি দীবে ॥

(৬৩৮ সং পদ)

তৈলশূন্য প্রদীপের ন্যায় আমার জীবন এক তিল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। 'কৃষ্ণই যদি আমাকে পরিত্যাগ করিল, তাহা হইলে আমার বেশভূষার কোনই প্রয়োজন নাই—

শঙ্খ কর চূর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা-সলিলে সব ডার রে॥
(৬৫৭ সং পদ)

কৃষ্ণ-বিহনে এখন আমার চক্ষেও নিদ্রা নাই, মুখেও হাসি নাই। সুখ তাহার সহিত চলিয়া গিয়াছে, আর আমি দুঃখ-সাগরে পড়িয়া রহিয়াছি—

নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মোর পাস॥
(৬৭৩ সং পদ)

প্রগল্‌ভা দশায় কবি এইরূপে রাধাকে কৃষ্ণপ্রেমময়ী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। এখানে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের মহাভাবস্বরূপিণী রাধার মূর্ত্তিই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। অতএব বিদ্যাপতির পদাবলীর পরিসমাপ্তিতে আমরা রাধার যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি, চৈতন্যদেব ইহারই জীবন্ত বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাস ইহাই আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া পদ-রচনা করিয়াছেন। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতির পরে চণ্ডীদাস আসিয়া চির পুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রধানতঃ কবির পাণ্ডিত্য ও চাতুর্য্যেরই সন্ধান পাওয়া যায়। পদগুলি সাধারণতঃ চিত্রধর্ম্মী। রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
মদনক ভাব পহিল পরচার।
ভিন জনে দেল ভিন অধিকার॥
কটিক গৌরব পাঅল নিতম্ব।
একক খীন অওকে অবলম্ব॥

প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তহ্নিক লেল ॥
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব ॥
নব কবিশেখর কি কহইত পার।
ভিন ভিন রাজ ভিন ব্যবহার ॥

বিভিন্ন রসশাস্ত্রে-উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বনে এই সকল পদ রচিত হইয়াছে, যথা—

শ্রোণীবন্ধস্ত্যজতি তনুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ।
পদ্‌ভ্যাং মুক্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাম্‌।
বক্ষঃ-প্রাপ্তঃ-কুচ সচিবতামদ্বিতীয়ন্তু বক্ত্রং
তদ্‌গাত্রাণাং গুণবিনিময়ঃ কল্পিতো যৌবনেন ॥

(কাব্যপ্রকাশ)

অথবা—

মধ্যস্য প্রথিতমানমেতি জঘনং বক্ষোজয়োর্মন্দতাং
দূরং যাত্যুদরঞ্চ রোমলতিকা নেত্রার্জবং ধাবতি।
কন্দর্পং পরিবীক্ষ্য নূতন মনোরাজ্যাভিষিক্তং ক্ষণা—
দঙ্গানীব পরস্পরং বিদধতে নির্লুণ্ঠনং সুভ্রুবঃ ॥

(সাহিত্যদর্পণ)

এই জাতীয় শ্লোক প্রায় প্রত্যেক অলঙ্কার শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি তাহা হইতে ভাব আহরণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার মৌলিকত্ব না থাকিলেও প্রকাশভঙ্গীর কৃতিত্ব অনুপম। সংস্কৃত কাব্য-ভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরিত করিয়া তিনি বিবিধ উপমা-অলঙ্কারে ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন। আবার একই পদে উদ্ভিন্ন যৌবনা রাধার স্তনের সহিত প্রথমতঃ বদরি, পরে নবরঙ্গ এবং বেল, অবশেষে সোনার মহেশ্বর উপমিত হইয়াছে। ইহাও যে সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে লুণ্ঠিত সম্পদ্‌ মাত্র, তাহারও নির্দ্দেশ নগেন্দ্রবাবু প্রদান করিয়াছেন, যথা—

উদ্ভেদং প্রতিপদ্য পক্ক বদরীভাবং সমেত্য ক্রমাৎ
পুন্নাগাকৃতিমাপ্য পূগপদবীমারুহ্য বিল্বশ্রিয়ম্।
লব্ধা তালফলোপমাং চ ললিতামাসাদ্য ভূয়োঽধুনা
চঞ্চৎকাঞ্চনকুম্ভ-জৃম্ভণমিমাবস্থাঃ স্তনৌ বিভ্রতঃ॥

(পদ সং ৮)

এখানে কাঞ্চন কুম্ভ সোনার মহেশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনারও মূল নির্দ্দেশিত হইতে পারে, যথা—

কমলমুখি ভবত্যাশ্চারু বক্ষোজশম্ভু
ননু পরমরসাঢ্যৌ নির্ম্মিতৌ কেন ধাত্রা।
অহমপিতু ন কামী কিন্তু কান্তে তপস্বী
নিজকরকমলাভ্যাং শম্ভুপূজাং করোমি॥

বর্ণসাদৃশ্যে কনক। আবার এই শম্ভু-সদৃশ স্তনকে চন্দ্রচূড় করিবার ধারণার জন্যও কবি পূর্ব্বসূরিগণের নিকট ঋণী, যথা—

"অর্দ্ধচন্দ্রাভনখাঙ্কচুম্বি কুচৌ"—নৈষধ, ৬।৬৬

আর একটি পদে আছে—

খনে খন নয়ন কোন অনুসরই।
খনে খন বসনধূলী তনু ভরই॥
চউকি চলয়ে খনে খন চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥

(পদ সং ৯)

তুলনীয়—

ক্ষণং সরলবীক্ষণং ক্ষণমপাঙ্গ সংবীক্ষণং
ক্ষণং রজসিলেখনং ক্ষণমতীব ভূষাদরঃ।
ক্ষণং দ্রুততরা গতিঃ ক্ষণমতীব মন্দগতিঃ
ক্ষণ ক্ষণ বিলক্ষণং জয়তি চেষ্টিতং সুভ্রুবঃ॥

(ঐ, টীকা)

অন্যত্র—

লোচন যুগল ভৃঙ্গ অকারে।
মধুক মাতল উড়এ ন পারে॥

(পদ সং—১২)

তুলনীয়—

"দৃশৌ তব মদালসে"—গীতগোবিন্দ, ১০।১৫

এবং— "পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ"—ভট্টি, ২।৫

অন্যত্র—

উর হার ন চীর চন্দন দেলা।
সে অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥

(পদ সং—৬৭৬)

তুলনীয়—

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিচ্ছেদভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ॥

(মহানাটক, ঐ টীকা)

বিদ্যাপতির—"অনুখণ মাধব মাধব সুমরইত সুন্দরি ভেলি মধাই" ইত্যাদি পদটিতে গীতগোবিন্দের—

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুমহমিতি ভাবনশীলা॥ (ঐ, ৬।৫)

শ্লোকের প্রভাব লক্ষিত হয়। ভাগবতেও বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাস হইতে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন।

এই সকল ধার করা জিনিষের সমবায়ে বিদ্যাপতির রচনা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে! ইহারই উল্লেখ করিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"সংস্কৃত অলঙ্কারে যত কিছু কবিপ্রৌঢ়োক্তি আছে, যত চলিত উপমা আছে, বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁহার গানগুলিতে সে গুলির প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। হালাসপ্তশতী, আর্য্যাসপ্তশতী, অমরুশতক, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গার-শতক,

শৃঙ্গারাষ্টক প্রভৃতি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত আদিরসের কবিতাগুচ্ছ হইতে বিদ্যাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন।” (কীর্ত্তিলতার ভূমিকা, ২৷৷০ পৃঃ)।

যৌবন দেহে প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু মদনের অধিকার মনোরাজ্যে। বসন্তের আগমনে কোকিলের আবির্ভাবের ন্যায় যৌবন-সমাগমে মদনেরও শুভাগমন হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রথমাংশে অন্তর অপেক্ষা দেহের বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বিদ্যাপতি রাধার রূপ-বর্ণনায় আহরিত সম্পদের সাহায্যে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে “দেহের ভাগই বেশী, অন্তরের ভাগ কম।” একই কথার পুনরুক্তিতে ইহা যেন বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর পাণ্ডিত্যের ছাপ পড়াতে বক্তব্য বিষয়ের অস্পষ্টতা হেতু সহজে রসবোধের ব্যাঘাত জন্মে। যেমন রাধার রূপ বর্ণনায়—

সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ
সারঙ্গ তসু সমধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ
কেলি করথি মধুপানে॥

(পদ সং—১৭)

অথবা কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায়—

কমল যুগল পর চাঁদক মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেঢ়ল বিজুরি লতা।
কালিন্দি তীর ধীর চলি যাতা॥ ইত্যাদি।

(পদ সং—১৬)

একেত ভাষার সহিত আমরা অপরিচিত, তাহাতে আবার পাণ্ডিত্যের ব্যূহ ভেদ করিয়া যদি অর্থগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাতে সাধারণ পাঠক পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। তবে পণ্ডিতগণের পক্ষে ইহা উপভোগ্য বটে। একেত শব্দ-ঝঙ্কার কর্ণের পরিতৃপ্তি সাধন করে, তাহার উপর যমজ-অনুপ্রাস

প্রভৃতি অলঙ্কারে ভাষা-সুন্দরী যেভাবে সজ্জিতা হইয়াছেন, তাহাতে বিদগ্ধ জনের পক্ষে রসস্বাদনের প্রচুর উপকরণ সংগৃহীত রহিয়াছে। এই জাতীয় রচনায় কবির পাণ্ডিত্য ও চাতুর্য্যের পরিচয়ই বেশী পাওয়া যায়, কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের রূপের ধারণা আমাদের হৃদয়পটে উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠে না। তারপর পদের শীর্ষদেশে "সখীর উক্তি", "মাধবের উক্তি" প্রভৃতি লিখিয়া নগেন্দ্রবাবু পদ-পরিচয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলেই "সখীর উক্তি" স্থলে "মাধবের উক্তি", কিংবা "মাধবের উক্তি" স্থলে "কবির উক্তি" বসান যাইতে পারে। বিচ্ছিন্নভাবে পদগুলি রচিত হওয়াতে পদ-পরিচয়ের এই অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। অবশেষে পদগুলি পাঠ করিলে রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা সখীগণের কার্য্য-কারিতাই বেশী অনুভূত হয়। মদন নিজে চক্ষুহীন হইলেও নায়ক-নায়িকাকে পথ দেখাইয়া দেন। প্রেমের অঙ্কুর হয় তাহাদের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত, কিন্তু এখানে সখীগণ যেন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া অভিলাষ জাগরিত করিয়াছে। রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় একই কথার পুনরুক্তিতে মনে হয় যেন নিশ্চেষ্ট কৃষ্ণের হৃদয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চালনের চেষ্টা করা হইতেছে। "মাধবের দূতী" এবং "রাধার দূতী" বিভাগের পদগুলিও এই পর্য্যায়ভুক্ত। মিলনের পূর্ব্বে সখীগণ উপদেশ-প্রদানে উভয়কেই সজাগ করিয়া তুলিতেছে। আবার রাধা মান করিবেন। তাহারও শিক্ষা সখীর নিকটে লাভ করিতেছেন। বোধ হয় অত্যধিক সতর্কতার সহিত রসশাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করাতে কবি রাধাকে (এবং কৃষ্ণকেও) প্রথমতঃ মুগ্ধা বা অনভিজ্ঞা পর্যায়েই রাখিয়া দিয়াছেন। ইহাতে উভয়েরই অন্তরের আকুতি স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, মদন যেন কবির পাণ্ডিত্য ও চাতুর্য্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। একজন আধুনিক সমালোচক লিখিয়াছেন—"সম্ভোগের বর্ণনায় কবি সুরুচির পরিচয় দেন নাই—বয়ঃসন্ধি, পূর্ব্বরাগ ইত্যাদির বর্ণনায় আলঙ্কারিকতার কৃতিত্বই দেখাইয়াছেন—অভিমান, মান, মানভঞ্জন ইত্যাদিতে মাধুর্য্য অপেক্ষা চাতুর্য্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। রাধার রূপ বর্ণনার প্রত্যেক অঙ্গটি কবি সংস্কৃত কাব্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার রচিত উপমাহৃত রূপোচ্চয়কে অনেক স্থলে জীবন্ত

করিতে পারেন নাই—তাঁহার তিলোত্তমা জড় প্রতিমাই রহিয়া গিয়াছে। আবার সর্ব্বত্রই যে উৎকৃষ্ট কবিতা হইয়াছে তাহাও নয়, কিন্তু সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু মাধুরীর উপচয় হইয়াছে। অধিকাংশ পদে দেহ ছাড়িয়া কবির কল্পনা অতীন্দ্রিয়লোকে পৌঁছায় নাই—মর্ম্মের গভীর কূপেও প্রবেশ করে নাই। তথাপি বিদ্যাপতির তুলনা নাই। তাঁহার পদাবলী মধুচক্রের মত—ইহার কুহরে কুহরে মাধুর্য্য। কবি ভাষার ভাণ্ডারে, ভাবলোকে, বিশ্বপ্রকৃতিতে, ধ্বনিজগতে যেখানে যত মাধুর্য্য পাইয়াছেন, সমস্তই তাঁহার রচনায় চাতুর্য্যের বন্ধনীতে একত্র করিয়াছেন।" (কালিদাস রায় লিখিত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ৬-১০ পৃঃ)। অন্যত্র—"বিদ্যাপতির নিজস্ব কিন্তু সাজানর তারিফ। তাহাতে এমন একটা নূতনত্ব আছে, পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়। সে অতি সুন্দর। বিদ্যাপতি বহির্জগতেই হউক আর অন্তর্জগতেই হউক সুন্দর সুন্দর জিনিষ বাছিয়া লইয়া সাজাইবার সময় সেগুলিকে সুন্দরতর সুন্দরতম করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আদিরস সৌন্দর্য্যের খনি, আদিরসের মধ্যে কৃষ্ণরাধার প্রেম খুব বড় জিনিষ, তিনি তাঁহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক সময় কৃষ্ণ রাধা উপলক্ষ্য মাত্র, আদিরসই প্রধান লক্ষ্য।" (কীর্ত্তিলতার ভূমিকা, ১॥৶—২৸৶০ পৃঃ)।

রাধা-কৃষ্ণের রূপকে এই যে বিরাট পদাবলী রচিত হইয়াছে তাহাতে নরনারীর প্রাকৃত প্রেম-লীলার আদর্শেরই সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা প্রধানতঃ আদিরসাত্মক। যৌবন-সমাগমে উভয়েরই চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু রূপ, প্রেম ও আনন্দ নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ। রূপের অনুভূতি হইতে যুগপৎ প্রেম ও আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। তাই কবি রাধার রূপের বর্ণনায় কৃষ্ণকে মোহিত করিয়াছেন, আর কৃষ্ণের রূপেও রাধার হৃদয়ে আসঙ্গ-লিপ্সা জাগরিত হইয়াছে। এইরূপে সংঘটনের সূচনা করিয়া কবি পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মান-অভিমান ও মিলনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে নব প্রেমলীলার চঞ্চলতাই লক্ষিত হয়। ইহা হইতেই রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির সার্থকতা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু বিদ্যাপতির সকল রচনা সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে না। প্রারম্ভ যে

ভাবেই হইয়া থাকুক, বিরহ ও ভাবসম্মিলনে এই "নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া গিয়াছে।" ইহাতে প্রেমে বিলাস অপেক্ষা বেদনাই বেশী, এবং ইহার গভীরতায় অটল স্থৈর্য্যেরও সমাবেশ হইয়াছে। বিদ্যাপতি এই অবস্থায় আনিয়া রাধাকে উপস্থিত করিয়াছেন, এবং ইহাতেই তাঁহার পদাবলীর পরিসমাপ্তি। বড়ু চণ্ডীদাসও একই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনিও চঞ্চলা রাধাকে মহাভাব-স্বরূপিণী করিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। এইরূপে বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের মিলন হইয়াছে ভাবরাজ্যে। বোধ হয় ইহারই ভিত্তিতে পরবর্ত্তীকালে উভয়ের সাক্ষাৎকারের প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। দেশকাল বিচার করিয়া ইহার অসম্ভবতা প্রমাণিত করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না। যাহাই হউক, এই দুই কবি আবর্জ্জনা ঘাটিয়া রাধাভাবের যে চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের আগমনী গান গাহিয়াছেন এই দুই কবি, কারণ ইঁহাদেরই রাধার জীবন্ত বিগ্রহরূপে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করিতে ভালবাসিতেন। এখানে প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাসের পরিকল্পনাও করা যাইতে পারে না, কারণ এই দুই চণ্ডীদাসের মধ্যে "সরিৎসাগর-ভূধর" ব্যবধান রহিয়াছে। একজন চৈতন্যপূর্ব্ব ভাবধারার প্রবর্ত্তক, আর অপরে চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাষ্যকার। এই জন্যই উভয়ের রচনা বিভিন্ন যুগের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির কবিতায় ঐশ্বর্য্যভাবের স্ফুরণ হয় নাই, ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ তাঁহার কৃষ্ণ সর্ব্বত্রই মাধব। আর এই মাধব সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি ছিল, তাহাও তিনি প্রার্থনার পদে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মাধব জগৎ-তারণ, দীন-দয়াময়, ত্রিভুবন-নাথ, জগন্নাথ ইত্যাদি। কত চতুরাননের ধ্বংস হইতেছে, কিন্তু তিনি আদি-অন্তবিহীন। এই বিপুল সৃষ্টি তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগরের ন্যায় তাহাতেই বিলীন হইতেছে। অতএব বিদ্যাপতির মাধবের ধারণায় পূর্ণ ঐশ্বর্য্যভাব বিরাজিত রহিয়াছে। কিন্তু

তিনি সাধারণ নায়কনায়িকার প্রেমলীলার আদর্শে পদাবলী রচিত করিয়াছেন বলিয়া এই ঐশ্বর্য্যভাব প্রচ্ছন্নই রহিয়া গিয়াছে। এই জন্যই অনেক পদে তিনি রাধার পরিবর্ত্তে কামিনী, সুন্দরী, ধনী, নাগরী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ লীলার পরবর্ত্তী ধারণাও তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল, অতএব ঐশ্বর্য্যভাবের ধারণায় তিনি পদ-রচনা করেন নাই, ইহা বলা যাইতে পারে না, কারণ বিদ্যাপতি ঐশ্বর্য্যের যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ভগবানকে মানুষের পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়া যে আদিরসাত্মক লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ধারণাও যে বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা হইতে বৈষ্ণবগণ লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও বলা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতি কখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। এই পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে মহারাজ শিবসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন, এবং সেই বৎসরই তিনি বিদ্যাপতিকে বিসফী গ্রাম দানপত্র করিয়া প্রদান করেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে, সেই সময়ে শিবসিংহের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল, এবং বিদ্যাপতি নাকি তাঁহা অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলেন। এই হিসাবে বিদ্যাপতি ২৪১ লক্ষ্মণাব্দে অর্থাৎ প্রায় ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। কিন্তু পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় সেই সময়ে কবির বিশ বৎসর ধরিয়া ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাও সন্দেহের অতীত নহে, কারণ কবি রাজা ভৈরবসিংহের প্রীতির জন্য "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে (শ্রীভৈরবক্ষ্মাভুজো দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী কৃতিরিয়ং ইত্যাদি, ০তরু, ৫ম খণ্ড, ১৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ভৈরবসিংহ রাজা হন ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে, অতএব সতীশ বাবুর গণনায় সেই সময়ে বিদ্যাপতির বয়স হয় ১৩৩ বৎসর, এবং নগেন্দ্রবাবুর গণনায় ১৬৩ বৎসর। এত দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াও কবির গ্রন্থ-রচনার শক্তি ছিল, ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কীর্ত্তিলতারভূমিকায় বিদ্যাপতির বয়স সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

নগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"তাঁহার বইয়ের যত টীকাটিপ্পনী আছে, সব পড়িয়া আমার বোধ হইল বিদ্যাপতি অন্ততঃ একশত উনআশি বৎসর বাঁচিয়াছিলেন।" (ঐ, ১৷৷৶০ পৃঃ)। অতএব এই সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। যাহাই হউক, বিদ্যাপতি যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতির বংশ, পণ্ডিতের বংশ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা অসাধারণ পণ্ডিত, কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং কেহ কেহ প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাপতির অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ কর্ম্মাদিত্য ঠাকুরের নাম পঞ্জীতে এইরূপ পাওয়া যায়—গড়বিস্‌পী নিবাসী কর্ম্মাদিত্য ত্রিপাঠী। মিথিলায় তিলকেশ্বর নামক শিবমঠে কীর্ত্তিশিলায় কর্ম্মাদিত্য মন্ত্রীর নাম উৎকীর্ণ আছে। কাল—অব্দে নেত্রশশাঙ্কপক্ষ গদিতে শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতেঃ, অর্থাৎ ২১৩ ল সং। কর্ম্মাদিত্যের পুত্র সান্ধিবিগ্রহিক দেবাদিত্য। বিদ্যাপতির পিতামহের সম্পর্কে ভ্রাতা জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য। ইনি সংস্কৃতভাষায় পঞ্চশায়ক, ধূর্ত্তসমাগম প্রহসন, এবং মৈথিলীভাষায় বর্ণনরত্নাকর নামক প্রথম গদ্যগ্রন্থের রচয়িতা। প্রপিতামহের ভ্রাতা দশকর্ম্মপদ্ধতি-কর্ত্তা মহামহত্তক বীরেশ্বর ঠাকুর রাজমন্ত্রী ছিলেন। বীরেশ্বরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রহিক চণ্ডেশ্বর। ইনি সপ্তরত্নাকর, কৃত্যচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বীরেশ্বরের আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র রামদত্ত উপাধ্যায় কর্ম্মপদ্ধতিকর্ত্তা। বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থরচনা করেন। তিনি গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন।" (ভূমিকা, ।৶০—।৶১ পৃঃ)। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে। প্রথমতঃ লক্ষ্মণাব্দ মিথিলাতে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বঙ্গীয় সেনরাজগণের প্রভাব তখনও মিথিলা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণের (এবং তাঁহার নিজেরও—পরে দ্রষ্টব্য) রচিত গ্রন্থরাজি। লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, শৈবসর্ব্বস্ব, বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব, সংস্কার-পদ্ধতি, আহ্নিকপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থ

রচনা করিয়াছিলেন। কারণ সেই সময়ে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান-কালে ধর্ম্ম ও সমাজ-গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। মিথিলার পণ্ডিতগণও দেখা যাইতেছে যে, এই জাতীয় গ্রন্থই রচনা করিয়াছেন। ইহাতে যে বঙ্গদেশের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তৃতীয়তঃ বিদ্যাপতিকে "নব জয়দেব" আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছিল। ইহাতেও বঙ্গকবির প্রাধান্যই স্বীকৃত হইতেছে। অতএব বিদ্যাপতির সময়েও যে বঙ্গদেশের প্রভাব মিথিলায় পূর্ণভাবে বিরাজিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বিদ্যাপতির নিজের রচিত গ্রন্থগুলিও ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। তাঁহার গ্রন্থের পরিচয়-প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি শৈবসর্ব্বস্ব-সার (লক্ষ্মণ সেনের সময়ে রচিত শৈবসর্ব্বস্ব মনে করাইয়া দেয়) নামে একখানি স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহাতে স্মৃতির মতে শিব পূজার যত বিধান আছে, সব দেওয়া আছে। তিনি গঙ্গাবাক্যাবলী নামে আর একখানি স্মৃতির গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, উহাতে হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার কোন্ তীর্থে কোন্ তীর্থকৃত্য করিতে হয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। সেকালে নানারূপ দান চলিত ছিল। তাহার মধ্যে যোড়শ দান অতি প্রসিদ্ধ, তুলাপুরুষ দান সর্ব্ব-প্রধান। বিদ্যাপতি দানবাক্যাবলী নামে একখানি স্মৃতির গ্রন্থ লিখিয়া এই সকল দানের ইতি কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিয়া যান। (ইহা বল্লালের বিখ্যাত গ্রন্থ দান-সাগরের অনুকরণ মাত্র)। বার মাসের তের পার্ব্বণ সকলেই জানেন। তিনি এই তের পার্ব্বণের এক বই লিখেন, তাহার নাম বর্ষক্রিয়া। দায়-ভাগেরও তাঁহার এক বই আছে, নাম বিভাগসার। পুরাণেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি যখন শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের সঙ্গে নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় কোশল, মিথিলা, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান গ্রাম ও নগরগুলির একটি বিবরণ লিখিয়া যান। উহার নাম ভূ-পরিক্রমা। তাঁহার নিজের সময়ের ও তাহার আগেকার অনেক ঘটনা তিনি

তাঁহার পুরুষপরীক্ষায় লিখিয়া গিয়াছেন। উহাতে মামুদ গজনীর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতির সময় পর্য্যন্ত অনেক সত্য ঘটনা পাওয়া যায়। যাঁহারা পুরুষ, যাঁহাদের পুরুষের মত সদ্‌গুণ ছিল, তাঁহাদেরই গল্প পুরুষপরীক্ষায় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির আর একখানি অতি সুন্দর বই লিখনাবলী, অর্থাৎ পত্র লিখিবার ধারা। কাহাকে পত্র লিখিতে হইলে কিরূপ পাঠ দেওয়া দরকার, তাহা এই পুস্তকে খুব ভাল করিয়া দেওয়া আছে। তখন ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে দুর্গাপূজাটা খুব চলিয়া আসিতেছিল। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি দুর্গোৎসববিবেক নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দুর্গাপূজার আর একখানি বই লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রমাণে ও প্রয়োগে এই দুই পুস্তকের অপেক্ষা কোন-অংশেই ন্যূন নহে (ইহাতেও শূলপাণির দৃষ্টান্তই অনুসৃত হইয়াছে)। তিনি গয়া সম্বন্ধেও এক পুথি (নাম গয়াপত্তন) লিখিয়া গিয়াছেন।" (কীর্ত্তিলতার ভূমিকা, ১৷৹—১৷৵৹ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত তিনি অপভ্রংশ ভাষায় গদ্য-পদ্যে কীর্ত্তিলতা নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার আদি গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। তিরহুতের রাজা গণেশ্বর অসলান নামক এক মুসলমানের হস্তে নিহত হন। তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিসিংহ অসলানকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কিরূপে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। অধুনা নাকি নেপাল হইতে বিদ্যাপতির রচিত গোরক্ষবিজয়-নাটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা বৈষ্ণব পদাবলীতেই কবির যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কীর্ত্তিলতার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি-রচিত কীর্ত্তিপতাকার একখানি অসম্পূর্ণ পুথিও তিনি নেপালে দেখিয়াছেন। ইহা মুদ্রিত হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতি নিজেও অনেক রাজার অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। প্রথম কীর্ত্তিসিংহ, তারপর দেবসিংহ, তারপর শিবসিংহ, তারপর পদ্মসিংহ, তারপর হরসিংহ, তারপর নরসিংহ, তারপর ধীরসিংহ। বিদ্যাপতি ইঁহাদের সকলেরই রাজ-সভাসদ্ ও পণ্ডিত ছিলেন।" (কীর্ত্তিলতার ভূমিকা, ১৷৵৹ পৃঃ)। তন্মধ্যে পূর্ব্বেই

বলা হইয়াছে যে কীর্ত্তিসিংহের রাজত্ব কালে কীর্ত্তিলতা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কীর্ত্তিলতাতেও রহিয়াছে—

তাসু কনিঠ্ঠ গরিঠ্ঠগুণ কিত্তিসিংহ ভূপাল।
মেইনি সাহউঁ চির জীবউঁ করউঁ ধর্ম্ম-পরিপাল॥

(ঐ, ৫ পৃঃ)

অর্থাৎ—কীর্ত্তিসিংহ ভূপাল তাঁহার অগ্রজ বীরসিংহের কনিষ্ঠ, গুণে গরিষ্ঠ, তিনি মেদিনী শাসন করিতেছেন, ইত্যাদি। ইহাতে আরও বর্ণিত আছে যে, "লখ্খণ সেন নরেশ লিহিঅ জবে পখ্খ পঞ্চবে" অর্থাৎ ২৫২ লক্ষণাব্দে বা ১৩৬১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ গণেশ্বর বুদ্ধি-বিক্রমে অসলানকে হারাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে সে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক গণেশ্বরকে হত্যা করে। ইহার পরে কীর্ত্তিসিংহ অসলানকে পরাজিত করিয়া রাজা হন। গণেশ্বরের মৃত্যুর পরে ৫।৭ বৎসরের মধ্যে কীর্ত্তিসিংহ রাজা হইলে বলা যাইতে পারে যে, প্রায় ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে যখন কীর্ত্তিলতা রচিত হইয়াছে, এবং সেই সময়ে যদি বিদ্যাপতির বয়স প্রায় ২০ বৎসর হইয়া থাকে, তাহা হইলে নগেন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ বিদ্যাপতি প্রায় ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"হরিনারায়ণ ওরফে ভৈরব সিংহের প্রীতির জন্য বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন (যথা—শ্রীভৈরবক্ষ্মাভুজো দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী কৃতিরিয়ং ইত্যাদি)। ভৈরবসিংহের রাজ্য প্রাপ্তি ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে।" (তরু, ৫ম খণ্ড, ১৬৭ পৃঃ)। অতএব এই সময়ে বিদ্যাপতির বয়স হয় প্রায় ১৬৩ বৎসর। যদিও এই জটিলতার মীমাংসা সহজসাধ্য নহে, তথাপি কল্পনার সাহায্যে ইহার সমাধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে। ২৯১ লক্ষ্মণাব্দে (১৩২২ শক বা ১৪০০ খ্রীঃ) বিদ্যাপতির আদেশে মিথিলার রাজধানী গজরথপুরে লিখিত একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে শিব সিংহকে মহারাজ বলা হইয়াছে। অথচ তিনি ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে রাজা হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শিবসিংহ হয়তঃ

সেই সময়ে কোন প্রদেশ-বিশেষের শাসন কর্ত্তা ছিলেন, অথবা রাজপরিবারের লোকদিগকে রাজাই বলা হইত। ভৈরব সিংহও হয়তঃ বৃদ্ধাবস্থায় ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাঁহাকে ইহার বহু পূর্ব্বেই দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে রাজা বলা হইয়াছে। এইভাবে বিদ্যাপতির জীবিতকালের পরিমাণ অনেক কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তথাপি তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। কীর্ত্তিলতার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিলে মনে হয় বিদ্যাপতি প্রায় ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে শিবসিংহ রাজা হইলেন, এবং সেই বৎসরই তিনি বিদ্যাপতিকে ভূমি দান করেন। অথচ এই দানপত্রে কবিকে "নব জয়দেব" আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। এখানে আর এক জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। বিদ্যাপতি অনেক স্মৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সেইজন্য তাঁহাকে জয়দেবের সহিত তুলনা করা হয় নাই। জয়দেবের ন্যায় রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে তিনি মধুর পদ রচনা করিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহাকে নব জয়দেব বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ পদ শিবসিংহের রাজত্বকালেই রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সমাধানের জন্যও পূর্ব্বোক্ত কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়, অর্থাৎ শিবসিংহ রাজা হইবার বহু পূর্ব্বেই বিদ্যাপতি পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ঐ সকল পদে তিনি শিবসিংহকে রাজ্যেশ্বর রূপেই উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপর শিবসিংহ রাজা হইয়াই তাঁহাকে নবজয়দেব আখ্যায় ভূমি দান করিয়াছেন। নতুবা মনে করিতে হয় যে, শিবসিংহ রাজা হইলেন, আর বিদ্যাপতি রাতারাতি পদ রচনা করিয়া নব-জয়দেব খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন। বিদ্যাপতি স্বহস্তে যে ভাগবতের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার তারিখ নগেন্দ্রবাবুর মতে ৩০৯ লক্ষ্মণাব্দ অর্থাৎ ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দ, আর সতীশ বাবুর মতে "৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দ (১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)"। এই সময়েও তাঁহার বয়স প্রায় শতাধিক বৎসর হইয়াছিল দেখা যাইতেছে। মোট কথা, ইহা সকলই প্রহেলিকাময়। তবে ইহা স্বীকৃত

হইয়া আসিতেছে যে, বিদ্যাপতিই সর্ব্বপ্রথম মৈথিলী ভাষায় কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর গদ্যে বর্ণনরত্নাকর রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির পদ লইয়াও নানাপ্রকার গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ইহার জন্য দায়ী বিদ্যাপতি নহেন, দায়ী পরবর্ত্তী সঙ্কলনকারিগণ। তাঁহারা অন্য কবির রচিত পদ বিদ্যাপতির উপর আরোপ করিয়া তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত আলোচনা সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এখানে তাহা হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত মাত্র উদ্ধৃত হইল। প্রথমতঃ "কবি ভূপতি কণ্ঠহার" বা "ভূপতি" ও "ভূপতিনাথ" ভণিতার পদগুলি। "বিরহ-ব্যাকুল বকুল-তরুমূলে" ইত্যাদি তরুর ৪৮৮ সংখ্যক পদটি নগেন্দ্রবাবু ৩৭৯ সংখ্যক পদরূপে বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্থাপন করিয়াছেন, অথচ ইহাতে "সুকবি ভণথি কণ্ঠহার রে" ভণিতা রহিয়াছে। সেইরূপ "ভূপতি" ও "ভূপতিনাথ" ভণিতার তরুর ৬টি পদই বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে (তরুর ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮৩, ৫৩৯, ১৭২৬, ১৮৭৮ সংখ্যক পদ=বিদ্যাপতির পদাবলীর ৩৭৫, ৪১৯, ৫৩৫, ৩৮০, ৭৬১, ৭৫৮ সংখ্যক পদ)। অথচ ইহার কোন কোন পদে ললিতা, চন্দ্রাবলী সখীদ্বয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী ভাবধারার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। উড়িষ্যার কবি চম্পতি রায়ের কয়েকটি পদ তরুতে সংগৃহীত রহিয়াছে। তন্মধ্যে তরুর ৪৮০, ৫৩২, ৭২৫ এবং ৩৬৮ সংখ্যক পদ-চতুষ্টয় বিদ্যাপতির পদাবলীতে ৪২০, ৩৯৪, ৫৭৩ এবং ৩৭৪ সংখ্যক পদ রূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে পদটিকে নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই—

সখি হে, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বখানইতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥
ইত্যাদি।

এই পদের মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া রবীন্দ্রনাথও বিদ্যাপতির আলোচনায় ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু পদটি পদকল্পতরুর সকল পুথিতেই কবি-বল্লভের ভণিতায় রহিয়াছে, এবং সতীশবাবু দেখাইয়াছেন যে, ইহা উজ্জ্বলনীলমণির পরে রচিত হইয়াছিল, আর এই কবিবল্লভ ছিলেন নরোত্তমের এক শিষ্য। রায়শেখর নামে আর একজন কবি বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত আর একটি বিখ্যাত পদ—

সখি হে হমর দুখক নহি ওর।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর॥
ইত্যাদি

কীর্ত্তনানন্দে শেখর ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে।

তাঁহার পদ-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে সতীশ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"আলোচ্য পদগুলি যে "কবিশেখর" উপাধিধারী বিদ্যাপতির নহে, কিন্তু শেখর কবি অর্থাৎ রায় শেখরের রচিত, এবং নগেন্দ্রবাবু অসঙ্গত রূপেই উহা হইতে উনত্রিশটা পদ বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, উহার প্রমাণ ঐ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে।" (তরুর ৫ম খণ্ড, ৩০-৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই ভাবে বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত অনেক প্রসিদ্ধ পদ অন্য কবির রচিত বলিয়া জানা যাইতেছে।

পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেও অনেক পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাধাকৃষ্ণের সখা-সখীগণের নামকরণ চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে হয় নাই। অথচ বিদ্যাপতির

পদাবলীতে সন্নিবেশিত ২০৮ ও ২০৯ সংখ্যক পদদ্বয়ে সুবল সখার উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ২০৮ সংখ্যক পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি তরুতে এইরূপে পাওয়া যায়—"সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম," কিন্তু ইহাই পরিবর্ত্তিত করিয়া বিদ্যাপতির পদাবলীতে এইভাবে স্থাপন করা হইয়াছে—"সুবল সঞো বইসি সাম" ইত্যাদি। তরুর ২৫৮ সংখ্যক পদে কোন কবির ভণিতা নাই, তথাপি সুবলের উল্লেখ করা এই পদটিকে নগেন্দ্রবাবু ২০৯ সংখ্যক পদরূপে স্থাপন করিয়াছেন। দেয়াসিনী-বেশে মিলনের দুইটি পদ (৫৩৩—৪ সং) বিদ্যাপতির পদাবলীতে পাওয়া যায়। নগেন্দ্রবাবু পদকল্পতরু হইতে ইহাদিগকে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই উভয় পদেই জটিলা ও ললিতার উল্লেখ রহিয়াছে, এবং ৫৩৩ সংখ্যক পদটি কবিশেখরের ভণিতা সহই উদ্ধৃত হইয়াছে, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারই পরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণিত ৫৩৪ সংখ্যক পদে বিদ্যাপতির ভণিতা রহিয়াছে। ছদ্মবেশ ধারণ করাইয়া এইভাবে লীলারস বর্ণনা করিবার পরিকল্পনা যে বিদ্যাপতির সময়ে হইয়াছিল, তাহা ধারণা করা যায় না, বিশেষতঃ ললিতা ও জটিলার উল্লেখে এই সকল পদের অর্ব্বাচীনতাই প্রমাণিত হয়। দ্রষ্টব্য এই যে, চৈতন্য-পরবর্ত্তী চণ্ডীদাসের রচনায় এই দুইটি পদের অনুরূপ দেয়াশিনী-বেশে মিলনের পদ রহিয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাপতিতে ইহার পরেই "ভূপতি" ভণিতার নাগরী-বেশে মিলনের একটি পদ ৫৩৬ সংখ্যক পদরূপে স্থাপিত হইয়াছে। অথচ এই ভাবের ৫৩৫ সংখ্যক পদটি বিদ্যাপতির ভণিতাতেই পাওয়া যায়। পদকল্পতরু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতির সময় হইতে ইহা প্রায় তিন শত বৎসর পরের ঘটনা। ইতিমধ্যে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া "উন্নত উজ্জল রসের" যে ধারা প্রবাহিত করিলেন তাহাতেই রাধাকৃষ্ণলীলা আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার প্রভাবে এই সকল পদের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতির খাঁটি পদাবলীতে, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কুত্রাপি ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি শ্রীরাধার সখীদিগের, সুবল, মধুমঙ্গল ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের ও জটিলা-কুটিলার প্রসঙ্গ বা উল্লেখ দেখা

যায় না। শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, উজ্জ্বলনীলমণি, ও জীব গোস্বামীর শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথমে এই সকলের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব যে সকল পদে উহাদের কোনটার উল্লেখ আছে, উহা যে বিদ্যাপতি বা বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা নহে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।" (তরু, ৫ম খণ্ড, ৩৪-৫ পৃঃ)।

বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রথম ভাগে (৩৭-৪১ সং পদ) নায়িকার স্নান করিয়া উঠিবার পাঁচটি পদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৩৭ সংখ্যক পদটি যে কোন বাদশাহের আদেশে রচিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ নগেন্দ্রবাবুও করিয়াছেন। এই পাঁচটি পদ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই পাঁচটি গানেই বিদ্যাপতি নাহিয়া উঠার পরে কোন সুন্দরী রমণীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম দুইটিতে রাধাকৃষ্ণের নাম একেবারেই নাই। তৃতীয়টীতে মুরারির নাম থাকিলেও উহা কৃষ্ণ প্রেমের কথা নয় বলিয়াই মনে হয়। বাকী দুইটিতে রাধিকা নাহিয়া উঠিতেছেন, সম্মুখে কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ পরস্পরকে দেখিতেছেন। এ দুটিতে কিন্তু রূপ বর্ণনার চেষ্টা নাই, আছে কেবল নায়ক-নায়িকার চাতুরী ও তাহাদের মনের ভাব। এই পাঁচটিকেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, কীর্ত্তনের পদ বলিলে একটু জোর করিয়া বলা হইবে না কি?" (কীর্ত্তিলতার ভূমিকা, ২।৶০ পৃঃ)। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—"নগেন্দ্রবাবু যে ৮৪০টি কীর্ত্তনের পদ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমরা গণিয়া দেখিয়াছি, ৩৩৭টীতে রাধাকৃষ্ণের নামও নাই, গন্ধও নাই, বাকী ৫০৩টীতে আছে। তাহার মধ্যেও আবার অনেকগুলিতে কেবল ভণিতার কাছে মুরারি কিম্বা হরি আছে। সবটাই যে রাধাকৃষ্ণের কথা, তাহা মনে হয় না।" (ঐ, ২৷৷০ পৃঃ)। এইভাবে বিদ্যাপতির পদাবলীতে নানা প্রকার ভেজাল ঢুকিয়াছে। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলীর যে নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দিগ্ধ পদগুলির একটি তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে।

সহজিয়াদের প্রচারের ফলে বিদ্যাপতি ও লছিমার প্রণয়-কাহিনী একপ্রকার প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু প্রেমমার্গীয় এই সহজ ধর্ম্মের উদ্ভব

হইয়াছিল চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে, অতএব এই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বিদ্যাপতি যে লছিমার সহিত প্রেমসাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। প্রতিপালক রাজার পত্নী হিসাবে তিনি লছিমার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে অবৈধ সম্পর্কের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ই যুক্তিহীন।

(বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় তুলনামূলক আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য)।

বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

প্রাথমিকা ঃ

চণ্ডীদাসের কথা বলিতে গেলেই এখন প্রশ্ন উঠে কোন্ চণ্ডীদাস ? কিছুদিন পূর্ব্বেও একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কোনই ধারণা ছিল না, এবং এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগের প্রভাবান্বিত যাবতীয় পদাবলী চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসের স্কন্ধেই আরোপিত হইত। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইবার পরে চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় এক মহা সমস্যার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করে। ইহার সমাধান কল্পে এ পর্য্যন্ত নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি এখনও কেহ কেহ যেন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার জল পরীক্ষা করিয়া ইহার বিশেষত্ব হরিদ্বারের গঙ্গায় আরোপিত করিতে প্রয়াস পান।

যাহাই হউক, চৈতন্যদের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া এক চণ্ডীদাস যে কবি-প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতের একাধিক স্থানে পাওয়া যায়, যথা—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ॥

(ঐ, মধ্যের দশমে)

ইহাতে চণ্ডীদাসের নাম রহিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি কোন্ বিষয়ে গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই। চৈতন্যদেব ছিলেন বৈষ্ণব, আর এখানে গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির গানের সহিত চণ্ডীদাসের উল্লেখ থাকাতে মনে হয় তিনি হয়তঃ তাঁহাদেরই ন্যায় রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহার প্রাচীনতম নির্দ্দেশ রহিয়াছে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক সনাতন গোস্বামীর রচনায়। ভাগবতের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন —"কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি-প্রসিদ্ধাস্তথা

শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি-প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।” নানা কারণে এই উক্তির বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অভিব্যক্তির পরম বিচিত্রতায় যে কাব্য-সৃষ্টি হয় ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। গীতগোবিন্দও এ পর্য্যন্ত গীতিকাব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে যে, কাব্যের উদাহরণ-স্বরূপ সনাতন চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। গীতগোবিন্দ সংস্কৃত গ্রন্থ, অতএব এই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডও যে সংস্কৃত কাব্য, এই ধারণাও কেহ পোষণ করিতে পারেন। এই ভ্রান্তির নিরোধ-কল্পে সনাতন গীতগোবিন্দের পরে “তথা” শব্দের প্রয়োগ দ্বারা “গীতগোবিন্দ” হইতে দানখণ্ডাদি পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন, নতুবা একসঙ্গে সকলেরই উল্লেখ করিতে পারিতেন। দ্বিতীয়তঃ এই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড সম্পূর্ণ গ্রন্থ কিনা তাহাও বিবেচ্য বিষয়। খণ্ড শব্দে সাধারণতঃ অধ্যায় বিভাগই লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ এখানে “প্রকারাঃ” শব্দের প্রয়োগে ইহারা যে প্রকরণ বা অধ্যায়-বিশেষ তাহারই নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। পুরাণে দানখণ্ডাদির উল্লেখ নাই, এইজন্য “দর্শিত” শব্দের প্রয়োগে এই সকল লীলা যে চণ্ডীদাস কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে শ্রী শব্দ ব্যবহার করাতে হয়তঃ এই ধারণাও জন্মিতে পারে যে, সনাতনের সময়ে চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি শ্রীযুক্ত পদ বর্ত্তমান কালেও বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তখন চণ্ডীদাসকে সনাতনের সময়ে টানিয়া আনিবার কোনই হেতু নাই। আর চৈতন্যচরিতামৃতের উদ্ধৃত উল্লেখেও অপ্রাণিবাচক গীতগোবিন্দের পূর্ব্বে “শ্রী” ব্যবহৃত রহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে সম্ভ্রমার্থে “শ্রী” ব্যবহৃত হইত। আবার গীতগোবিন্দাদির সহিত চণ্ডীদাসের উল্লেখ থাকাতেও তাঁহার গ্রন্থ যে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল, এই ধারণারও কোন হেতু নাই, কারণ চরিতামৃতের উদ্ধৃত উল্লেখে গীতগোবিন্দের সহিত চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিও রহিয়াছেন বলিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সকল স্থানে গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ভাষার প্রতি নহে। আবার চণ্ডীদাসাদি-

দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদির উল্লেখ থাকাতে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায় না যে, অন্যান্য কবিও দানখণ্ডাদি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কারণ বর্ত্তমান যুগে কি কি কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয় "মাইকেলাদি-দর্শিত মেঘনাদবধাদি কাব্য" তাহাতে ইহা বুঝা যায় না যে অন্যান্য কবিও মেঘনাদবধ কাব্যই রচনা করিয়াছেন। সনাতন কাব্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন মাত্র, এবং তাহাতে চণ্ডীদাসের দানখণ্ডাদির উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য কবি অন্য বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়া থাকিতে পারেন, অতএব এই উল্লেখ হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, অন্য কবিও দানখণ্ডাদি রচনা করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উদ্ধৃত উল্লেখে সনাতন সতর্কতার সহিতই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। (ইহার বিস্তৃত আলোচনা দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভূমিকায় দ্রষ্টব্য)।

এখানে চণ্ডীদাস-রচিত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি প্রকরণের কথাই জানিতে পারা যাইতেছে, কিন্তু ইহা যে কি ভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন সন্ধান সনাতনের উল্লেখ হইতে পাওয়া যায় না। এখন দেখিতে হইবে, প্রাচীন সাহিত্যে ইহার কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে কিনা। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শিষ্য গদাধরের বাড়ীতে দানলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (ঐ, আদির একাদশে)। কি ভাবে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার বর্ণনা চরিতামৃতে নাই, কিন্তু হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গলে এইরূপ অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, তিন প্রভু মিলিয়া শান্তিপুরে এই লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অদ্বৈত প্রভু শ্রীকৃষ্ণের, চৈতন্যদেব রাধার, এবং নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাধা ও তাঁহার সখীগণ বড়ায়ের সঙ্গে মথুরায় দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, সেই সময়ে কৃষ্ণ তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দান গ্রহণ করেন। এইরূপ আর একটি অভিনয়ের বিবরণ চৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়। মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে যে লক্ষ্মীনৃত্যের অভিনয় করিয়াছিলেন তাহাতেও বড়ায়ের সহিত রাধার মথুরা-গমনের উল্লেখ রহিয়াছে (ভারতবর্ষ,

১৩১৭ সাল, ৬৩৩-৬ পৃঃ)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্যের সমকালেই বড়াই-ঘটিত দানলীলার আখ্যায়িকা বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। সনাতন দানলীলার প্রবর্ত্তক হিসাবে চণ্ডীদাসের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যে, মহাপ্রভু চণ্ডীদাস-রচিত দানলীলারই বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন, নতুবা একাধিক বার তিনি ইহার অভিনয় করিতেন না। বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাতে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি অধ্যায়বিভাগে বড়ায়ের সাহায্যে রাধা-কৃষ্ণলীলা বর্ণিত রহিয়াছে। এই বড়াই চণ্ডীদাসের নূতন সৃষ্টি। চণ্ডীদাসের পরিকল্পনা হইতে উদ্ভূত হইয়া ইনি যে পরবর্ত্তী কবিগণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্যও প্রদান করিয়া থাকে। বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভুর সমসাময়িক। তিনিও দানলীলার উল্লেখ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, যথা—

কিসের বা দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেড় দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরে নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসুঘোষ গান॥

অতএব কৃষ্ণলীলায় যে দান সাধিত হইয়াছিল তাহা বাসুঘোষ অবগত ছিলেন, এবং কৃষ্ণের দানলীলার অনুকরণে তিনি চৈতন্যদেবের দানলীলার পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত প্রেমামৃত নামক চম্পূকাব্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ দান-নৌকা-ভারলীলাদির বর্ণনা রহিয়াছে। চৈতন্যদেব দানলীলার অভিনয় করেন যখন তিনি গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, আর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে তিনি গোপাল ভট্টকে দীক্ষা দান করেন। অতএব তিনি যে দানলীলার অভিনয় করিতেন তাহা রচিত হইবার বহু

পরে এই চম্পূকাব্য রচিত হইয়া থাকিবে। ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাব লক্ষিত হয়। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। চৈতন্য-দেবের জন্মের পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে লিখিত এই গ্রন্থের এক পাণ্ডুলিপি হইতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে দানলীলার উল্লেখ নাই। ইহাই স্বাভাবিক, কারণ তিনি ভাগবত অনুসরণ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং ভাগবতে দানলীলার প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুথিতে দান-নৌকা-ভারলীলাদির বর্ণনা রহিয়াছে। যাঁহারা এই নূতন সংযোজনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সময়ে যে এই সকল আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তারপর ভবানন্দের হরিবংশে, জীবন চক্রবর্ত্তীর ভাগবতে, শঙ্কর কবিচন্দ্রের গোবিন্দ-বিজয়ে, জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবির পদে যে বড়ায়ের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। মনসামঙ্গলেও ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মনসাদেবী গোয়ালিনী বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ সম্বন্ধে বলিতেছেন—

শিশুকালে বিকে যাই মথুরার হাটে।
নন্দের নন্দন দানী যমুনার ঘাটে ॥
প্রতিদিন উষাকালে লইয়া পসরা।
সাত পাঁচ সখী সঙ্গে যাইতাম মোরা ॥
প্রধান গোপিনী তায় রাধা চন্দ্রাবলী।
হরিপ্রিয়া সুধামুখী কনক পুতুলী ॥
কানাই কদম্বতলে সেইখানে দানী।
দান ছলে রাখে নিত্য সকল গোপিনী ॥
সকল পসার লুট্যা দধিদুগ্ধ খায়।
অপমান করে কানাই আর দান চায় ॥
আছিল বড়াই বুড়ী বুদ্ধের আগল।
তার অনুগত মোরা গোপিনী সকল ॥

কাচলি উতারে কানাই কুচে দেই হাত।
মথুরা যাইতে পথে বড় উৎপাত ॥

(কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, বিশ্ববিদ্যালয় সং—পৃঃ ১৮২)।

ইহা সম্পূর্ণ ই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রভাব কেবল যে কবিগণের উপরেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে, সাধারণ লোকের মধ্যেও ইহার প্রচলন বিশেষরূপেই লক্ষিত হয়। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় পটুয়া-সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় তাহার প্রায় প্রতি গানে বড়াইঘটিত দানলীলার উল্লেখ রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কয়েকটি গানের যে দুইখানি পুঁথি রক্ষিত আছে, তাহাতে বিবিধ তালবোলের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা পাঠ করিলেই বোধ হয় কোন বাদ্যকরের প্রয়োজন সাধনের জন্য ইহা লিখিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একখানি ১২৩৭ সনে লিখিত, এবং অপরটি তাহা হইতেও প্রাচীনতর। অতএব প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বেও সাধারণ লোকের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের গানের প্রচলন ছিল তাহা দেখা যাইতেছে (১৩৩৯ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের "দেখিলোঁ প্রথম নিশী" ইত্যাদি পদটি পরিবর্ত্তিত আকারে নীলরতন বাবু-সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে মুদ্রিত রহিয়াছে। ইহাও এই গ্রন্থ-প্রচলনের সাক্ষ্য প্রদান করে। অবশেষে আমরা আধুনিক যুগে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। রামমোহন রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদিত করিয়া দুর্জ্জয় মানভঙ্গ-যাত্রা, ও সুবল-সংবাদ এবং বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান, যাহা কেবল চিত্ত মালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয়, তাহাকে পরমার্থ করিয়া জানে ইত্যাদি।" (চারি প্রশ্নের উত্তর)।

অতএব চৈতন্যদেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ত্তমানতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই গ্রন্থের বিরল প্রচারের ধারণা সম্পূর্ণ ই ভ্রান্তিমুলক। এই সকল সাক্ষ্যের উপর নির্ভর

করিয়া নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, মহাপ্রভু বড়ু চণ্ডীদাসের পদই আস্বাদন করিতেন, অর্থাৎ এই কবিই চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে বর্ত্তমান ছিলেন।

সংস্কার-জাত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে এই গ্রন্থের প্রতি প্রভূত অবিচার করিয়াছেন। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির স্বভাব এই যে, তাঁহারা অসতর্ক ভাবে কখনও কোন অপ্রামাণিক কথা বলিয়া ফেলিলে, যে ভাবেই হউক, সেই কথাটাকে প্রবল করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।" (ঐ, ৫ম খণ্ড, ২৩৬ পৃঃ)। ইহাই এই বিদ্বেষ-সৃষ্টির প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। চৈতন্য—পরবর্ত্তী ভাবধারা অবলম্বনে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিচার করা যায় না, তাহা প্রবীণ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন। তথাপি তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা আত্ম-প্রতারণা মাত্র। কোন সমালোচক লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থে কৃষ্ণ নাই, শ্যাম নাই—এই গ্রন্থে নাই সে রাধা, যিনি রাধা-নামে-সাধা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শ্রবণে উন্মাদিনীপ্রায় বৃন্দাবনের কুঞ্জে প্রেমাভিসারে ছুটিতেন (ইহা মিথ্যা উক্তি, কারণ বংশীখণ্ডে এই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়াই রাধা উন্মাদিনী হইয়াছিলেন), নাই সে রাধার শ্যামতন্ময়ী ভাব (ইহাও মিথ্যা উক্তি, কারণ বিরহ খণ্ডে রাধা সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণপরায়ণা হইয়াছেন)। এই গ্রন্থে ব্রজের রাখাল নাই, সুবল সখা নাই, অন্তরঙ্গ প্রাণপ্রিয়া নর্ম্মসখী নাই, ললিতা-বিশাখা নাই" ইত্যাদি। যদি থাকিত, তাহা হইলে ইহাকে চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলা যাইত কি? সখা-সখীগণের নামকরণ চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগেই হইয়াছে, তাঁহাদের উল্লেখ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে থাকিতেই পারে না, এবং এইজন্যই ইহাকে প্রাক্‌চৈতন্যযুগের ভাবধারার বিশেষত্ব-সম্পন্ন বলিয়া ধারণা জন্মে। ভাগবত হইতে আরম্ভ করিয়া গীত-গোবিন্দ অতিক্রম করিয়া এই স্রোতই বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চৈতন্যদেবের সময় হইতে আবার নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, এবং এইজন্যই তিনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। এই সহজ সত্য যে প্রবীণ ব্যক্তিরা বুঝিতে পারেন না, ইহা বিশ্বাস করিতে

প্রবৃত্তি হয় না। যাহাই হউক, এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস একই আদর্শ গ্রহণ করিয়া পদ-রচনা করিয়াছিলেন। মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভার চিত্রই তাঁহাদের রচনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে বিদ্যাপতির রাধা জ্ঞাতযৌবনা, কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা অজ্ঞাত-যৌবনা। বিদ্যাপতির রাধা শৈশব অতিক্রম করিয়া সবে মাত্র যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ তের বৎসরে হইয়া থাকে, কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার বয়স মাত্র এগার বৎসর। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমনিবেদন শুনিয়া রাধা বলিতেছেন—

এগার বৎসরের বালী।
যেহ্ন নলিনীদল কোঁঅলী॥
তাক দেখি যার মন জাএ।
নিজ দোষে পরাণ হারাএ॥

কিন্তু কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমার নিকট বার বৎসরের দান পাওনা রহিয়াছে, আজ তাহা আদায় করিব।" উত্তরে রাধা পুনরায় বলিতেছেন—

সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে॥

সবে মাত্র আমার বয়স এগার বৎসর, অথচ তুমি বার বৎসরের দান চাহিতেছ? ইহা কথামালার সিংহ ও মেষশাবকের উক্তি-প্রত্যুক্তি মনে করাইয়া দেয়। যাহাই হউক, রাধা স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে, মদনের অধিকার তাঁর হৃদয়ে অণুমাত্রও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এবং সখীগণের নিকটেও তিনি রসকেলির কথা শুনেন নাই—

রতি-কথা সখি-মুখে না শুনিলোঁ কানে।

কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা জ্ঞাতযৌবনা বলিয়া আগ্রহের সহিত ইহা শুনিয়া থাকেন। আদর্শের বিভিন্নতা হেতু দুই কবির রচনায় রাধার এই বিশিষ্টতা বিভিন্নরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু মুগ্ধা নায়িকার পরিকল্পনায় চণ্ডীদাস আরও কিছু নূতনত্বের সংস্থান করিয়াছেন। কেবল অল্প বয়স হেতু প্রেমের সহিত অপরিচিতা বলিয়াই রাধা মুগ্ধা নহেন, সংসার-মোহে আবদ্ধা বলিয়াও মুগ্ধা। বড়াই কৃষ্ণের পান-ফুল লইয়া রাধার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তাহার প্রস্তাব শুনিয়া রাধা বলিলেন—

ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল
তা সমে কি মোর নেহা॥

উত্তরে বড়াই বলিল—

যে দেব স্মরণে পাপ-বিমোচনে
দেখিলে হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাড়াইলেঁ
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥

তথাপি রাধা অবিচলিতভাবে বলিলেন—

ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পশু তার পতী।
পরপুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥

অবশেষে কৃষ্ণের পানফুল পদদলিত করিয়া রাধা বড়াইকে মারিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহাকে শাস্ত্র ও সমাজ-বেষ্টনীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিতই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

মুগ্ধা-সম্বন্ধীয় আরও একটি নূতনত্ব কবি রাধার প্রতি আরোপ করিয়াছেন। জন্মখণ্ডেই কবি নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন যে, দেবগণের অনুরোধে কৃষ্ণের রসসম্ভোগের জন্য লক্ষ্মী আসিয়া রাধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মোহাভিভূতা রাধা নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানহীনা। কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ তাহা দানখণ্ডে স্মরণ করাইয়া দিলেও রাধা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ই সজ্ঞান। দেবগণের অনুরোধে

কংস-বধের জন্য যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন এই ধারণা তাঁহার রহিয়াছে। এই ভিত্তির উপরে সমগ্র কাব্যটি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশসম্ভূত। কিন্তু পরমাত্মা মায়াধীশ, আর জীব মায়াবশ। এই মায়া বা অবিদ্যার মোহ ছিন্ন করিতে পারিলেই জীব পরমাত্মার স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারে। ইহাই সোঽহং, তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যে প্রচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদর্শনেও রাধা জীবাত্মার প্রতীক। কৃষ্ণ বহির্মুখ এই জীবকে কৃষ্ণপরায়ণা করিবার পরিকল্পনা যে কবির ছিল, তাহা গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। এই জন্যই গ্রন্থের প্রথমাংশে কৃষ্ণের প্রতি রাধার পরম বিরাগ বর্ণিত হইয়াছে। জীবাত্মার-স্বরূপ আমরাও রাধার ন্যায় সংসার লইয়া উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছি। ভগবানের আহ্বান আমাদেয় কর্ণে আসিয়া পৌছে না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই তত্ত্বই রূপকের সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছে। অনেক কুতার্কিক কৃষ্ণের এই সোঽহং ভাবকে ঐশ্বর্য্য ভাবের দ্যোতক বলিয়া মনে করেন, এবং ইহাতে নাকি মাধুর্য্য-পন্থিদিগের মর্ম্ম-যাতনা উপস্থিত হয়। কিন্তু যে বৃন্দাবন মাধুর্য্যের লীলাভূমি বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অন্তর্গত গোবর্দ্ধনধারণ, ধেনু-বৎস-শিশুহরণ, এবং রাসলীলা প্রভৃতিতে যে পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের ভাব প্রকটিত রহিয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান, এই ধারণা আছে বলিয়াই তাঁহাকে নন্দের দুলাল করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে, নতুবা যার তার ছেলেকে লইয়া ভাগবত রচিত হয় না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যগ্রন্থ, ধর্ম্মগ্রন্থ নহে। কবির মূল পরিকল্পনার সন্ধান লইয়া কাব্যের সফলতা সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়, ইহাই সমালোচনার সনাতন বিধি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যে কবির উদ্দেশ্য পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী আলোচনা হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে। রাধার পূর্ব্ব-স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইবার ধারণাটি কবি বোধ হয় রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানে রামচন্দ্রও শাপ-প্রভাবে নিজের পূর্ব্ব-স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়া ধরাধামে লীলা করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণের এই আদর্শই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রতিফলিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রানুযায়ী মধ্যানায়িকা মধ্যম যৌবনা, অনধিক লজ্জাবতী, এবং

ঈষৎ প্রগল্‌ভা হইয়া থাকে। চণ্ডীদাস বয়সের হিসাব করিয়া ইহার সংস্থান করিয়াছেন। তাম্বূলখণ্ডে কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উদয় হয় বসন্তকালে, বর্ষায় নৌকালীলা, শরতে ছত্র-ধারণ, আর তাহার পরবর্ত্তী বসন্তে রাসলীলা। অতএব এগার বৎসরের বালিকা রাধা এখন বার বৎসরের কিশোরী। ইহার পূর্ব্বে দানখণ্ডে এবং নৌকাখণ্ডে একাধিক বার উভয়ের মিলন সংঘটিত হইয়াছে। ইহারই ফলে কৃষ্ণের প্রতি যে রাধার অনুরাগের সঞ্চার হইতেছিল তাহার আভাস ভারখণ্ডে পাওয়া যায়। দধির ভার বহিলে রাধা কৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন প্রকারান্তরে এই চুক্তিতেই কৃষ্ণ ভার স্কন্ধে লইয়াছিলেন। ছত্রখণ্ডে ইহার স্পষ্ট আভাস রহিয়াছে। অতএব মধ্যম-যৌবনা রাধা এখন অনধিক লজ্জাবতী হইয়াছেন। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে, কবি কত সতর্কতার সহিত কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু এখানে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগের অভিযোগ উত্থাপিত হইতে পারে। তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা দোষবর্জ্জিত। সংসার-মোহে আমরা যে ভাবে অভিভূত হইয়া রহিয়াছি তাহাতে ভগবান অনুগ্রহ করিয়া যদি আমাদিগকে এই ভাবে আকর্ষণ না করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারি কি? কবি গাহিয়াছেন—"আমিত তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ।" এই উক্তির মধ্যে যে পরম সত্য নিহিত আছে, কবি তাহাই অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকে সক্রিয় করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কাব্যের প্রয়োজনের দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, এই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ নহেন। সহকারী চরিত্রের সাহায্যে রাধা-চরিত্রের ক্রমিক পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করাই কবির উদ্দেশ্য। ইহাতে সফলকাম হইলেই কবি সর্ব্ববিধ দোষ-বিমুক্ত হইতে পারেন। এ পর্য্যন্ত রাধার ক্রমিক পরিবর্ত্তনই এই গ্রন্থে সুকৌশলে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ কৃষ্ণের পক্ষেও ইহা দোষাবহ হয় নাই। কারণ কাব্যের প্রথম ভাগেই কবি রাধাকে কৃষ্ণের মূল প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব আত্মবিস্মৃত রাধাকে আকর্ষণ করিয়া নিজস্ব করিবার প্রচেষ্টা কৃষ্ণের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই। যাহাই হউক, বৃন্দাবনখণ্ডে আমরা দেখিতে পাই যে,

রাধা নিজেই বড়াইকে কৃষ্ণের সহিত মিলনের কৌশল বলিয়া দিতেছেন। অতএব তাঁহাকে এখন কৃষ্ণপরায়ণাই বলা যাইতে পারে। ইহাই ঈষৎ প্রগল্‌ভার লক্ষণ। এই অবস্থা বাণখণ্ড পর্য্যন্ত চলিয়াছে। বংশীখণ্ডে আবার বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন রাধা প্রায় চতুর্দ্দশী। অতএব এখন হইতে তিনি পূর্ণ প্রগল্‌ভার পর্য্যায়ের উন্নীত হইয়াছেন। তখন কৃষ্ণের বংশীধ্বনি তাঁহাকে আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে, প্রকাশ্যে কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে আর দ্বিধা নাই, এখন বড়াই আর কৃষ্ণের দূতী নন, রাধার দূতী। বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাধা বড়াইকে বলিতেছেন —

সুসর বাঁশীর নাদ সুনী আইলোঁ
মো যমুনাতীরে।
শোভন কলসী করে ধরিআঁ
পারিলোঁ যমুনানীরে॥
বাঁশীর নাদ না শুনী এবেঁ
কাহ্নু গেলা কিবা দূরে।
প্রাণ বেআকুল ভৈল এবেঁ
কিমনে জায়িবোঁ ঘরে॥
অহোনিশি মো আন না জানো
এ দুখ কহিবোঁ কাএ।
কাহ্নের ভাবেঁ চিত বেআকুল
লাজে মোঁ না কান্দ রাএ॥
চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্নু বিনি মোর এবেঁ এক খন
এক কুলযুগ ভাএ॥

অন্যত্র—

কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি বোলহ এখন।
যে বুধি করিলেঁ রহে আহ্মার জীবন॥
কে বোলে চন্দন চাঁদ অতি সুশীতল।
আহ্মার মনত ভাএ যেহেন গরল॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান।
ঘাঅত উপর ঘাঅ বাঁশীর সান॥

যাঁহারা "শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধাকে উন্মাদিনী প্রায় বৃন্দাবনের কুঞ্জে প্রেমাভিসারে ছুটিতে" দেখিতে চান, ইহা পাঠ করিলে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। আর বিদ্যাপতির অলঙ্কার-বহুল এই জাতীয় রচনার সহিত তুলনা করিয়াও তাঁহারা দেখিতে পারেন যে, প্রাণের আবেগ অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কাহার রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। তবে কিনা ধনীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া যাহাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, আড়ম্বরহীন স্নিগ্ধ শীতল নীড়ের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পতিত হয় না, অথবা নিজের গৃহের সম্পদ্ অপেক্ষা অনেকেই পরের ধন বড় করিয়া দেখেন!

আবার বিরহখণ্ডে রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়াই
না মানিলোঁ লঘু গুরুজনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥

বড়ায়ি গো

কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় অভাগিনী॥ ইত্যাদি

অন্যত্র—

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ
তভো বিরহ না টুটে।
মেদিনী বিদার দেউগো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে॥
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি
কি মোর বসতী আশে।
আন পানী মোকে একো না ভাএ
কি মোর জীবন আশে॥ ইত্যাদি

কৃষ্ণ-প্রেমময়ী রাধায় চিত্র এখানে ফুটিয়া উঠে নাই কি? মহাভাবস্বরূপিণী রাধার পরিকল্পনা ইহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। আর চৈতন্যদেব এই সকল পদ যে আনন্দের সহিত আস্বাদন করিতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহের কোনই কারণ থাকিতে পারে না। প্রচলিত পদাবলীর অনেক পদের ভাবসাদৃশ্যও ইহাতে লক্ষিত হইবে। চণ্ডীদাসের রচনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি অযথা অলঙ্কারের ভারে ভাষাকে প্রপীড়িত করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার অলঙ্কার আড়ম্বরহীন, অথচ সহজ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের পরিপোষক। মুগ্ধা রাধার পরিকল্পনায় তিনি যে বিদ্যাপতি অপেক্ষা অধিক চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যায়িকা সংক্ষেপে এই :—

দেবগণের অনুরোধে কংস-বধের জন্য নারায়ণ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন, আর কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য লক্ষ্মী আসিয়া রাধারূপে সাগরের ঘরে জন্ম গ্রহণ

করেন। রাধার সহিত নিপুংসক অভিমন্যুর ববাহ হয়। এই অভিমন্যুর এক ভগ্নীর সহিত কৃষ্ণের পালক পিতা নন্দের বিবাহ হইয়াছিল। এই হিসাবে অভিমন্যু হইলেন কৃষ্ণের মাতুল, আর রাধা মাতুলানী। রাধার মাতা পদ্মার এক পিসী ছিল, তাহার নাম বড়াই। ইহাকে রাধার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হইল।

নন্দ যত বড় সঙ্গতিপন্নই হউন না কেন, তাঁহার পুত্র কৃষ্ণকে প্রতিদিন গরু চরাইতে যাইতে হইত, আর অভিমন্যু বড়লোক হইলেও তাঁহার পত্নী শ্রীরাধা মথুরায় দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতেন। তখনকার দিনে বোধ হয় প্রত্যেকেই স্ব স্ব বৃত্তি-অনুযায়ী কার্য্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত, কারণ ভাগবতেও কৃষ্ণের গোচারণের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ভাব-জগতের কথাও হইতে পারে। যাহাই হউক, বড়ায়ের সহিত মথুরার হাটে যাইবার কালে একদিন রাধা বড়ায়ের সঙ্গচ্যুত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে বড়াই দেখিলেন অদূরে কৃষ্ণ গরু চরাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মতে কৃষ্ণও বড়ায়ের নাতি-সম্পর্কিত। বড়াই যাইয়া কৃষ্ণের নিকটে রাধার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। তদুত্তরে বড়াই রাধার রূপগুণের বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণের নিকটে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহা শুনিয়া রাধাকে পাইবার জন্য কৃষ্ণের হৃদয়ে অভিলাষের উদয় হয়। কৃষ্ণ তখন বড়াইকে দূতী করিয়া রাধার নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহার প্রস্তাব শুনিয়া রাধা কৃষ্ণ-প্রেরিত পানফুল পদদলিত করিয়া বড়াইকে মারিয়া তাড়াইয়া দেন। বড়াই আসিয়া কৃষ্ণের নিকটে তাহার অপমানের কথা বিবৃত করিলে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে উভয়ে পরামর্শ-করিয়া স্থির করেন যে, বড়াই রাধার সহিত পুনরায় ভাব করিয়া তাঁহাকে লইয়া দানঘাটে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ বলপূর্ব্বক দান আদায় করিবেন। পরামর্শ-অনুযায়ী কার্য্য সমাধা হইল। রাধা দান-ঘাটে উপস্থিত হইলে তর্কবিতর্কের পর কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইলেন। তারপর বর্ষাকালে নৌকায় যমুনা উত্তীর্ণ হইবার কালে পুনরায় তাঁহাদের মিলন সংঘটিত হয়। ইহার পরে ভারখণ্ডে রাধার দধি-দুগ্ধের ভার বহন করিয়া কৃষ্ণ মথুরার

হাটে গমন করেন, এবং শরতের রৌদ্রে রাধার মস্তকে ছত্র ধারণ করেন। বৃন্দাবনখণ্ডে রাসলীলার অনুষ্ঠান হয়। যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণের কালিয়-দমন এবং বস্ত্রহরণ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। পরে বড়ায়ের পরামর্শে কৃষ্ণ রাধার প্রতি সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার যাবতীয় মোহ ধ্বংস করিয়া দেন। তখন রাধার পূর্ব্ব-স্বরূপত্বের ধারণা জন্মে। ইহার ফলেই কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রবল অনুরাগের সৃষ্টি হয়। বংশীখণ্ড হইতেই রাধাকে কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বিরহখণ্ডে রাধা-প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের একত্ব :—সমগ্র গ্রন্থের পরিকল্পনার আভাস তাম্বূলখণ্ডেই পাওয়া যায়। বড়াই আসিয়া যখন নিজের অপমানের কথা কৃষ্ণের নিকটে বিবৃত করিল, তখনই তিনি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় স্থির করিয়া বড়াইকে বলিলেন—

কদমের তলে বসী যমুনার তীরে
দান ছলেঁ রাখিবোঁ রাধারে।
লুড়িআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার
কাঢ়ী লৈবোঁ সাতেসরী হারে॥
বাটেত সৃজিআঁ দান করি তার আপমান
তোর মোর সাধিব মান॥
পাছেত মদন-বাণে হাণিআঁ তাক পরাণে
রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।
বসি তোহ্মে তার পাশে করিলহি উপহাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

অতএব দানখণ্ড হইতে বাণখণ্ড পর্য্যন্ত লীলার সংক্ষিপ্ত অনুক্রমণিকা এখানেই প্রদত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণের মুনিবেশ ধারণের বর্ণনা বিরহখণ্ডে পাওয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সমগ্র গ্রন্থখানি একই পরিকল্পনা-প্রসূত। ইহাতে গ্রন্থের একত্বই সূচিত হয়, কারণ কবি নানা ঘটনার মধ্য

দিয়া রাধার পরম বিরাগকে অনুরাগে পরিবর্ত্তিত করিয়াই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রসধারা :—আমাদের হৃদয়ে কতকগুলি স্থায়ীভাব আছে, তাহারা সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। কোনও বাহ্যিক উত্তেজনায় ইহার প্রবুদ্ধ হইয়া আস্বাদনীয় হইলে মনে যে আনন্দের উদয় হয়, তাহাই রস। এই আনন্দেই রসের পরিস্থিতি। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, হাস্য প্রভৃতি কাব্য-রস-পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। আবার চিত্তের রঞ্জনকারী ধর্ম্মবিশেষও রাগ, রতি প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হয়। এই রতির চমৎকারিত্বেই রসের সৃষ্টি হইয়া থাকে। একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। ছাত্রগণের পক্ষে পাঠে রতি থাকা স্বাভাবিক। ইহা তাহাদের স্থায়ী ভাব। কিন্তু কোন ছাত্র যদি কঠোর পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে, তখন তাহার মনে যে আনন্দের উদয় হয় তাহাতে ঐ রতি রসরূপে অনুভূত হয়। বৈষ্ণবগণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি রতির পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। সেবাধর্ম্ম-পরায়ণ হনূমানের দাস্যরতি চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু রামের নির্দ্দেশ-ক্রমে লঙ্কায় গমন করিয়া যখন সে সীতার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে রামের অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছিল, তখন তাহার মনে যে আনন্দের উদয় হইয়া থাকিবে তাহাতে তাহার ঐ স্থায়ী রতি রসরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এইরূপ চমৎকারিত্বেই রসের সৃষ্টি হয়, এবং রসাত্মক বাক্যই কাব্য। অতএব কাব্য-বিচারে প্রথমেই রসের সন্ধান করা উচিত। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে কবির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রথম ভাগেই কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য রাধার জন্ম গ্রহণের পরিকল্পনা করিয়া কবি গ্রন্থের ভিত্তি গঠিত করিয়া লইয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আদি-রসাত্মক কাব্য রচনা করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখা যায় যে, কবি তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনে সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহার এই প্রেরণা তিনি যে জয়দেবের গীত-গোবিন্দ হইতে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায়, কারণ উভয় গ্রন্থই আদি রসাত্মক, এবং গীতগোবিন্দের সহিত যে কবির বিশেষ পরিচয় ছিল,

তাহার প্রমাণ এই যে, ঐ গ্রন্থের অনেক সংস্কৃত শ্লোক অনুবাদিত করিয়া তিনি গ্রন্থ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যুগধর্ম্মে বিদ্যাপতিও এই আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, শৃঙ্গারই রসরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, এবং বৈষ্ণবগণের কথায় বলিতে হয়—শ্রীকৃষ্ণই শৃঙ্গার-রসরাজ-বিগ্রহ। অতএব শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনায় আদিরসের প্রাধান্য দেওয়াই যুক্তি-সম্মত। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সাহিত্যেও আদিরসের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। অধিকন্তু শৃঙ্গার অথবা বীর, এই দুই রসের একটিকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া কাব্য-রচনার বিধি অলঙ্কার-শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রেমমূলক বৈষ্ণব ধর্ম্মে, বিশেষতঃ রাধাকৃষ্ণ লীলায়, বীররস পরিস্ফুরণের বেশী সুযোগ নাই বলিয়া চণ্ডীদাস আদিরসের প্রাধান্য দিয়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু গ্রন্থে একটি রসকে প্রাধান্য দিলেও অন্যান্য রস ইহার অঙ্গীভূত করিতে হয়। হাস্যরস শৃঙ্গার রসের পরিপোষক, এবং হাব, ভাব, হেলা প্রভৃতি ইহার বিশেষ পরিপুষ্টি সাধন করে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে হাস্য-কৌতুকাদি উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই কবি ইহার সমাবেশ করিয়া লীলার আস্বাদনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। অপ্রত্যাশিত ঘটনার সন্নিবেশে, আকস্মিক বিচিত্রতায়, এবং নূতনত্বের মৃদু উত্তেজনায় আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাধারার কিছু ব্যতিক্রম সংঘটিত হইলেই হাস্যরস অনুভূত হয়। গ্রন্থের প্রথম ভাগে অর্থাৎ জন্মখণ্ডে কংসের সভায় নারদের আগমনের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহা বস্তুতই কৌতুকাবহ। কবি লিখিয়াছেন—

পাকিল দাড়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী॥
খণে খণে হাসে বিনি কারণে।
খণে হএ থোড় খণেকেঁ কানে॥

লম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।
ক্ষণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে॥
মিলে ঘন ঘন জীহের আগ।
রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ॥ ইত্যাদি।

নারদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে, ইহাতে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হওয়াতে নূতনত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। বিকৃত অঙ্গাদি যে হাস্য-রসোদ্দীপক তাহা ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রসশাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এখানে সেই আদর্শই গৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ কবি ছাগ, ভেক, মাকড় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে নারদের অঙ্গভঙ্গী ও বেশভূষার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে স্বতঃই হাসির উদ্রেক করে। অনেকে পুরাণে ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হন, কিন্তু ইহা কবির স্বীয় কল্পনা-প্রসূত বলাই সঙ্গত। বড়ায়ের রূপ বর্ণনাতেও কবি এই রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই এইরূপে হাস্যরসের সমাবেশ করিয়া কবি যেন সমগ্র গ্রন্থের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ দানখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্রই ব্যঙ্গ কৌতুকের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তাম্বূলখণ্ডই দানখণ্ডের ভূমিকা স্বরূপ। এখানে কৃষ্ণ ও বড়াই দানলীলা-সৃজনের পরামর্শ স্থির করিয়া ফেলিলেন। পাঠকগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু রাধা ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের বিশেষত্ব এই যে, তিনি নেপথ্যে থাকিয়া জীবনকে দূর হইতে দ্রষ্টার মত প্রত্যক্ষ করাইয়া দেন। কৃষ্ণ ছল করিয়া দানী সাজিলেন, রাধার পক্ষে এই রহস্য ভেদ করা কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল। অপ্রত্যাশিত ভাবে দানীর হাতে পড়িয়া তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাতেই পরম উপভোগ্য হাস্য রসের সৃষ্টি হইয়াছে। নেপথ্যে পরামর্শ করিয়া এইভাবে কাহাকেও অপ্রতিভ করিতে পারিলে আমরাও কৌতুক অনুভব করি। কবি চিন্তাশীলতার সহিত এইরূপে ঘটনার সমাবেশ করিয়া প্রকৃত হাস্যরস-সৃষ্টির ভূমিকা গঠিত করিয়া লইয়াছেন। তারপর রাধাকৃষ্ণের পরস্পর কথোপকথনেও হাসির ফোয়ারা উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্য-বিচারে কবির উদ্দেশ্য

সফল হইয়াছে কিনা, ইহাই প্রধান আলোচনার বিষয়, রুচি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা যুগপ্রভাবে সৃষ্ট এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ দান চাহিতেছেন, পণ্যদ্রব্যের জন্য নহে, কিন্তু রাধার রূপ-যৌবন ও বেশভূষার উল্লেখ করিয়া। এই দাবী পরম বিচিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর ইংরাজীতে Wit, Humour, Satire প্রভৃতি যে সকল হাস্যরসের বিভাগ কল্পিত হয়, কবি এখানে তাহাদেরও সমাবেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ বলিলেন—

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর।
প্রাণ জেন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর॥

অমনি রাধা উত্তর করিলেন—

যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতে না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে॥

ইহা ব্যঙ্গ-কৌতুকের দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণ বলিলেন যে, তিনি লঙ্কা ছারখার করিয়া রাবণ-বধ করিয়াছিলেন, অমনি রাধা উত্তর করিলেন—

আকাশ-প্রমাণ লঙ্কার গড়
তোহ্মার পরাণে তথাঁ জাই।
গরু-রাখোআল গোঠে থাকহ
মিছা বোলহ তুহ্নি ভাই॥

ইহা হাস্য-কৌতুকের দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণ বলিলেন যে, বরাহরূপে তিনিই মহী ধারণ করিয়াছিলেন, এবং নরসিংহরূপে তিনিই হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছেন।

উত্তরে রাধা বলিলেন—

বুঝিল কাহ্নাঞিঁ তোমার বিরত
মিছা না করহ দাপে।
আছুক তোহোর কথা হেন করিতেঁ
নারে তোর বাপে॥

ইহা শ্লেষ বা বিদ্রূপোক্তি। এই “বাপে” শব্দটি পাঠ করিলেই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। প্রচলিত পদাবলীর দানখণ্ড এই পরিস্থিতিতে রচিত হয় নাই। সেখানে রাধা কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী, কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য স্বেচ্ছায় বিকির ছল করিয়া মথুরায় যাইতেছেন। ইহা নায়িকার অভিসারের প্রকার-ভেদ মাত্র। তথাপি ইহাতে ধার করা বড়াই রহিয়াছে, এবং কথোপকথন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মার্জ্জিত সংস্করণ। যুগধর্ম্ম প্রভাবে রুচির কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে পরম-বিচিত্রতার সৃষ্টি হইতে পারে নাই, কারণ উভয়ের সম্মতিতে ইহা অনুষ্ঠিত হওয়াতে অভিনয়ের সজীবতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে রস আস্বাদন করিয়া সনাতন ইহাকে কাব্য-পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন, এবং চৈতন্যদেব একাধিক বার ইহার অভিনয় করিয়াছিলেন, আর বাসুঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী কবিগণ যাহার মাদকতা অস্বীকার করিতে পারেন নাই, সেই রসের অভিব্যক্তি প্রচলিত পদাবলীর দানখণ্ডে পাওয়া যায় না। প্রকৃতির কোলে লালিতপালিত সংস্কারহীন বালকবালিকার স্ব ভাবিক প্রেমাভিনয়ের পরিবর্ত্তে এখানে সংস্কারান্ধ মার্জ্জিতরুচি নায়কনায়িকার কৃত্রিম লীলাভিনয় দৃষ্ট হয় মাত্র। ইহাতে আদিরসের স্থানে ভক্তিরসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাও যুগধর্ম্ম, কিন্তু সংস্কারবিহীন হইলেও যে নায়েগ্রার জলপ্রপাতের দৃশ্যের মনোহারিত্ব অস্বীকার করা যায় না, তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বহুল প্রচার হইতে বুঝিতে পারা যায়।

ভারখণ্ডে হাসির কথা এই যে, রাধার অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় কৃষ্ণ ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহা বিয়ে-পাগলা বুড়োর কথা মনে করাইয়া দেয়। বংশীখণ্ডেও নিদ্রিত অবস্থায় কৃষ্ণের বাঁশী চুরী হইল, কৃষ্ণ বুঝিতে পারেন নাই কে নিয়াছে, অবশেষ বড়ায়ের পরামর্শে হাতযোড় করিয়া তাঁহাকে গোপীগণের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইল। দানখণ্ডে কৃষ্ণের প্রেম-নিবেদন শ্রবণ করিয়া রাধা যে সকল উক্তি করিয়াছেন, বিরহখণ্ডে রাধার ব্যাকুলতা দেখিয়া কৃষ্ণ তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। এই দুই খণ্ড

মিলাইয়া পাঠ করিলেই এই রসের অনুভূতি জন্মিতে পারে। এইভাবে গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই কবি নানা কৌশলে তাঁহার অভিপ্রেত হাস্যরসের সমাবেশ করিয়াছেন। ইহা সমস্তই প্রেমের লীলাভিনয়, নিবিড় মিলনের পূর্ব্বাভাসরূপে উভয়কে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণ পরস্পর উক্তি প্রত্যুক্তিতে যে রঙ্গ ধামালীর সৃষ্টি করিতেছেন কবি ইহার স্পষ্ট সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, যথা—

রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী।

দানখণ্ড।

এবং কৃষ্ণের উক্তিতে—

আর না বুলিবোঁ ধামালী।

বাণখণ্ড।

অন্যত্র—

পরিহাস রসেঁ দেব-দামোদর
যেহ্ন নাহি পরিচএ।
তেহ্ন মতে বুঝিল রাধাক উত্তর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ (যমুনাখণ্ড)

অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধান-অনুযায়ী এইভাবে হাস্যরসের পরিবেশে শৃঙ্গার রসের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি হাস্যরসের আর এক প্রধান উপজীব্য। গ্রন্থের প্রথমেই রাধাকে কৃষ্ণের মাতুলানী করিয়া কবি এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। মাতুলানীর প্রেমভিক্ষা মুগ্ধা রাধাকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল, অথচ নিজের স্বরূপাভিজ্ঞ কৃষ্ণের পক্ষে ইহার সার্থকতা লক্ষিত হইবে। রাধাকৃষ্ণের এই সম্পর্ক পরবর্ত্তী পদাবলীতেও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, অথচ প্রেমাভিনয়ের নিরসন হয় নাই। করুণরস শৃঙ্গারের পরিপোষক নহে, তথাপি করুণেও যে শৃঙ্গারের অভিব্যক্তি থাকিতে পারে তাহার উল্লেখ সাহিত্যদর্পণকার করিয়াছেন। ভূরিশ্রবার ছিন্ন হস্ত দর্শন করিয়া তাঁহার স্ত্রী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

অয়ং স রসনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমর্দ্দনঃ।
নাভ্যূরুজঘনস্পর্শী নীবীবিস্রংসনঃ করঃ॥

করুণে শোক স্থায়ীভাব, আর আনন্দেই যদি রসের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে করুণ রসপর্য্যায়ে গৃহীত হইতে পারে না, এই প্রতিবাদের উত্তরে সাহিত্য-দর্পণে বলা হইয়াছে—

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরম্ সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥

অন্যত্র—

শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ।
অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ॥

নতুবা করুণরসপ্রধান রামায়ণাদি গ্রন্থ কাব্য-পর্য্যায়ে গৃহীত হইত না। যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও শৃঙ্গারের পরিপোষকরূপে এইরূপ আক্ষেপের সমাবেশ রহিয়াছে। যথা দানখণ্ডে কৃষ্ণের আক্ষেপে—

হাথ যোড় করিআঁ ভকতি করোঁ
জীউ-দান দেহ বড়ায়ি।
বোল রাধারে মানু সুরতি
তবেঁসি জীএ কাহ্নাঞিঁ॥
ভিতরে অনঙ্গ আনল জ্বলে
বাহিরে কেহো নাহিঁ জাণে।
এহাত আন্ধার নাহিক নিস্তার
কহিলোঁ তোর চরণে॥

এবং রাধার আক্ষেপে—

ঘৃত দধিসব খাইল কাহ্নাঞিঁ
ণাম্বাআঁ মোর পসারা।
কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ তন বিগুতিল
ছিঁড়ি স'তেসরী হারা॥

মহাভারত হইতে উদ্ধৃত উল্লেখের তুলনায় এখানে তথাকথিত অশ্লীলতা অনেক কম, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পরে নৌকাখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমগ্র গ্রন্থেই রাধাকৃষ্ণের আক্ষেপের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত পদাবলীর আক্ষেপানুরাগের পদগুলি বোধ হয় ইহার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়া থাকিবে।

ইষ্টনাশে এবং অনিষ্টের উৎপত্তিতে করুণ রসের সৃষ্টি হয়। নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, রোদন, স্তম্ভ, প্রলাপ প্রভৃতিতে ইহার অভিব্যক্তি। অনিষ্টের উৎপত্তিতে যে রসের সৃষ্টি হয়, তাহাই পদাবলীর উপজীব্য। গ্রন্থের প্রথম ভাগে রাধার অপ্রাপ্তি-হেতু কৃষ্ণের আকুতিতে, এবং শেষ ভাগে রাধা-বিরহে ইহার পরিস্ফুরণ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দুই স্থানে করুণ-বিপ্রলম্ভের সন্ধান পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যখন কালিয়-হ্রদে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া রাধা এবং গোপীগণ ও নন্দ-যশোদা যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাই করুণ-বিপ্রলম্ভ, কারণ কৃষ্ণ কালিয়কে দমন করিয়া পরে হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। আবার বাণখণ্ডে বাণাঘাতে অচৈতন্য রাধার জন্য কৃষ্ণ ও বড়ায়ের আক্ষেপেও ইহার অভিব্যক্তি রহিয়াছে। এইরূপে কাব্য-রচনায় আদি রসকে প্রাধান্য দান করিয়া কবি হাস্য ও করুণকে ইহার পরিপুষ্টির জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রসবোধের জন্য ইহার এই রসধারার সন্ধান করা অতীব প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কেন, যে কোন কাব্য পাঠ করিবার কালেই কবির সহিত একীভূত না হইতে পারিলে ইহার রসাস্বাদন করিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বপূর্ণ কবিতাগুলি তখনই আমাদিগকে বেশী আনন্দ দান করে, যখন আমরা সেই তত্ত্বের সন্ধান করিয়া ইহা পাঠ করিতে অগ্রসর হই, নতুবা কবিতা-পাঠ পণ্ডশ্রমেই পরিণত হয়। এইজন্য কবিকে বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার চিন্তাধারার সন্ধান করা উচিত বলিয়া সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃত সমালোচনা গ্রন্থের ভাষ্য মাত্র, কবি-মানসের বিশ্লেষণ। শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধীয় গেটের উক্তি রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। নতুবা আমাদের

মনগড়া আদর্শ লইয়া কাব্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে বিড়ম্বিত হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পাঠ করিয়া যাঁহারা রস-আস্বাদন করিতে পারেন না, তাঁহারা কবিকে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া প্রতারিত হন মাত্র। পরেও এই বিষয় আলোচিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পুরাণ ও গীতগোবিন্দাদির প্রভাব :—জন্মখণ্ডে কবি পুরাণ অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কংসের অত্যাচারে সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, ইহার প্রতীকারার্থে বসুমতী দেবগণের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণ সহ ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া নারায়ণকে স্তবে পরিতুষ্ট করিলে তিনি ধবল ও কাল দুইটি কেশ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, এই দুই কেশ দৈবকীর উদরে নিয়োজিত করিলে তাহা হইতে তিনি হলধর ও বনমালীরূপে কংস-বধের জন্য জন্মগ্রহণ করিবেন। নারদের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া কংস দৈবকীর ছয় গর্ভ বিনাশ করিলেন। সপ্তম গর্ভস্থ বলদেব মাতার গর্ভপাতের ছল করিয়া রোহিণীর গর্ভে যাইয়া অবস্থান করেন। অবশেষে অষ্টম গর্ভে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কৃষ্ণ ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যোগমায়াও যশোদার কন্যারূপে অবতীর্ণ হন। বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার নিকটে রাখিয়া ঐ কন্যা আনিয়া কংসকে প্রদান করেন। কংস তাঁহাকে শিলার উপরে নিক্ষেপ করিয়া মারিবার চেষ্টা করিলে তিনি আকাশে উত্থিত হইয়া বলিলেন যে, নন্দের ঘরে যে বালক বর্দ্ধিত হইতেছে তিনিই কংসকে বিনাশ করিবেন। ইহা শুনিয়া কংস কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য পুতনা, কেশী প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহারা সকলেই কৃষ্ণের প্রতাপে নিহত হয়। এই সকল ঘটনা কবি পুরাণ অনুসরণ করিয়া যথাযথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধার জন্ম-বর্ণনায় কিছু নূতনত্বের সমাবেশ রহিয়াছে। ভাগবতাদি প্রধান প্রধান পুরাণগুলিতে রাধার উল্লেখ নাই। এইজন্য কবিকে নিজের কল্পনার উপরে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য দেবগণের অনুরোধে লক্ষ্মী আসিয়া সাগরের ঘরে পদুমার উদরে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী পদ্মালয়া এবং সাগর হইতে উত্থিতা হইয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রের সহিত সমন্বয় রাখিয়া কবি সাগর গোপ ও তাঁহার স্ত্রী পদুমা বা পদ্মার কল্পনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু লীলা-সংঘটনকারিণী বড়াই চণ্ডীদাসের নূতন সৃষ্টি। প্রধানতঃ এই তিনটি মাত্র চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

জন্মখণ্ডের পরে তাম্বুলখণ্ড হইতে ছত্রখণ্ড পর্য্যন্ত ঘটনা কবি নিজের কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া রচনা করিয়াছেন। ইহার পরে বৃন্দাবনখণ্ডে পুনরায় পুরাণের প্রভাব লক্ষিত হয়। এক কৃষ্ণ যে শত কৃষ্ণ হইয়া গোপীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, এবং রাসমণ্ডল হইতে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ যে কৃষ্ণের পদচিহ্ন অনুসরণে বিলাপ করিয়া কৃষ্ণের অন্য রমণীর প্রতি অত্যাসক্তির কল্পনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু পুরাণ-বর্ণিত ঘটনার সহিত ইহার বিভিন্নতা এই যে, এই রাস দিবাভাগে সংঘটিত হইয়াছিল। পুরাণে কৃষ্ণ বংশীরবে গোপীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন-খণ্ডে রাধা এখনও বংশীধ্বনি শুনিয়া উন্মত্তা হইবার মত অবস্থায় আসিয়া পৌছেন নাই। বিশেষতঃ দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইবার কালে এই রাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া কবিকে দিবাভাগেই রাসের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। কাব্যের ঘটনা-বিন্যাসের দিক দিয়া ইহার ব্যতিক্রম করা সম্ভবপর হয় নাই। এই বিষয়ে কবিরা স্বাধীন, যেমন গীত-গোবিন্দেও জয়দেব বসন্ত কালে রাসের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তৎপর কালিয়দমন এবং গোপীগণের বস্ত্রহরণও পৌরাণিক ঘটনা। কাব্যের প্রয়োজনে কবিকে রাসের পরেই এই সকল ঘটনার সন্নিবেশ করিতে হইয়াছে। রাধাপ্রেমের ক্রমোৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য কবিকে এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ইহার পরে হারখণ্ড হইতে বিরহখণ্ড পর্য্যন্ত কাব্যের অবশিষ্টাংশ কবির কল্পনাপ্রসূত। বিরহখণ্ডে কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন জানা যাইতেছে। এইভাবে বিরহের সৃষ্টি করিয়া কবি মাথুর-পালা রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ কি ভাবে মথুরায় গিয়াছেন তাহা কাব্যের প্রয়োজনে অনাবশ্যক বিধায় উল্লেখ করা হয় নাই।

গীতগোবিন্দের প্রভাব বৃন্দাবনখণ্ডে স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। রাসের সময়ে

কৃষ্ণকে গোপীগণের সহিত বিহার করিতে দেখিয়া রাধা অভিমান করিয়া এক কুঞ্জে অবস্থান করেন, এবং কৃষ্ণ যাইয়া তাঁহার মানভঞ্জন করেন, ইহাই গীত-গোবিন্দে বর্ণিত হইয়াছে। বেণীসংহার নাটকের বন্দনার শ্লোকেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া রাধার মানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের অনেক সংস্কৃত শ্লোক, এমন কি এক একটি অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়া তিনি গ্রন্থ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বৃন্দাবনখণ্ডের

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥

ইত্যাদি পদটি গীতগোবিন্দের—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥

ইত্যাদি পদের সরল অনুবাদ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশন রুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয়-আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে।।

হইতে আরম্ভ করিয়া

মদন-গরল- খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণপল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে॥

পর্য্যন্ত সমগ্র পদটি গীতগোবিন্দের দশমসর্গের

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

হইতে আরম্ভ করিয়া—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

পর্য্যন্ত শ্লোকগুলির আদর্শে রচিত হইয়াছে। আবার বৃন্দাবনখণ্ডের—

তমালকুসুম চিকুরণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে॥
সুপুট নাসা তিলফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে॥
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।

প্রভৃতি বর্ণনা গীতগোবিন্দের দশমসর্গের—

বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি—
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূনপদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ॥ ১৪।

শ্লোকের অনুকরণ মাত্র। অন্যত্রও ইহার প্রভাব পড়িয়াছে, যথা—

কপোলযুগল তার মহুলের ফুল।
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল॥
তিল ফুল জিনি নাসা কম্বুসম গলে। ইত্যাদি
(২য় সং, ১৫ পৃঃ)

ইহা ব্যতীত গীতগোবিন্দের সমগ্র চতুর্থসর্গের শ্লোকগুলির ভাবানুবাদ করিয়া কবি নিম্নলিখিত পদদ্বয় রচনা করিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের—

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খণে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে॥ ইত্যাদি

এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী—

তনের উপর হারে।
মানএ যেহেন ভারে॥
অতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে॥ ইত্যাদি

পদদ্বয় গীতগোবিন্দের চতুর্থসর্গের—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনের গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্॥

এবং—

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্।
রাধিকা তব বিরহে কেশব॥

প্রভৃতি শ্লোকগুলির ভাবানুবাদ মাত্র। এই দুইটি পদ সম্পূর্ণ ই গীতগোবিন্দের আদর্শে রচিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছত্রখণ্ডের

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে অলক ভমল॥
নেত্র উতপল তোর নাসা নালদণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড॥

ইত্যাদি পদটি শৃঙ্গারতিলকের নিম্নলিখিত শ্লোকটি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, যথা—

বাহু দ্বৌ চ মৃণালমাস্তকমলং লাবণ্যলীলা জলং
শ্রোণী তীর্থশিলা চ নেত্রশফরং ধম্মিল্লং শৈবালকম্॥
কান্তায়াঃ স্তন চক্রবাকযুগলং কন্দর্পবাণানলৈ।
র্দগ্ধনামাবগাহনায় বিধিনা রম্য সরো নির্ম্মিতম্॥

(প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ১০৪ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বৃন্দাবন খণ্ডের

এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে ল।
মনমথক জাগাএ ॥ ল ॥
সুগন্ধিকুসুমগণ বিকসএ। ল।
ফুটি বিরহ হৃদয়ে ॥ ল ॥
তোর দরশন বিণি রাধা। ল।
বড় বিকল কাহ্নাঞি ল।
তোর বিরহ দহনে ॥ ধ্রু ॥
ঘর তেজি ঘোর বনে বসে কাহ্নাঞি ল
সুতি ধরণী শয়নে।
অহোনিশি তোর নাম সোঁঅরে ল
আতি বড়ই যতনে ॥

পদটি গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গের

বহতি মলয় সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায় ॥ ১ ॥
সখি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ২ ॥ ধ্রু।

এবং

বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতমপি ধাম।
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥

শ্লোক দুইটি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের দশম সর্গে রাধার শরীরে বিবিধ অপ্সরাগণের অবস্থান কল্পিত হইয়াছে, যথা—

দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনং
গতির্জনমনোরমা বিজিতরম্ভমূরুদ্বয়ম্।
রতিস্তব কলাবতী, রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা—
বহো বিবুধযৌবতং বহসি তন্বি পৃথ্বীগতা ॥

বোধ হয় এই পরিকল্পনার অনুকরণে বড়ু চণ্ডীদাস রাধার শরীরে সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত বিবিধ রত্নের সংস্থান করিয়াছেন, যথা—

ষোল কলা সংপূন্ন চন্দ্রবদন
বেকত আমৃত তোর মধুরবচন ॥
কণ্ঠ কম্বু মণিগণ শোভএ দশন ॥
গজরাজগতি পরিমল পারিজাত ॥
সুরজনে মোহে পুরজনে নাহিঁ রাথ।
কালকুট বিষহরি জানল কটাক্ষ
সুররাজ গজকুম্ভ কুচযুগল।
তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল ॥
সুন্দরি রাধা ল সরূপ বোল মোরে।
দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে ॥

(দ্বিতীয় সং, ৩২ পৃষ্ঠা)

এইরূপে বহু পদে জয়দেবের অনুকরণ দৃষ্ট হইবে।

তারপর নেত্রের সহিত খঞ্জনের, পদ্মের সহিত করের, করিকুম্ভের সহিত স্তনের, কনক চাঁপার বর্ণের সহিত শরীর-কান্তির, অমৃতের সহিত বচনের মধুরতার, এবং কটাক্ষের সহিত মদন-বাণের তুলনামূলক রচনা পূর্ব্বানুকৃতি মাত্র, যথা—

নেত্রে খঞ্জন-গঞ্জনে সরসিজপ্রত্যর্থি পাণিদ্বয়ম্
বক্ষোজৌ করিকুম্ভবিভ্রমকরীমত্যুন্নতিং গচ্ছতঃ।
কান্তিঃ কাঞ্চনচম্পকপ্রতিনিধির্ব্বাণী সুধাস্যন্দিনী
স্মেরেন্দীবরদামসোদরবপুস্তস্যাঃ কটাক্ষচ্ছটা ॥

(সাহিত্যদর্পণ)

এইভাবে কবি প্রাচীন রূপ বর্ণনার রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাতে সংস্কৃত কাব্যালঙ্কারাদি গ্রন্থের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয়েরই প্রমাণ পাওয়া

যায়। গ্রন্থ-মধ্যে কবির স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।[১] অতএব কবি যে অশিক্ষিত ছিলেন না, তাহা ধারণা করা যাইতে পারে। পুরাণাদি গ্রন্থের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব সম্প্রদায়-বিশেষের কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি যে এই ঝুমুর গানের পালাগুলি রচনা করিয়াছিলেন, এই ধারণা সম্পূর্ণ ই ভ্রান্তিমূলক। মুগ্ধা রাধার পরিকল্পনায় যে কবি বিদ্যাপতি অপেক্ষাও অধিক চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব পাণ্ডিত্যে, শাস্ত্রজ্ঞানে, এবং পরিকল্পনায় কবি যে অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। অশিক্ষিত ঝুমুর গানের কবির পক্ষে ইহা সম্ভবপর কি ?

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবিত্ব :—বিভিন্ন রসশাস্ত্রে কাব্যের সংজ্ঞা নানাভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাহিত্যদর্পণকারের মতে রসাত্মক বাক্যই কাব্য। আনন্দই রসের প্রাণ, অতএব যে রচনায় আনন্দের উদয় হয়, তাহাই কাব্য-পর্য্যায়ে গৃহীত হইতে পারে। কবির মনোরাজ্যে যে আনন্দের অনুভূতি জন্মে, তাহাই রচনা কৌশলে যদি তিনি পাঠকের মনোরাজ্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন তাহা হইলেই রচনার সার্থকতা সম্পাদিত হয়। ইহারই নাম সাধারণীকরণ, অর্থাৎ নিজের ভোগ পরকে বিলাইয়া দিয়া রসাস্বাদ করান। উৎসব-বাড়ীতে পত্রপুষ্পপতাকায় গৃহ সজ্জিত হয়, সুমধুর বাদ্য-ধ্বনিতে ইহার বার্ত্তা বিঘোষিত হইয়া থাকে, এবং বিবিধ ভোজ্যপেয় দ্রব্যাদির সংস্থানে অপরের তৃপ্তি সাধনোপযোগী উপকরণের অভাব লক্ষিত হয় না। গৃহস্বামী নিজ সামর্থ্যানুযায়ী ইহাদের সুবন্দোবস্ত করিয়া নিজের আনন্দের আস্বাদ পরকে বিতরিত করিতে প্রয়াস পান। কবিও সেইরূপ ভাব, ভাষা ও অলঙ্কারাদির প্রচুর সমাবেশে রচনার সৌষ্ঠব সম্পাদিত করিয়া অপরের তৃপ্তি সাধনে চেষ্টিত হন। এই তৃপ্তি আসে রসের আস্বাদন হইতে, এবং চমৎকারিত্ব হইতে হয় রসের

১। এই সকল শ্লোকসম্বন্ধীয় আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

উৎপত্তি। রসশাস্ত্রে কাব্যপুরুষের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়—শব্দার্থ কাব্যের শরীর, ধ্বনি প্রাণ, রস আত্মা, মাধুর্য্যাদি গুণ, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার, এবং রীতি অঙ্গ-সৌষ্ঠব। এখন এইভাবে পরিকল্পিত কাব্য-পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ কি? সকল মানুষই হস্তপদাদি-বিশিষ্ট জীব মাত্র। ইহা তাহাদের সাধারণ বিশেষত্ব, তথাপি প্রত্যেক মানুষেরই একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা থাকে, যাহা অপর হইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়া রাখে। ইহা তাহার হস্তপদাদির অতিরিক্ত হাব, ভাব, রীতি, নীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সমবায়ে গঠিত এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের অনুভূতি হইতে উৎপন্ন হয়। এই ব্যক্তিত্ব অনির্ব্বচনীয়, অথচ অনুভব-সাপেক্ষ, এবং বিশিষ্টতাজ্ঞাপক। সেইরূপ সকল গ্রন্থই শব্দের গাথনিতে রচিত হয়, অথচ তাহারা সকলেই কাব্য-পর্য্যায়ে গৃহীত হয় না। ইহার কারণ এই যে, কাব্যের ব্যক্তিত্বও শব্দ-সাকুল্যের অতিরিক্ত ইহার ধ্বনি, মাধুর্য্যাদির সমবায়ে উৎপন্ন এক অনির্ব্বচনীয় রসের অনুভূতি হইতে সৃষ্ট হয়। এইজন্যই রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলা হইয়া থাকে।

অলঙ্কারকৌস্তভের মতে "কবিবাঙ্নির্ম্মিতি কাব্য।" এই সূত্রে কাব্যের কর্তৃত্ব কবির উপর আরোপিত হইয়াছে। অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনাকেই নির্ম্মিতি বলা যায়, অতএব যিনি ঐরূপ রচনায় সক্ষম তিনিই কবি-পদবাচ্য। প্রকৃতপক্ষে কাব্য কবির রসানুভূতির বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র, এইজন্য কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে। কবিকে সবীজ বলা হয়। এখানে বীজ অর্থে প্রাক্তন সংস্কার। ইহাই কাব্যের রোহভূমি। এই সংস্কার-বশে কবির মনে যে রসানুভূতির উদয় হয়, তাহাই তিনি কাব্যে পরিবেশন করেন। অতএব কাব্য-বিচারে প্রথমতঃ এই প্রাক্তন সংস্কারের সন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, কবি অলঙ্কারাদি বহু শাস্ত্রজ্ঞ, সরস, এবং প্রতিভা-শালী হইলেই উত্তম হন। নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞার নামই প্রতিভা। অতএব কাব্যে নূতন সৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা ইহাও অবশ্য বিচার্য্য বিষয়। তৃতীয়তঃ কাব্যের সরসতা। রচনা সরল, তরল, প্রাঞ্জল, মাধুর্য্যাদি-গুণবিশিষ্ট এবং অলঙ্কারে সুশোভিত হইলে সরসতা প্রাপ্ত হয়। শব্দার্থ

কাব্যের শরীর, ও ধ্বনি প্রাণ ব'লিয়া কথিত হয়। ইহাতে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থ উৎকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয়, আর এই ব্যঙ্গাই ধ্বনি। চতুর্থতঃ কাব্যের দোষও কল্পিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে "শ্রুতিকটুতাদি প্রসিদ্ধ দোষই গণনীয়, নতুবা ক্ষুদ্রতর দোষসকল দোষ মধ্যে গণনা করা যায় না, কারণ তাহারা রসের অপকর্ষক নহে।" প্রকৃতপক্ষে দোষ-রাহিত্যই কাব্যের উৎকর্ষ-জ্ঞাপক নহে, গুণাধিক্যই ইহার শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন। অবশেষে রচনা-রীতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। "রসের অনুকূল যে মাধুর্য্যাদি গুণ, তাহার আবির্ভাব-কারক বর্ণ-বিন্যাস বিশেষকে রীতি কহে। বৈদর্ভী রীতি শৃঙ্গার ও করুণরসে প্রশস্ত। "সমাসরহিত বা অল্পসমাসা এবং সমস্তগুণগুম্ফিতা রীতির নাম বৈদর্ভী।" এখন এই সকল সূত্র অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ কবির প্রাক্তন সংস্কার। এখানে চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কি কি গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভাগবতাদি পুরাণে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত রহিয়াছে, ইহা ব্যতীত জয়দেবের গীতগোবিন্দেরও সন্ধান পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য এই যে, সন্দেহজনক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্যতীত অন্য কোন পুরাণে রাধার উল্লেখ নাই। ভাগবতের কোন কোন টীকাকার এক প্রধানা গোপীকে রাধায় পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, এই গোপী কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন অধুনা প্রচারিত রাধা-ভাবের আদর্শের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। ইহাতে রসাভাসের ধারণা জন্মে, কিন্তু তত্ত্ব-বিচারে যে ইহা দোষ-রহিত তাহা ভাগবতের টীকাকারগণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহাই হউক, ভাগবতেই কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের বিহার-লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। রাসের সময়ে কৃষ্ণের বয়স নয় বৎসর মাত্র, অথচ সেখানে যুবকযুবতীর সম্ভোগ-লীলাই বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। কাব্য-রচনায় চণ্ডীদাসের পক্ষে এই আদর্শ গ্রহণ করা অস্বাভাবিক হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনখণ্ডে এবং যমুনাখণ্ডে রাস হইতে আরম্ভ করিয়া কালিয়দমন ও বস্ত্রহরণ ব্যাপারে কবি পৌরাণিক আদর্শই

গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যের প্রয়োজনে জয়দেবের বসন্ত কালে রাস অনুষ্ঠিত করার ন্যায় এখানে কিছু নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে হইয়াছে মাত্র। জন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ পুরাণ অবলম্বনেই প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু সাগরোত্থিতা পদ্মালয়া রাধাকে কবি সাগরের ঘরে পদ্মার উদরে স্থাপন করিয়াছেন। রাধা বিন্ধ্যপর্ব্বতের কন্যা, পরে বিদর্ভরাজ এবং বৃষভানু কর্তৃক লালিতাপালিতা (ললিতমাধব দ্রষ্টব্য), অথবা গোলোকস্থ শ্রীকৃষ্ণের মূলপ্রকৃতি রাধা শ্রীদামের শাপে মর্ত্ত্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ দ্রষ্টব্য), এই জাতীয় মতবাদ কবির সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। রাধার জন্ম-ব্যাপারে পদ্মবনে রাধার উৎপত্তির আখ্যায়িকাটিই কবিত্বময় বলিয়া মনে হয়, কারণ পদ্মবনে প্রেমময়ী রাধার উৎপত্তির পরিকল্পনার সার্থকতা অনুভব করা যায়। আমাদের অপর দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে ইহাদের নায়িকাদের উৎপত্তি সম্বন্ধেও অনুরূপ পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়। বিপদে অবিচলিতাত্মা জনম-দুঃখিনী সীতা সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর জঠরে উৎপন্না এবং তাহাতেই লীনা হইয়াছেন। তেজস্বিনী দ্রৌপদী পিতার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থের উদ্দেশ্যে যজ্ঞশিখা হইতে উত্থিতা হইয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এবং শৌর্য্যবীর্য্যের আধার ভীম ও অর্জ্জুনের জন্মের জন্য এইভাবেই ধর্ম্মরাজ, পবন ও ইন্দ্রকে স্বর্গ হইতে আকর্ষণ করা হইয়াছে। কবিত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে মনে হয় রূপকের সাহায্যে এই সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব সাগরের ঘরে পদ্মার উদরে রাধার উৎপত্তির পরিকল্পনা অসঙ্গত হয় নাই।

ইহার পরে গীতগোবিন্দ। রাসের পরিশিষ্টরূপে ইহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটি ঘটনা অবলম্বনে কবি জয়দেব নিজ কল্পনাবলে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থখানি আদি-রসাত্মক। যদিও কবি "হরি-স্মরণে সরস মনের" উল্লেখ করিয়া সর্গে সর্গে ভক্তির প্রলেপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি "পীন পয়োধর-পরিসর-মর্দ্দন-চঞ্চল-করযুগশালী" কৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলার চিত্র ইহার প্রতি পত্রে পত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির এই আদি-রসাত্মক আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্ত্তনে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দেও সখী আছে, অথচ তাহাদের নামকরণ হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও সখী রহিয়াছে, কিন্তু ললিতা, বিশাখারূপে তাহাদের উল্লেখ নাই। গীতগোবিন্দের সখীরূপিণী দূতী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়াই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উভয় গ্রন্থেই তিনটি চরিত্রের কার্য্যকারিতা লক্ষিত হয়। যুগ-প্রভাবে এই সাদৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল। যেহেতু ভাগবতাদি পুরাণ ও গীতগোবিন্দ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ বা মতবাদের প্রভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে লক্ষিত হয় না, অতএব স্পষ্টই ধারণা জন্মে যে, এই সকল গ্রন্থ, বিশেষতঃ গীতগোবিন্দ, প্রাক্তন সংস্কার রূপে কার্য্য করিয়া কবিকে গ্রন্থরচনায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। ইহারই ফলে কবির মূল পরিকল্পনাটির সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ এই রোহভূমির উপর দাঁড়াইয়া কবি গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মুগ্ধা রাধাকে কবি এগার বৎসরের বালিকা, এবং কৃষ্ণকে বার বৎসরের বালক করিয়া লইয়াছেন। কৃষ্ণের প্রস্তাবে প্রথমতঃ রাধা সম্মতি জ্ঞাপন করেন নাই। ইহাতেঃ প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে আমরা প্রাকৃত পরিস্থিতির মধ্যে পাইতেছি। তিনি বিবাহিতা, অতএব ধর্ম্ম, সংস্কার ও সমাজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধা। এই অবস্থায় যদি তিনি কৃষ্ণের প্রস্তাবে সহসা সম্মত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধারণী রমণীর পর্য্যায়ে নামিয়া আসিতে হইত। কবি রাধার প্রত্যাখ্যানের বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে আত্মগরিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং ইহাতে তাঁহার প্রভূত চিন্তাশীলতারই পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে রাধার প্রেম আদর্শীভূত হইয়াছিল, অতএব তাঁহাকে জন্ম হইতেই কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনীরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিশ্লেষণ করিতে যাওয়া ভ্রান্তি মাত্র। কিন্তু রাধা যে পরের বিবাহিতা স্ত্রী তাহাত কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, অথচ তাঁহাকে লইয়া নানাভাবেই প্রেম-লীলা বিশ্লেষিত হইয়াছে। রাধাকে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রতীক করিয়া তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা হইতেও বড় কথা আমরা শুনিয়াছি—তত্ত্বমসি—অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম। তথাপি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই পরিদৃশ্যমান সংসারের

মোহেই আমরা অভিভূত হইয়া রহিয়াছি। ইহাই আমাদের স্বাভাবিক পরিস্থিতি। কবিও আমাদের ন্যায় মুগ্ধা রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া তাঁহাকে এগার বৎসরের বালিকা করিয়া লইয়াছেন। ইহা অশাস্ত্রীয় হয় নাই। তারপর কৃষ্ণবিমুখ এই রাধাকে নানা ঘটনার মধ্য দিয়া চালিত করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপরায়ণা করিয়া গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। রাধার উল্লেখ না থাকিলেও ভাগবতে গোপী-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কবি যে তাহার সহিত পরিচিত ছিলেন না, তাহা বলিবার উপায় নাই। অতএব তাঁহার কল্পনার রোহ ভূমিতে সেই আদর্শের বীজ নিহিত ছিল, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি প্রথমেই তাহা স্বীকার না করিয়া ক্রমিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কিরূপে রাধার প্রেম চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাহাই এই গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে প্রারম্ভের বিরাগ পরিসমাপ্তিতে যাইয়া ভাগবতের আদর্শে উন্নীত হইয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে বিচার না করিয়া সমগ্রন্থের ধারণা লইয়া বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হইলে কবির মূল পরিকল্পনার যুক্তিযুক্ততা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ কবির প্রতিভা ও তজ্জাত নূতন সৃষ্টি। পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রানুযায়ী নূতন সৃষ্টিই প্রতিভার নিদর্শন। গীতগোবিন্দ ও ভাগবতে প্রগল্ভা নায়িকার প্রেমের পরিপক্কাবস্থাই বর্ণিত রহিয়াছে, অতএব ঐ সকল গ্রন্থে মুগ্ধা বা মধ্যার চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। কিন্তু চণ্ডীদাস প্রেমের ক্রমোন্নতির স্তর নির্দ্দেশ করিবার পরিকল্পনা লইয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পুরাণাদি বহির্ভূত নূতন সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছে। ইহারই ফলে দান-নৌকাখণ্ডাদির উদ্ভব হইয়াছিল। এই জন্যই দান ও নৌকালীলার বর্ণনা ভাগবতে পাওয়া যায় না, এবং সনাতন গোস্বামী চণ্ডীদাসকেই ইহাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। সৃষ্টিত হইল, কিন্তু ইহা মনোরম চমৎকারিত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে কিনা ইহাই এখানে প্রধান বিচার্য্য বিষয়। এই বিষয়ে আমরা আমাদের নিজের মতামত উদ্ধৃত করিবার অণুমাত্রও প্রয়োজন অনুভব করি না, যেহেতু একমাত্র প্রাচীন

সাহিত্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই ইহার সমাধান করা যাইতে পারে। সনাতন গোস্বামী দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদিকে কাব্য-পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আর চৈতন্যদেব স্বয়ং ইহাদের মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়া একাধিক বার অভিনয় করিয়াছিলেন। তারপর চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বাসু ঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যন্ত যে ইহার অব্যাহত প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলীতেও দান ও নৌকালীলার আখ্যায়িকা বর্ণিত রহিয়াছে। (অন্যান্য বিবরণ দীন চণ্ডীদাসের, পদাবলীর প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য)। এই সকল সাক্ষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ইহাদের মাদকতা অস্বীকৃত হয় নাই, অর্থাৎ চণ্ডীদাস যাহা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার অনুকরণ আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। এই নূতনত্বে রসসৃষ্টি না হইলে দানখণ্ডাদির প্রভাব এতটা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিত না।

চণ্ডীদাসের দ্বিতীয় সৃষ্টি বড়াই। পুরাণে অথবা গোস্বামিগণ রচিত সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে বড়াইকে স্বীকার করা হইয়াছে। চৈতন্যদেব যে দানলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন তাহাতে অন্যতম প্রধান চরিত্ররূপে নিত্যানন্দ বড়ায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লক্ষ্মী নৃত্যের অন্তর্গত রুক্মিণীর কাচে ব্রহ্মানন্দ বড়াই-বুড়ীর সাজে সজ্জিত হইয়া সখী সুপ্রভার সহিত প্রবেশ করিয়াছিলেন। রুক্মিণীর আখ্যায়িকায় বড়ায়ের স্থান নাই, অথচ তাহার আবির্ভাবের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যে বড়াই যেন সর্ব্ব অভিনয়ের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ণনাও এইরূপ—

হাতে নড়ি কাঁখে ডালি নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান॥

অন্যত্র—

আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়ায়ির বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাটে প্রেমরসে ভাসে॥

বড়ায়ের এই চিত্র পরবর্ত্তীকালে যে পাথরের উপরেও খোদিত হইয়াছিল তাহার সন্ধান দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বৃহৎবঙ্গে প্রদান করিয়াছেন। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত পটুয়া-সঙ্গীতের গানে এবং পটে বড়াইকে প্রত্যক্ষ করা যায়। অতএব শিল্পী ও চিত্রকরেরাও বড়াইকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ভবানন্দের হরিবংশে এবং জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের পদে অপ্রত্যাশিতরূপে আদি-অন্ত সম্বন্ধবিহীন বড়ায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত পদাবলীতে দানলীলা ও নৌকালীলার প্রসঙ্গেই মাত্র বড়ায়ের সমাবেশ রহিয়াছে। পদকল্পতরুর তৃতীয়শাখার পঞ্চবিংশ এবং ষড়বিংশ পল্লবে "মথুরায় গোরস-বিক্রয়-ছলে বড়াইর সহিত শ্রীরাধার অভিসার", "বড়াইর ও শ্রীকৃষ্ণের সপরিহাস উক্তি-প্রত্যুক্তি", "বড়াইর প্রতি শ্রীরাধার কৃত্রিম ভৎর্সনা ও নৌকায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন" প্রভৃতি পর্য্যায়ে যে সকল পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে তাহাতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের আদর্শই প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাস-কর্ত্তৃক সৃষ্ট বড়াই কবি, শিল্পী ও মহাজনগণের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহার আবির্ভাবের সার্থকতা প্রমাণিত করিতেছেন।

তৃতীয়তঃ গ্রন্থের সরসতা। লোকোত্তর চমৎকারিত্বে রসের সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতেও দেখা যায় যে; চণ্ডীদাসের দানলীলাদি এবং বড়াই বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। রসের আস্বাদন না পাইলে কেহই ইহাদের এই প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। রসের অনুভূতি হইতেই কাব্যত্ব সিদ্ধ হয়, আর এই কাব্য-পুরুষ যে শব্দার্থ, অলঙ্কার-উপমাদির সমাবেশে প্রকাশভঙ্গীর অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব হইতে সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব প্রথমতঃ আমরা শব্দার্থ অলঙ্কারাদি কাব্যের বাহ্যিকরূপ লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। পুরাণ-পাঠে কৃষ্ণের রূপের অনুভূতি কবির মনে জন্মিয়াছে, তাহা তিনি ভাষায় এইভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন—

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুচ্ছ দিল সুবেশ॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।
কণ্ণযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল॥
মাণিক-রচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।
সজল জলদ-রুচি জিণি দেহকান্তী॥ ইত্যাদি

উৎপ্রেক্ষা-উপমাদির ব্যবহারে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য দিয়া এই যে সরল, তরল, প্রাঞ্জল ভাষায় পঙ্‌ক্তিগুলি রচিত হইয়াছে, ইহাতে আনন্দের উদ্রেক করিয়া রসবোধ জন্মাইয়া থাকে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। আবার রাধার রূপ বর্ণনায়—

নীল জলদসম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা॥
শিশত শোভএ তোর কাম-সিন্দূর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূর॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডল-মণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা॥ ইত্যাদি

ইহাও উক্তপ্রকার বিশিষ্টতাসম্পন্ন। ইহা সংস্কৃত রচনার অনুকরণ হইতে পারে, কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গিমার সরসতার দিক্ দিয়া বিচার করিলে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি অপেক্ষাও মধুরতর হইয়াছেন।

অন্যত্র—

ময়ূর-পুছেঁ বান্ধিআঁ চুড়া
তাত কুসুমের মালা।
চন্দন-তিলকেঁ শোভিত ললাট
যেহ্ন চাঁদ ষোলকলা॥

কাজলেঁ উজ্বল নয়ন যুগল
খঞ্জনকে উপহাসে।
ঈষত হাসত ভুবন-মোহন
যেহ্ন কমল বিকাশে॥
ফুলের ধনু হাতে করি কাহ্ন
গেলা বৃন্দাবন-পাশে।
রাধার বচন- আনলেঁ দগধ
মনত করিয়া রোষে॥
হিরাঞঁ জড়িত রতন কুণ্ডল
মণ্ডিত গণ্ড যুগলে।
সিন্দূর লুলিত মুকুতা পাঁতী
সম দশন উজলে॥
মনোহর হার কেয়ূর পত্রী
আঙ্গদ যুগল হাতে।
রতন কঙ্কন অতি বিতপন
পত্রীল জগতনাথে॥
সকল শরীর চন্দনে লেপিল
নেত ধড়ী পরিধানে।
তাহার উপর মণি বিরচিত
কিঙ্কিনী বান্ধিল কাহ্নে॥
কর্পূর-বাসিত তাম্বুল বদনে
হাথে কনকের বাঁশী।
কদম-তলাত কোমল পাতত
থাকিলা কাহ্নাঞ বসী॥
শীতল সমীর জন-মনোহর
কোকিল পঞ্চম গাএ।

সব তরুগণ বিকাস কুসুম
ভ্রমর কাঢ়এ রাএ॥ ইত্যাদি

সরল, তরল ও প্রাঞ্জল রচনার দৃষ্টান্ত এই পদে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। চৈতন্যদেব ইহা আস্বাদন করিতে পারিতেন না কি? নিশ্চয়ই তথাকথিত অশ্লীল রচনা তিনি পছন্দ করিতেন না, কিন্তু এই জাতীয় পদ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রচুর পাওয়া যায়। বৈদর্ভিরীতির ইহা শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আবার প্রতিভাশালী কবিগণ বর্ণনার বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া দক্ষ শিল্পীর ন্যায় একটিমাত্র রেখার টানে একটি চিত্রকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন। চণ্ডীদাসের রচনায় ইহারও নিদর্শন পাওয়া যায়, যথা—

রাধার রূপ-বর্ণনায়—

কনক নিকস সম তনুকান্তি-লীলা।

এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন-দৃশ্যে—

যেহ্ন নিকষত শোভে কনক রেহা।

অথবা—

নীল মেঘে যেহ্ন পড়এ বিজুলী।
শক্রের ধনু যেহ্ন উয়িল আকাশে। ইত্যাদি

ভাব-অনুযায়ীও রচনার রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিরহখণ্ডে কৃষ্ণকে দূর হইতে দেখিয়া রাধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, পুনরায়—

চেতন পাইআঁ বড়ায়ি-চরণ
ধরিল আতি যতনে।
বুলিতেঁ নারোঁ বচন বড়ায়ি
না চলে মোর চরণে॥

* * * *

মণে পরিভাবী মোরে দয়া করী
বড়ায়ি চল আপনে।

ভাল মতেঁ মোর দুখ কথা কহ
নিদুখ কাহ্ন-চরণে ॥

এই "নিদুখ" শব্দটিতে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য হেতু চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে এবং অন্যত্রও কবি শব্দ-নির্ব্বাচনে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বাণখণ্ডে পুষ্পবাণে আহত হইবামাত্র হঠাৎ কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া রাধা বলিয়া উঠিলেন—

এথাঞিঁ রহিআঁ বড়ায়ি সজাইবোঁ ঘর।
এথাঞিঁ আনাইবোঁ বড়ায়ি নান্দের সুন্দর ॥

*   *   *   *

এথাঞিঁ যমুনা বড়ায়ি এথাঞিঁ বৃন্দাবন।
এথাঞিঁ আণাঅ মোর নান্দের নন্দন ॥

*   *   *   *

এ নব যৌবন বড়ায়ি ময়মত করী।
লাজ-আঙ্কুশেঁ তাক নিবারিতেঁ নারী ॥
কত সহিব এ বড়ায়ি ল।
কুসুমশর-বাণ কত সহিব ॥ ধ্রু ॥

এখানে "এথাঞিঁ" শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে রাধার দৃঢ় সঙ্কল্পেরই ধারণা জন্মে। এতদিন পরে মুগ্ধা রাধার যৌবনের অনুভূতি জাগ্রত হইয়াছে, বাসনার তীব্রতা আর তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। ধ্রুব পদটিতে রাধার ব্যাকুলতা অধিকতর স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গীতগোবিন্দের সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদেও চণ্ডীদাস অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রসময় দাসের রচনার সহিত তুলনা করিয়া উভয়ের পার্থক্য এখানে প্রদর্শিত হইল। যথা, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥

না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোহ্মার শঙ্কেতবেণু বাজাএ যতনে॥

তুলনীয়—

রতি-সুখ-অভিসারে কৃষ্ণ হৈলা গত।
মদন-মোহন বেশ করি অভিমত॥
নামের সহিত কৃষ্ণ সঙ্কেত সুতান।
বেণুর বাজনাসহ করিছেন গান॥
গমনেতে বিলম্ব না কর নিতম্বিনি।
অনুসর হৃদয়ের নাথ বাক্য মানি॥

রসময় দাসের অনুবাদ

বিভিন্নতা এই যে, একজন জয়দেবের আহরিত সামগ্রী যথাযথ উদ্গীরণ করিয়াছেন, আর চণ্ডীদাস তাহা হজম করিয়া রসে পরিণত করিয়াছেন। অন্যত্রও ছন্দে ও ভাষায় কবির অনুবাদ মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, যথা—

তনের উপর হারে।
আল
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিণী রাধা চলিতেঁ না পারে॥
সরস চন্দন-পঙ্কে।
আল
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে॥

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে অনুবাদ-গ্রন্থের অভাব নাই। ধর্ম্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতির আখ্যায়িকা লইয়াও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিক মূল্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে

হইবে। বাঙ্গালার নিতান্ত সৌভাগ্য এই যে, এইরূপ শক্তিশালী কবি সেই আদি যুগেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের গুণের ব্যাখ্যা না করিয়া ইহার তথাকথিত দোষগুলি লইয়া আলোচনা করাই সঙ্গত। রসাভাসই এই গ্রন্থের সর্ব্বপ্রধান দোষ ইহা বলা হইয়া থাকে। কবির সময় হইতে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি, এবং ধর্ম্মজগতেও অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এই অবস্থায় আমাদের মনোমত মাপকাঠি লইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিচার করিতে যাওয়া আমাদেরই ভ্রান্তি মাত্র। তৎপরিবর্ত্তে কবির সংস্কার ও মূল পরিকল্পনার সন্ধান করিয়া কবিকে বুঝিতে চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ইহাতেই দোষের স্বরূপ ও তাহার কারণ নির্দ্ধারণের পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে।

"শ্রীকৃষ্ণের গোভারতমি, কথায় কথায় মারের ভয় দেখান, শালী সম্বোধন প্রভৃতি রসাভাস মনে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে।" কখন? যখন মহাভাব-স্বরূপিণী রাধার টাইপ (type) আমাদের মনোরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে, এবং শ্রীকৃষ্ণকেও আমরা ভক্তি-চন্দন-পূজিত বিগ্রহের প্রতীক রূপে গ্রহণ করি, নতুবা নহে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা অভিমান করিয়াছেন। কৃষ্ণ "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়াও তাঁহার মানভঙ্গ করিতে পারিলেন না। অবশেষে ভয় প্রদর্শন আরম্ভ হইল। কোন আধুনিক সমালোচক হয়তঃ বলিবেন যে, এখানে রসাভাসের সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ আদি রসাত্মক কাব্যে এইরূপ বীররসের আভাসমাত্রই দোষনীয়। কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রে মানভঞ্জনের জন্য প্রিয়বাক্য, সাম-দান-ভেদাদির পরে নতির বিধি রহিয়াছে। জয়দেব ইহাই অবলম্বন করিয়া "দেহিপদপল্লবের" ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহাতেও মানের উপশম না হইলে উপেক্ষা ও "রভসত্রাস-হর্ষাদি" দ্বারা রসান্তরের সৃষ্টি করিয়া ক্রোধের পরিসমাপ্তি করিতে হয়। তাই নতি ব্যর্থ হইলে কৃষ্ণ বলিতেছিলেন—"আমার লক্ষ টাকার ফুল বাড়ী তুমি ও তোমার সখীগণ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ, অতএব ইহার প্রতিবিধান না করিলে আমি তোমাকে বাঁধিয়া রাখিব।" শুধু ইহাই নহে—

যবেঁ তিরীবধে নাহী থাকে ডর।
তবেঁ আজি মারিআঁ পাঠাওঁ যমঘর॥

এই দর্পোক্তি চিত্তের বেদনাদায়ক কিনা ইহাই বিচার্য্য বিষয়। যে দুর্জ্জয়-মান নতিতেও পরিসমাপ্ত হয় নাই, তাহার স্রোত রোধ করিবার জন্য তদনুরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে হয়। তাই কবি এইভাবে রসান্তরের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন রোগ তাহার ব্যবস্থাও তদনুরূপ হওয়া উচিত। বিশেষতঃ যখন বুঝা যায় যে, ইহা সমস্তই কপট অভিনয় মাত্র (কারণ কবি এইভাবে রসান্তরের সৃষ্টি করিয়া পরে কৃষ্ণের প্রিয়বাক্য দ্বারাই মানের উপশম করিয়াছেন), তখন ইহাতে কবির কৌশলেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আবার পূর্ণ বয়স্ক কৃষ্ণের পক্ষে এই উক্তি অশোভনীয় হইত বটে, কিন্তু বার বৎসরের বালকের এই দর্পোক্তিতে হাস্য রসের সৃষ্টি করে। মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা শাস্ত্র গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিতেছি না, কারণ কবি কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে যদি তিনি স্বাভাবিকতা বা Realismএর সমাবেশ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহার কাব্য-রচনা সার্থক হইয়াছে। এখানে ভাব-বৃন্দাবনের কথা আনিয়া মনকে পীড়ন করিলে কবির উপর অবিচার করা হয়। Idealism বা আদর্শবাদের ধারণা যে কবির ছিল, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের অনেক স্থলেই ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। তথাপি কাব্য-রচনার জন্য তিনি Realism বা স্বাভাবিকতারই প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা মনে রাখিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রসাভাসের ধারণা দূরীভূত হইবে।

বাস্তবতার দৃষ্টান্তস্বরূপ চৈতন্যদেবের জীবনের একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে বসিয়া ব্যাখ্যা করিতেছিলেন যে, ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান বড়। একদিন চৈতন্যদেব তাঁহার নিকট ইহা শুনিয়া—

জ্ঞান বড় অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহু পাসরিল শচীর নন্দন॥
পিড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পড়িয়া॥

তৎপর নিজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি বলিলেন—

অজ, ভব, শেষ, রমা করে মোর সেবা।
মোর চক্রে মরিল শৃগাল বাসুদেবা ॥
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল।
মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল ॥ ইত্যাদি

(চৈতন্যভাগবত, মধ্যের উনবিংশে)।

এখানেও ভক্তের ভগবানকে আমরা সক্রিয় অবস্থায় পাইতেছি। রাধার ন্যায় মুগ্ধ অদ্বৈতের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত দানখণ্ডে বর্ণিত কৃষ্ণের উক্তিতে ও কার্য্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। ঐশ্বর্য্যের এই অভিব্যক্তিতে রসাভাসের কল্পনা করাও নিরর্থক। ভক্তির আদর্শ সৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণকে প্রেমের বিগ্রহরূপে পুষ্পচন্দন প্রদান করা যায় বটে, কিন্তু তাঁহার যাবতীয় মাধুর্য্যলীলার মধ্যে যে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকটিত রহিয়াছে তাহাত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সকল লীলায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাবই বিস্ফুরিত হইয়াছে, পরে তাহা হইতে মাধুর্য্য-রস নিষ্কাসিত হইয়াছে। এখন সেই মাধুর্য্যের ধারণা লইয়া রসাভাসের পরিকল্পনা সম্পূর্ণই অসঙ্গত। রস-শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করিয়া কবি যে এইভাবে "রসান্তরের" সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

এখানে রাধাকৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি যে কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ পথরোধ করিয়া যখন বলপ্রয়োগের ভয় দেখাইলেন, তখন রাধা বলিলেন—

ষোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে।
মাগু কিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে ॥

কৃষ্ণ বলিলেন—

ছাওআল না দেখ মোরেঁ মাথে ঘোড়া চুলে।
মুণ্ডে মুণ্ডে ভুসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে ॥

উত্তরে রাধা বলিলেন—

তোহ্মার বিরত কাহ্নাঞিঁ তিরীর উপর।
এতেকেঁ পাইল তোহ্মে মহত্ত্ব বিথর ॥

মহাভাবস্বরূপিণী রাধার ধারণা যাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে তাঁহারা যে এই উক্তি-প্রত্যুক্তিতে মর্ম্মাহত হইবেন তাহা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা যে পরস্পরের প্রতি প্রযুক্ত বিদ্রূপোক্তি মাত্র, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বয়স্ক পাঠকগণ বোধ হয় নিজের ঘরেও এইরূপ দর্পের কথা শুনিয়া থাকিবেন, এবং ইহার কি মূল্য আছে, তাহাও বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এখানে প্রধান বিচার্য্য বিষয় এই যে, রাধা এগার বৎসরের মুগ্ধা নায়িকা মাত্র, আর কৃষ্ণও তাহা অপেক্ষা বয়সে বেশী বড় নহেন। এইরূপ অবস্থায় উভয়ের এই উক্তি-প্রত্যুক্তি অণুমাত্রও অস্বাভাবিক হয় নাই। ছেলের মুখে বুড়ার কথা যদি অশোভনীয় হয়, তাহা হইলে বালিকা রাধার মুখে পূর্ণ যৌবনা রাধার উক্তিও অস্বাভাবিক হইত। ইহার প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি বিরহখণ্ডে রহিয়াছে, কিন্তু কবি এখানে মুগ্ধা রাধাকে প্রৌঢ়া রাধায় পরিণত করিয়া মূল পরিকল্পনার বহির্ভূত অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করেন নাই। ইহা তাঁহার চিন্তাশীলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোন কোন বিদ্বেষান্ধ পাঠক এই হাস্য-কৌতুকের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইতে পারেন বটে, কিন্তু বড়াই শ্রুতিমাত্র ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাধা যখন বলিলেন—"মাগুকিলে মারোঁ আজি যবেঁ করে বল," অমনি বড়াই বলিলেন—

এথাঁসি সুন্দরি রাধা কর কাঠদাপ।
তথাঁ গেলে হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ ॥

এখন এইভাবে লীলা বর্ণনার কারণ কি তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়। ভাগবতেও কৃষ্ণ ও গোপীগণের লীলা বর্ণিত রহিয়াছে, কিন্তু কবি সেই আদর্শ সর্ব্বাংশে গ্রহণ করেন নাই। ইহা তাঁহার স্বেচ্ছাকৃতই বলিতে হইবে, অজ্ঞতা বা অসাবধানতার পরিচায়ক নহে। ভাগবতে যখন রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়, তখন কৃষ্ণের বয়স নয় বৎসর মাত্র, অথচ সেখানে পূর্ণ যুবক-যুবতীর সম্ভোগ

লীলাই বর্ণিত রহিয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক হইলেও অপ্রাকৃত ভাব-বৃন্দাবনের আদর্শে ধর্ম্মশাস্ত্রের পক্ষে অশোভনীয় হয় নাই। সম্ভোগ বর্ণনায় চণ্ডীদাসও সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাকৃত লীলা বর্ণনার উদ্দেশ্যে কাব্যের প্রয়োজনে তিনি ঐ অস্বাভাবিকতা বর্জ্জন করিয়া রাধাকৃষ্ণকে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে স্থাপন করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। ঐ বয়সের বালক-বালিকার পক্ষে যাহা হওয়া উচিত, কবি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে রসাভাসের পরিকল্পনাও বৃথা, কারণ নিজের গৃহেও পাঠকগণ দেখিয়া থাকিবেন যে, অপরিণত বয়স্ক বালক-বালিকার ব্যবহারে রসাভাসেই রসসৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা কবির দোষ নহে, সমালোচকগণের ভ্রান্তি মাত্র। বদ্ধমূল সংস্কারবশতঃ কবিকে বুঝিতে চেষ্টা না করাতেই তাঁহার এই প্রাথমিক লীলা-বর্ণনা আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিতুষ্টি সাধন করিতে পারে নাই।

একজন আধুনিক সমালোচক (যাঁহার উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে) এই রসাভাসের অস্বস্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যোত্তর রসাদর্শে আমাদের মন পূর্ব্ব হইতেই আবিষ্ট, তাই বোধ হয় অস্বস্তি অনুভব করি। চণ্ডীদাসের যুগের পাঠকদের মনে নিশ্চয়ই কোন বিক্ষোভ জন্মিত না। Realism ও Idealism এর অদ্ভুত সংমিশ্রণকে তাহারা উপভোগ করিতে পারিত। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রস উপভোগ করিতে হইলে আমাদিগকেও সংস্কার-মুক্ত মনে চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের রসাবেষ্টনীতে কল্পনায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।" ইহার পরেই তিনি লিখিয়াছেন—"আমরা উপভোগ করিতে পারি না পারি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক রসিকগণ যে উপভোগ করিত তাহার প্রমাণ আছে। স্বয়ং রূপ-সনাতনই ইহার আদর করিতেন। শ্রীচৈতন্যের কথা ছাড়িয়া দিই, তিনি সমস্তই আপন মনের মাধুরী দিয়া মনের মত করিয়া লইতেন।" (প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য, ১০২ পৃঃ)। রসাভাস সম্বন্ধে সকল কথাই এখানে বলা হইয়াছে। রূপ-সনাতন ও চৈতন্যদেব ইহা আস্বাদন করিতেন। আমরা কি তাঁহাদের অপেক্ষাও রসজ্ঞ যে রসাভাসের কল্পনা করিয়া থাকি? সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও মহাপ্রভু পুরীতে বসিয়া রূপ-গোস্বামীর বিদগ্ধ-মাধবের শ্লোক লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন, অতএব তিনি

যতই ভাবোন্মত্ত হউন না কেন, কাব্যরসবোধের ধারণা যে তাঁহার তিরোহিত হইয়াছিল ইহা কল্পনা করা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মহাপ্রভুর নিয়ম ছিল—

গীতশ্লোক গ্রন্থ কিবা যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥
স্বরূপ শুনিলে যদি লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু-ঠাঞি করায় শ্রবণ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥

অন্ত্যের পঞ্চমে।

যে রসাভাস এখন আমাদিগকে পীড়ন করে, তাহা বেদনাদায়ক বলিয়া অনুভব করিলে তিনি কখনও একাধিকবার ইহার অভিনয় করিতেন না, অথবা পরবর্ত্তী সাহিত্যেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। ইঁহাদের সঙ্গে আমাদের এই যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, আমরা Idealism বা আদর্শবাদের ধারণা লইয়া Realism বা বাস্তবতার পরিমাপ করিতে চাই, এবং আমাদের এই ভ্রান্তি কবির উপর আরোপিত করিয়া আমরা রসাভাসের কল্পনা করিয়া থাকি। আর একটি বিষয়ও বিবেচনা করা প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কাব্য ও নাটকের অপূর্ব্ব সমাবেশ রহিয়াছে। নাটকে চাই Action বা ঘটনার বহুলতা ও বৈচিত্র্য। এইজন্য কবিকে প্রধানতঃ বাস্তবতার পরিস্থিতিই সৃজন করিয়া লইতে হইয়াছে।

এখন আমরা দানখণ্ডের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। ইহা লইয়া আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মনে রাখিতে হইবে যে, এই দানখণ্ডই সনাতন কাব্য-পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন, এবং মহাপ্রভুও ইহার অভিনয় করিয়াছিলেন, অথচ ইহার মধ্যেই তথাকথিত রসাভাসের দৃষ্টান্ত অধিক পাওয়া যায়। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা আদি রসাত্মক কাব্য। জয়দেবের গীতগোবিন্দ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, কিরূপে এই রসের সৃষ্টি করিতে

হয়, এবং তাহা উপভোগ্য কি না। দ্বিতীয়তঃ নাট্যকাব্যের রীতিতে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচিত হওয়াতে ইহাতে ঘটনা-বহুলতা ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ অতীব প্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ মুগ্ধা রাধা এই খণ্ডেই প্রথমে কৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়াছেন। অতএব কৃষ্ণের পক্ষে এখানেই রাধার ভ্রান্তি দূরীভূত করিবার প্রচেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া স্বাভাবিক। অবশেষে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কবি রসশাস্ত্র-সম্মত প্রথায় হাস্য রসকে আদিরসের পরিপোষক করিয়া সমগ্র গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। এখন ইহার তথাকথিত রসাভাসের কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করা যাউক। নন্দঘোষের সম্পর্কে রাধা যে কৃষ্ণের মাতুলানী তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। অথচ এই মাতুলানীর প্রেম-লীলা লইয়াই বিরাট কাব্য-সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। কত ছলে, কত কৌশলে উভয়ের মিলন পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইয়াছে—কত অভিসার, মানের প্রকারভেদ, খণ্ডিতার বক্রোক্তি প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভূত রহিয়াছে। লোকে যে ইহা আস্বাদন করে, তাহা রুচির দিক্ দিয়া, কি রসের দিক্ দিয়া? কৃষ্ণের প্রেম-নিবেদন শুনিয়া রাধা বলিতেছিলেন যে, তিনি তাঁহার মাতুলানী, অতএব কৃষ্ণের প্রস্তাব অবৈধ বলিয়া পরিত্যজ্য। কিন্তু কৃষ্ণ বলিতেছিলেন যে, রাধার ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে, কারণ তিনি তাঁহার মূল প্রকৃতি লক্ষ্মী, আর তিনিও বসুদেব ও দৈবকীর পুত্র, নন্দের পুত্র নহেন, অতএব মাতুলানী সম্বন্ধ তিনি স্বীকার করিতে পারেন না। এইভাবে উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে সমগ্র দানখণ্ডটি রচিত হইয়াছে। ইহাতেও পদাবলীর সহিত অণুমাত্রও বিরোধ নাই। পদাবলীতেও রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি মাত্র, এবং অভিমন্যুর স্ত্রী হিসাবে নন্দের পালিত পুত্র কৃষ্ণের মাতুলানী। বিভিন্নতার মধ্যে এই যে, পদাবলীতে আদর্শীভূত প্রৌঢ় প্রেমের বর্ণনা রহিয়াছে, আর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বাস্তবকতা, নাটকত্ব ও হাস্যরসের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। কৃষ্ণ বলিতেছিলেন—

মাঅ দৈবকী মোর মামা কংসাসুর।
তোহ্মার সম্বন্ধ কথা আনেক দূর॥

নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।
রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী ॥

শেষ পঙ্ক্তিতে কবি স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন যে, হাস্য-কৌতুকে কৃষ্ণ ইহা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রধান উদ্দেশ্য রাধার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরিত করা। তাঁহার মামা কংস, অভিমন্যু নহেন, অতএব রাধার সহিত কোন অবৈধ সম্বন্ধ নাই। শালী শব্দে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। ইহা অপরিণত-বয়স্ক বালকবালিকার হাস্য-কৌতুক মাত্র। তবে যাহারা আদর্শের মোহে অভিভূত থাকিয়া বিচারের সব দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সনাতন গোস্বামী অন্য বিবেচনা-নিরপেক্ষ রসের ধারা অনুসরণ করিয়াই ইহাকে কাব্য-পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ বলিতেছিলেন যে পরদারে পাপ নাই, এবং ইহার সমর্থনে পুরাণ হইতে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সহিত রাধার উত্তরটি মিলাইয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা নিছক রঙ্গ-রস মাত্র। রাধাও তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছেন—

আহ্মা সনে হেন তেজ পরিহাস।

কিন্তু বিরহখণ্ডে বিপরীত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। বাণখণ্ডে সম্মোহন-বাণে আহত হইবার পরেই রাধা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া পড়িয়াছেন। দানখণ্ডে রাধার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরিত করিতে কৃষ্ণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তখন রাধা বলিয়াছিলেন—

সকল পুরুষ কথা মিছা কহ তোহ্মে।
কথাঁ কাহ্নু হরি তোহ্মে কথাঁ লক্ষ্মী আহ্মে ॥

আর বিরহখণ্ডে সেই রাধাই বলিতেছেন—

নান্দের নন্দন কাহ্নাঞি তোহ্মে বনমালী।
ত্রিভুবনে গোসাঞি তোহ্মে অধিকারী ॥
নরসিংহরূপে তোহ্মে হিরণ্যবিদারী।
কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল-তরী ॥ ইত্যাদি।

যে কৃষ্ণ পরদারে পাপ নাই বলিয়াছিলেন, তিনিই এখন বলিতেছেন—

কমণ ঝগড় রাধা পাতসি তোঁ।
পরনারী হরণ না করোঁ মো ॥

দানখণ্ডে রাধার মাতুলানী সম্বন্ধ কৃষ্ণ স্বীকার করেন নাই, আর বিরহখণ্ডে তিনিই বলিতেছেন—

বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর।
মায় জসোদা পুষিলেক দিঞাঁ খীর ॥
তেকারণে মামী তোহ্মা তেজে বনমালী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিঞাঁ বাসলী ॥

অতএব দানখণ্ডের যাবতীয় উক্তি যে হাস্য-কৌতুকের লীলাখেলা মাত্র তাহা বুঝিতে কোনই কষ্ট হয় না। পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য বিরহখণ্ডে রাধাকে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। এই ভাবে রাধার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া কবি গ্রন্থের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা হইতে কবির মূল পরিকল্পনার সন্ধান পাওয়া যায়। রাধা ও কৃষ্ণকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকবালিকারূপে গ্রহণ করিয়া তিনি বাস্তবতার পরিস্থিতিতে ঘটনা-বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া নাটকীয় রীতিতে হাস্যকৌতুকপূর্ণ এই আদি-রসাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অতএব বিরহখণ্ডের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তথাকথিত রসাভাসের ধারণা দূরীভূত হইতে পারে। চৈতন্যপ্রমুখ যাঁহারা এই গ্রন্থের আদর করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও এইভাবে ইহার রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—"যে কাব্যে অনুভূতি যত গভীর, যত ব্যাপক, যত মূর্ত্ত, বিশদ এবং স্ফুট, সেই কাব্যেরই মধ্যে কবি আপনার প্রাণের দরদকে সুব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কবির কাছে আমরা কোন শিক্ষা চাই না, তাঁহার কল্পনার সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে চাই না, আমরা শুধু এইটুকু চাই যে, তাঁহার হৃদয়ে একটা দরদ আছে, এবং তাঁহার কাব্যে তাঁহার সেই দরদ এমনভাবে অভিব্যক্ত

হইয়াছে যে, তাহার স্পর্শে আসিয়া শ্রোতা বা দর্শকের চিত্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া উঠে। এই দরদের অভিব্যক্তিকে ক্রোচে personality বলিয়াছেন। এই personality'র আত্মাভিব্যক্তির সহিত নৈতিক চরিত্রগত উৎকর্ষের কোন সম্বন্ধ নাই। সুখে, দুঃখে, ভয়ে, ক্রোধে, লজ্জায়, বীভৎসতায়, লোলুপতায়, লালসায় যে রকম করিয়াই হউক না কেন, একটি প্রাণ কাব্যের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে কিনা, ইহাই প্রধান লক্ষ্য।" (ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিত সাহিত্য-পরিচয়, ১০১-২ পৃঃ)। অতএব আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসের ব্যতিক্রম হইলেও তাহাতে কাব্যের কাব্যত্ব নষ্ট হয় না। আর অশ্লীলতা? ইহাত অর্ভকগণের কাল্পনিক ভ্রান্তি মাত্র, নতুবা রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থকে মণিমুক্তাখচিত রাজকণ্ঠের হারের সহিত তুলনা করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পাঠ করিয়া যদি কোন আধুনিক সমালোচকের এই ধারণা জন্মিয়া থাকে যে—"এ গোবিন্দ রীতিমত গোঁয়ার গোবিন্দ। গোপপল্লীতে প্রতিপালিত হইয়া অমার্জ্জিত চরিত্রের সবলকায় কিশোর", তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে কবির পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে চাই। বৈষ্ণব কবিতায় তিনি য়াছেন—

যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবক যুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।
দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্য্যের দস্যু তা'রা
লুটে পুটে নিতে চায় সব।

এই আদর্শই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধান চরিত্র কে:—রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়াই এই তিনটি াত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে গ্রন্থের

প্রথম ভাগে বড়াই কৃষ্ণের, এবং শেষভাগে রাধার দূতীর কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহাদের নিয়োগে চলিতে হইয়াছে বলিয়া প্রধান চরিত্রের বিচারে বড়ায়ের দাবী স্বীকৃত হইতে পারে না। বাৎস্যায়নের কামসূত্র অবলম্বনে এই বড়ায়ের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। দূতীকার্য্যে বিধবা, শিল্পকারিণী (বিদ্যাসুন্দর দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি প্রশস্তা। দূতী সচ্চরিত্রার আকারে রমণীর সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিবে (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়াইকে রাধার আত্মীয়া করিয়াই লওয়া হইয়াছে)। দূতী নায়ক-প্রেরিত উপঢৌকন তাম্বূলাদি (তাম্বূলখণ্ড দ্রষ্টব্য) প্রদর্শন করিয়া নায়কের প্রেমবিহ্বল-অবস্থার বর্ণনা, এবং মিলন-কৌশল কীর্ত্তন করিবে (কাম-সূত্র, পঞ্চম অধিকরণ, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া কবি বড়ায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব পরকার্য্যে নিয়োজিতা দূতী পরামর্শ দান করিলেও প্রধান চরিত্ররূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। অবশিষ্ট রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে কে প্রধান চরিত্রের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন ইহাই বিচার্য্য বিষয়। গ্রন্থের প্রথমভাগেই দেখা যায় যে, রাধার রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণ রাধাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। শাস্ত্রেও আছে যে, লোকের সুকৃতি থাকিলে ভগবান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাহাকে আকর্ষণ করেন। কিন্তু আকর্ষণ করিলেই তাহাতে আমরা প্রথমে সাড়া দেই কি? মুগ্ধা রাধাও প্রারম্ভে ইহাতে বিচলিত হইয়া পড়েন নাই। একটা সংসারে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন—তাহার স্বামী আছে, ধর্ম্ম আছে, সংস্কার আছে—অতএব রাধা ভাবিলেন এই সকলই সৎ, কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ অসৎ। অতএব কৃষ্ণের প্রস্তাবে রাধা সম্মত হইতে পারেন নাই। গ্রন্থের এই অংশে রাধাই কৃষ্ণের প্রেরণা যোগাইয়াছেন—রাধার প্রেম লাভ করাই যেন কৃষ্ণের জীবনের ব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব এখানে কৃষ্ণই নানা কৌশলে রাধাকে আকর্ষণ করিতেছেন। বড়াইকে দূতী নিযুক্ত করিয়া তাম্বুল-প্রেরণ, এবং বড়ায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া দানলীলা-নৌকালীলা প্রভৃতির সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই রাধার জন্য কৃষ্ণের ব্যাকুলতা উপলব্ধি করা যায়। এই অবস্থা বাণখণ্ড পর্য্যন্ত চলিয়াছে, কিন্তু ইহার পরেই গ্রন্থের বিপরীত পরিস্থিতি আরম্ভ হইয়াছে,

এবং তাহার ফলেই রাধার আক্ষেপের সূচনা।[১] রাধিকা যশোদার নিকটে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন। ইহাতে অপমানিত হইয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন—

আহ্মার করিল রাধা বড়ই খাঁখার।
আবসি করিব প্রতিকার॥
মরমেঁ হাণিবোঁ তারে মনমথবাণে।

আর ইহাই সমর্থন করিয়া বড়াই বলিতেছে—

ত্রিজগতনাথ তোহ্মে দেব বনমালী।
তোহ্মাক না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী॥
উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাক যতনে।

এইরূপে ফুলবাণে আহতা হইবার পরেই রাধা কৃষ্ণপ্রেমময়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অনেকে হয়তঃ এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, রাধার অসম্মতিতে কৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। গ্রন্থ-পাঠে ইহা সমর্থিত হয় না। কৃষ্ণের প্রতি পরম বিরাগবতী রাধাকে কবি ধীরে ধীরে কৃষ্ণপরায়ণা করিয়াছেন মাত্র, এবং এইজন্য যে দানলীলাদির সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। দানখণ্ডে উভয়ের হাস্য-কৌতুকপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তির পরে রাধা বলিতেছেন—

সুন্দর কাহ্নাঞি তবেঁ যাওঁ তোর কোল
কভো না লঙ্ঘিবেঁ যবেঁ আহ্মার বোল॥

১। এই সম্বন্ধে Arlstotle লিখিয়াছেন—"Reversal of the situation is a change by which the action veers round to its opposite subject. Two parts of the Plot—Reversal of the situation and Recognition—turn upon surprises. A third part is the scene of suffering, (Aristotle's Poetics, translated by S. H. Butcher, pp. 41,43). চণ্ডীদাস এরিষ্টটলের গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন না, অথচ ঘটনার সমাবেশে তিনি এইভাবে বিপরীত পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। প্রকৃত কবি-মানস যে তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ইহাই রাধার প্রথম আত্ম-সমর্পণ, এবং কৃষ্ণের সংসর্গ লাভ। কবি গাহিয়াছেন—"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না?" একবার ভগবানের অনুভূতি লাভ করিতে পারিলে, পুনরায় তাঁর সঙ্গ লাভের জন্য প্রাণ এইরূপই ব্যাকুল হইয়া পড়ে। বিপদে পড়িলে ত কথাই নাই, মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ভগবানের শরণাপন্ন হয়। নৌকাখণ্ডে যখন রাধার নৌকা ডুবিয়া গেল, তখন—

ডর পায়িঁ রাধা কাহ্নাঞিঁকে মাঙ্গে কোল।

প্রাণের দায়ে রাধার এই দ্বিতীয় আত্মসমর্পণ। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, রাধার এখন কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবতী হওয়াই স্বাভাবিক। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারখণ্ডে। কৃষ্ণ যখন লজ্জায় ভার বহিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তখন রাধা বলিলেন—

লাজ করিলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারাইবেঁ কাজ।
পাছে দোষ আহ্মারে না দিহ দেবরাজ॥

এবং—

মনসুখ ভৈলেঁ বোল ধরিবোঁ তোহ্মার।

ছত্রখণ্ড অসম্পূর্ণ, কিন্তু বোধ হয় যে, এখানেও রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার ফলে বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা নিজেই কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার কৌশল বড়াইকে বলিয়া দিতেছেন—

মোর সব সখির সাসুড়ী থান গিআঁ।
হেন বোল তা সমাক কিছু ভরছিআঁ॥
বিকি নহে আইহনের মাএর কারণে।
তাক ভরছিলেঁ বহু ঝি দহী বিকণে॥

ইত্যাদি।

প্রচলিত পদাবলীর দানখণ্ডে রাধা এইরূপ কৌশলেই কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য অভিসার করিয়াছিলেন। কিন্তু রাধার মনের আকুতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে কালিয়দমনখণ্ডে। কৃষ্ণ দহে ঝাঁপ দিয়াছেন দেখিয়া

রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, সেইদিন তিনি কুক্ষণে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন—

তার ফলেঁ মোর পরাণ পতী।
মোক ছাড়ী কাহ্নাঞিঁ গেলা কতী॥

এবং—

হৃদয়ত ঘাঅ দিআঁ রাধা গোআলিনী।
করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী॥
কভোঁ না লঙ্ঘিব আর তোহ্মার বচন।
উঠ উঠ জলে হৈতেঁ নান্দের নন্দন॥ ইত্যাদি

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এখন কৃষ্ণের জন্য রাধার স্থায়ী রতির উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সংসারে ত অনেকে ভগবানের প্রতি আসক্তিপরায়ণ রহিয়াছেন, অথচ তাঁহারা সংসার ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে, সংসারাসক্তি অতিক্রম করিবার মত ঈশ্বর-প্রীতি তাঁহাদের মনোরাজ্যে উদিত হয় নাই। যে মোহের বশে তাঁহারা সংসারে আবদ্ধ থাকেন, সেই মোহই ভগবানের প্রতি আরোপিত হইলে ভববন্ধন লোপ পায়। ভগবদাকর্ষণের একটা মাদকতা আছে, যাহার আস্বাদন লাভ করিয়া চৈতন্যপ্রমুখ ভক্তগণ অবহেলায় সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

তাই কবি বাণখণ্ডে রাধাকে সম্মোহন-বাণে আহত করিয়া তাঁহার সকল দ্বিধা ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। ইহার পরেই রাধাকে কৃষ্ণের অনুসন্ধানে ছুটিতে হইয়াছে। প্রচলিত পদাবলীতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাধা পূর্ব্ব-রাগবতী হইয়াছেন, আর বড়ু চণ্ডীদাস বাণখণ্ডের পরে বংশীখণ্ডে রাধাকে বংশী-ধ্বনি শ্রবণ করাইয়াছেন। এখানে ভগবানের আহ্বান কানে আসিয়া তাঁহাকে উন্মাদিনী করিয়া দিয়াছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বংশীখণ্ডে রাধার প্রেম যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রচলিত পদাবলীতে রাধা-প্রেমের প্রারম্ভ মাত্র সূচিত হইয়াছিল।

রাধা মুগ্ধা বলিয়া যে গ্রন্থের প্রথম ভাগে কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার বিরাগ বর্ণিত হইয়াছে, ইহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। বাণখণ্ড পর্য্যন্ত বর্ণিত আখ্যায়িকায় সর্ব্বত্রই রাধাকে কৃষ্ণপরায়ণা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এখানে কৃষ্ণই অধিকতর সক্রিয়, নানা কৌশলে তিনি রাধাকে আকর্ষণ করিতেছেন। অতএব বাণখণ্ড পর্যান্ত আমরা রাধার প্রাধান্যেরই পরিচয় প্রাপ্ত হই। সম্মোহন-বাণে আহত হইবার পরে রাধাই কৃষ্ণকে খুঁজিতেছেন। এখন তাঁহার মোহ দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, ভগবদ্‌প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখন বড়াই আর কৃষ্ণের দূতী নহেন, রাধার দূতী। রাধার নির্দ্দেশে তিনি কৃষ্ণের অনুসন্ধানে ছুটিতেছেন। ইহাই ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য। তিনি আকর্ষণ করিয়া লোককে গৃহ হইতে বহির্গত করেন, তারপর আরম্ভ হয় তাহার পরীক্ষা। সাধকের ভক্তি ও শক্তির পরীক্ষা না করিয়া তিনি কাহাকেও ধরা দেন না। তাই বিরহখণ্ড রাধার আক্ষেপেই পরিপূর্ণ, কৃষ্ণ বহু সাধ্য-সাধনার পরে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইতেছেন মাত্র। রাধার এই পরিণতি প্রদর্শন করাই যে কবির উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধাকেই প্রধান চরিত্ররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। গ্রন্থখানি খণ্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে, কিন্তু যেভাবে বড়াই যাইয়া মথুরায় কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তাহার দৌত্যে পুনরায় রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। অর্থাৎ কঠোর পরীক্ষার পরে ভক্তিমতী রাধা পুনরায় কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া চরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নাটকীয় পরিস্থিতি :—সকল নাটকেরই প্রধান বিশেষত্ব এই যে, নাট্যকার থাকিবেন প্রচ্ছদপটের অন্তরালে, এবং তাঁহার যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া পাঠকের নিকট প্রেরণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রধানতঃ এই আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনটি মাত্র চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। জন্মখণ্ডের পরে সমগ্র গ্রন্থই রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ের পরস্পর কথোপকথনে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই প্রকৃতপক্ষে নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এই

নাটকীয় পরিস্থিতি চৈতন্যদেবের সময় হইতে যে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়, চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক একাধিকবার দান-লীলার অভিনয় হইতে। রাধা ও তাঁহার সখীগণ বড়ায়ের সহিত মথুরায় দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দান গ্রহণ করেন। এই অভিনয় হইয়াছিল শান্তিপুরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক উন্মুক্ত প্রান্তরে, কদম্ববৃক্ষের সন্নিকটে। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে অবস্থান কালে তাঁহার ভক্ত চন্দ্রশেখরের গৃহেও ভক্তগণসহ এইরূপ অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহা প্রায় চারিশত পঞ্চাশ বৎসর পুর্ব্বের ঘটনা। চৈতন্যভাগবতের মধ্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বৃন্দাবনদাস ইহাকে লক্ষ্মীনৃত্য আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, যথা—

মধ্যখণ্ড-কথা ভাই শুন একমনে।
লক্ষ্মী-কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে॥

তথাপি পরবর্ত্তী বর্ণনা পাঠে বুঝা যায় যে, এই উপলক্ষে প্রকৃতপক্ষে নাটকীয় অভিনয়ই হইয়াছিল, যথা—

একদিন প্রভু বলিলেন সবা স্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে॥
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জ কর গিয়া॥
শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটসাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সবাকার॥

এই বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মহাপ্রভু বিবিধ অঙ্কে বিভক্ত করিয়া এই নৃত্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে সংস্কৃত নাটকের অভাব নাই, মহাপ্রভু যে ঐ সকল গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। অতএব "অঙ্কের বন্ধনে" এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, এই নৃত্য সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে

বিবিধ অঙ্কে বিভক্ত করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একটির পর আর একটি নৃত্য কি পর্য্যায়ে অনুষ্ঠিত হইবে তাহা পূর্ব্বেই চৈতন্যদেব স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। শঙ্খ, কাঁচলী, পাটসাড়ী ও অলঙ্কার প্রভৃতির উল্লেখে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভূমিকা-অনুযায়ী সাজ-সজ্জা করিবার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত অভিনয়ের উপযোগী একটি রঙ্গমঞ্চও নির্ম্মিত হইয়াছিল বুঝা যাইতেছে, যথা—

সেইক্ষণে কথিয়ার চান্দোয়া টানিয়া।
কাচ সজ্জ করিলেন সুছন্দ করিয়া॥

অধুনা যেমন অভিনয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণের মুদ্রিত পত্রিকা দর্শকগণের বুঝিবার সুবিধানের জন্য বিতরিত হইয়া থাকে, সুকৌশলে সেই উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, যথা—

সর্ব্বথা ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য।

ইহাতে মনে হয় আচার্য্য মহাশয় বিবিধ অঙ্কের একটা নির্ঘণ্ট রঙ্গমঞ্চের চতুর্দ্দিকস্থ ভিত্তি-গাত্রে লিখিয়া দিয়াছিলেন। সাজ-সজ্জা করিবার জন্য পৃথক্ গৃহও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, যথা—

গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।

এইরূপ সুবন্দোবস্তের পরে অভিনয়ের দ্বিতীয় প্রহরে অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্কে ব্রহ্মানন্দ বড়াই বুড়ীর সাজে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন, যথা—

সুপ্রভা তাহার সখী করি নিজ সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে রঙ্গে॥
হাতে নড়ি কাঁখে ডালি নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান॥
ডাকি বলে হরিদাস কে সব তোমরা।
ব্রহ্মানন্দ বলে যাই মথুরা আমরা॥

অন্যত্র—

হেনই সময়ে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি বেশধর॥

আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে প্রেম রসে ভাসে॥

ব্রহ্মানন্দ এবং নিত্যানন্দ উভয়েই বড়াইর বেশে অভিনয় করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, বড়াই বুড়ী যেন সর্ব্ব অভিনয়ের অঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাই হউক, বেশ দেখিয়া মহাপ্রভুকে কেহই চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু নিত্যানন্দ বড়াই সাজিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গে রমণীর বেশে সজ্জিত হইয়া মহাপ্রভুই যে আসিয়াছেন, ইহা সকলে অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন, যথা—

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু প্রভুর বড়াই।
তার কাছে প্রভু আর কিছু চিহ্ন নাই॥
অতএব সভেই চিনিলেন প্রভু এই।
বেশে কেহ লখিতে না পারে প্রভু সেই॥

এই অভিনয়ে মহাপ্রভু কখনও রুক্মিণীর, কখনও শ্রীরাধার, কখনও চণ্ডীর, কখনও মহাযোগেশ্বরীর ভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে॥

অতএব তিনি কখন কি ভাবে অভিনয় করিতেছেন তাহা বুঝিবার উপায় কি?

কখন বোলয়ে—"বিপ্র! কৃষ্ণ কি আইলা।"
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা॥
ক্ষণে বোলে—"চল বড়াই! যাই বৃন্দাবনে।"
গোকুল-সুন্দরীভাব বুঝিয়ে তখনে॥

বাঙ্গালা নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ইংরেজগণের অভিনয়ের অনুকরণে বাঙ্গালা নাট্যশালা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বর্ত্তমান যুগের কথা। এই সময়ে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহাই মাত্র বলা যাইতে পারে। নূতন আদর্শে, নব প্রেরণায় ইহা নবতমরূপ

পরিগ্রহ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু অধুনা অবলম্বিত নাটকীয় অভিনয়ের যাবতীয় বিশেষত্ব চারিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত এই নৃত্যে পরিদৃষ্ট হইতেছে। ইহাকেই বাঙ্গালা অভিনয়ের প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অধিকন্তু রুক্মিণী, চণ্ডী প্রভৃতির আখ্যায়িকা আমরা প্রাচীন পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হই। ঐ সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত রহিয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল পৌরাণিক আখ্যায়িকার সহিত মহাপ্রভু বড়ায়ের উপাখ্যান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকেও সমপর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন। এই জন্য সনাতন গোস্বামী গীতগোবিন্দাদি সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত চণ্ডীদাসের দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদির উল্লেখ করিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই।

যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে নাটকীয় অভিনয়ের উপযুক্ত করিয়া রচিত হইয়াছে তাহা এই নৃত্যের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। এক একটি পদ এক একজন পাত্রপাত্রীর উক্তি লইয়া রচিত, আবার অনেক পদে একাধিক ব্যক্তির উক্তি-প্রত্যুক্তি রহিয়াছে। এইভাবে কবি কাব্য ও নাটকের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস স্বীয় প্রতিভাবলে কাব্য রচনার এই রীতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও কবির চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সরস হাস্য-কৌতুকের মধ্য দিয়া কবি যে রস পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহার মাদকতায় মহাপ্রভুও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। পরবর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যও যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এই প্রভাব অস্বীকার করিতে পারে নাই, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত একটি উল্লেখ হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, রামমোহন রায়ের সময়েও বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান অভিনীত হইত।

এ পর্য্যন্ত আমরা নাটকের বহিরঙ্গ রূপ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে কবি নাটকীয় পরিস্থিতির সংঘটন করিয়াও নিজের কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নাটকে চাই ঘটনা-বহুলতা, আকস্মিকতা, এবং পাত্র-পাত্রীর কর্ম্মপ্রবণতা। এই গ্রন্থে ইহাদের বিচিত্র সমাবেশ রহিয়াছে। বিরহখণ্ডে কৃষ্ণের জন্য রাধা ব্যাকুলিতচিত্তা হইয়া পড়িয়াছেন। বড়াইর সহিত

বনে বনে ঘুরিয়াও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইতেছেন না। এমন সময়ে হঠাৎ নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাধার ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইয়া বলিয়া দিলেন যে, বৃন্দারণ্যে এক বকুলতলায় কৃষ্ণ বসিয়া রহিয়াছেন। পুনরায় অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অবশেষে কৃষ্ণকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া রাধা আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ভৃঙ্গারের জল মুখে দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত করিতে হইল। আবার বাণখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে ফুলবাণে বিদ্ধ করিতেছেন—

বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান ॥
পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-বরে ॥

কার্য্য ও তাহার আকস্মিক পরিণতিতে এখানে নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। কালিয়-দমনখণ্ডে কৃষ্ণ দহে ঝম্প প্রদান করিয়া সাপের বিষে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। বলদেব এই অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহার পূর্ব্ব-স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহা তাঁহাকে স্মরণ করাইবার জন্য যেই তিনি স্তোত্রপাঠ সমাপন করিলেন, অমনি কৃষ্ণ প্রবুদ্ধ হইয়া নাগের ফণার উপরে উঠিয়া পড়িলেন, এবং পদাঘাতে তাহার মুখ হইতে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইল। বড়াই তাম্বুল লইয়া রাধার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। রাধা তাহার প্রস্তাব শুনিয়া পান-তাম্বূলাদি পদদলিত করিয়া বড়াইকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তারপর দানখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের উক্ত-প্রত্যুক্তিতে, নৌকাখণ্ডে হঠাৎ নৌকা-নিমজ্জনে, নিদ্রিত কৃষ্ণের নিকট হইতে বংশী চুরিতে, এবং কৃষ্ণের যোগিবেশ ধারণ প্রভৃতি ঘটনায় গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই নাটকীয় সংঘটনের আভাস পাওয়া যায়। কৃষ্ণ কালিয় নাগকে দমন করিয়া উপরে উঠিয়াছেন, তখন রাধা—

নিমেষরহিত বঙ্ক সরস নয়নে ॥
দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।

কবি এখানে প্রেমের মৌন ভাষার সন্ধান দিয়াছেন। যমুনাখণ্ডে সখীগণ কুম্ভে ভরিয়া যমুনার জল লইতে আসিয়াছেন, কিন্তু

কাহ্নাঞির মুখ কমল দেখিআঁ
কেহো না ভরিল নীরে ॥
কেহো না পারিল করেঁ ধরিতেঁ
খসিল দেহ-বসনে ।
ওহার এহার মুখ চাহে সব
কেহো থির নহে মনে ॥
তখন নয়ন নিমেষ না কৈল
দেখি প্রিয় বনমালী ।
সকল গোআল যুবতী রহিলা
যেহ্ন কনক পূতলী ॥

এখানেও কবি অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। নাট্যাভিনয়ে এই সকল দৃশ্যের প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তারপর নাটকে (এবং কাব্যেও) থাকিবে বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং বহির্দ্বন্দ্বের বিচিত্র সমাবেশ, এবং অন্ততঃ প্রধান চরিত্রটির ভাবের ক্রমিক অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষের উদয় হইয়াছে বড়ায়ের নিকট রাধার রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া, কিন্তু কবি প্রথমেই রাধাকে মুগ্ধা, এবং নন্দের সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুলানী করিয়া বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, অর্থাৎ সমাজ-চেতনা এখানে ব্যক্তি-চেতনার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষ্ণ জানেন যে তিনি স্বয়ং ভগবান, কংসবধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর রাধাও তাঁহার মূল প্রকৃতি স্বয়ং লক্ষ্মী, কিন্তু রাধা তাঁহার পূর্ব্ব-স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহাতেই বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

তোহ্মে নারী মোর, নহ আইহনের রাণী।

কিন্তু রাধা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। অবশেষে বিরক্ত হইয়া কৃষ্ণকে বলিতে হইয়াছে—

নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।

দানখণ্ডের যাবতীয় রসাভাসের পরিকল্পনা এই পরিস্থিতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভাবে প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিয়া কবি গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধ রচনা করিয়াছেন।

রাধার অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হইয়াছে সম্মোহণ-বাণে আহত হইবার পরে, কিন্তু তখন কৃষ্ণের প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প হইতে বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, কারণ সেই সময়ে রাধার কাতরোক্তিতে তিনি কর্ণপাত করেন নাই। এই ভাবে গ্রন্থের শেষভাগেও প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতের সন্ধান পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীরাধাই প্রধান চরিত্র। তাম্বূল-খণ্ডে বড়ায়ের প্রস্তাব শুনিয়া রাধা বলিয়াছিলেন—

জৈসানে রতি জানবোঁ।
তৈসানে কাহ্ন আনিবোঁ।
সুরতী সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাধার অবচেতন মনে কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবেই অবস্থান করিতেছিল, কিন্তু মুগ্ধা বলিয়া তিনি প্রথমে বড়ায়ের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। রাধার এই প্রসুপ্ত প্রীতির ক্রমিক অভিব্যক্তিই বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া গ্রন্থমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বাস্তবতা ও আদর্শের সমাবেশ

সাহিত্যে বাস্তবতা ও আদর্শবাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সাহিত্য-বিচারে ইহাদের মধ্যে কোনও সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না, কারণ খাঁটী আদর্শ লইয়া কোনও কাব্য রচিত হইতে পারে না, আর যদি শুধু বাস্তবতার আদর্শই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তবে ইহাতেও পাঠকের

চিত্তে স্থায়ী রসানুভূতির উদ্রেক হয় না। অতএব বাস্তবতা সাহিত্যের বিষয় হইলেও সেই বাস্তবতার সহিত আদর্শের বিচিত্র সংমিশ্রণ না হইলে কোনও রচনা রস-পর্য্যায়ে গৃহীত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই উভয়েরই বিচিত্র সংমিশ্রণ রহিয়াছে। গ্রন্থারম্ভেই কবি পাঠককে বলিয়া দিয়াছেন যে, নারায়ণ কৃষ্ণরূপে, এবং তাঁহার প্রকৃতি লক্ষ্মী কৃষ্ণের রস-সম্ভোগের জন্য রাধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারই ফলে কবি রাধার অবচেতন মনে কৃষ্ণের প্রতি সুপ্ত আসক্তির সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। অতএব আদর্শবাদের প্রয়োজনীয়তা যে কবি অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ইহার পরেই বাস্তবতার পরিস্থিতিতে ঘটনা-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া কবি আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছেন। এগার ও বার বৎসরের বালক বালিকার প্রেমলীলা যাহা হওয়া উচিত, কবি সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াই উপাখ্যানের পরিকল্পনা করিয়াছেন, এবং এই জন্যই গ্রন্থমধ্যে তথাকথিত রসাভাসের সন্ধান পাওয়া যায়, কারণ তখনও মুগ্ধা রাধা "প্রৌঢ়া পারাবতীতে" পরিণত হন নাই। ইহাতে সর্ব্বত্রই স্বাভাবিকতার আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। সমাজ-ধর্ম্ম ও নীতির উপর দাঁড়াইয়া মুগ্ধা রাধা যে শ্রীকৃষ্ণের মিলন-প্রার্থনায় সম্মত হন নাই, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থ-শেষে কবি বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া রাধার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিয়া দিয়াছেন। অতএব গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবি যে আদর্শের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে সেই আদর্শই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হারখণ্ড পর্য্যন্ত বাস্তবতার পরিস্থিতিতে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। যে সংসার-মোহ রাধা প্রথমে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহাই খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে বড়াই বলিতেছেন—

হান পাঁচবাণে তাক না করিহ দয়া।
গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া॥

অর্থাৎ এই মোহ দূরীভূত করিবার জন্য বাণখণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার পরেই অবিদ্যাবিমোহিতচিত্তরূপিণী রাধা পরমাত্মার আলিঙ্গনে আবদ্ধা হইবার জন্য অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখানেও আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পাওয়া

যাইতেছে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই গ্রন্থে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপরে বাস্তবতা ও আদর্শের অপূর্ব্ব সমাবেশ রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের স্বরূপ

(প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রে মহাকাব্যের বাহ্যিকরূপ এইরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে—"কোন দেবতার অথবা সদ্বংশজাত অশেষ গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তান্ত লইয়া মহাকাব্য রচিত হইবে। ইহাতে অষ্টাধিক সর্গ-সংখ্যা থাকিবে। গ্রন্থের উদ্দেশ্য বর্ণনাপূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ হইবে। বিবিধ ঋতু এবং প্রাকৃতিক বর্ণনা প্রভৃতি ইহার অঙ্গীভূত হইবে। ইহাতে আদি, বীর, করুণ অথবা ইহাদের মধ্যে কোনও একটি রসের প্রাধান্য থাকিবে এবং অন্যান্য রসও ইহার পরিপোষক হইতে পারে। নায়ক ধীরোদাত্ত, ধীর-প্রশান্ত, ধীরোদ্ধত অথবা ধীর-ললিত হইতে পারে; তন্মধ্যে ধীরোদ্ধত নায়কের বিশেষত্ব এই যে, ইনি মায়াবী, উদ্ধত, চঞ্চল, অহঙ্কার ও দর্পে পরিপূর্ণ এবং আত্মশ্লাঘা বিষয়ে নিরত হইবেন ইত্যাদি।") শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণ লক্ষ্মী ও নারায়ণের অবতার। অষ্টাধিক সর্গ ইহার অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণের রসসম্ভোগের জন্য দেবতাগণের অনুরোধে যে লক্ষ্মী আসিয়া রাধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই নির্দ্দেশ কবি জন্মখণ্ডেই প্রদান করিয়াছেন। অতএব আদিরসাত্মক রাধা-কৃষ্ণলীলা যে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইবে প্রথমেই তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। বসন্ত, বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ঋতুর, এবং বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া কবি গ্রন্থের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আদিরসপ্রধান গ্রন্থ, এবং হাস্য ও করুণকে ইহার পরিপোষকরূপে নিয়োজিত করা হইয়াছে। অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে কৃষ্ণ ধীরোদ্ধত নায়ক। অতএব মহাকাব্যের বাহ্যিক বিশেষত্বগুলি এই গ্রন্থে বর্ত্তমান রহিয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, ইহা গীতি-কাব্যের লক্ষণ সমন্বিত, কারণ দুইটি হৃদয়ের অনুভূতির অভিব্যক্তিই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। বিভিন্ন অধ্যায়গুলি খণ্ডকাব্যের রীতিতে সংযোজিত হইয়াছে।

ইহাতে আখ্যায়িকার একটি ক্রমিক বিকাশও লক্ষিত হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। কবি সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থাদির সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। বোধ হয় ঐ সকল গ্রন্থপাঠে অনুপ্রেরিত হইয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই আদি যুগে মহাকাব্য গীতিকাব্য ও নাটকের বিচিত্র সংমিশ্রণে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। যুগব্যাপী সাহিত্য সাধনার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের এই সকল বিভিন্ন শাখা প্রত্যেকেই নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সহিত রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের প্রভাবে চালিত হইয়া কবি একই গ্রন্থে সকলের সমাবেশ করিয়াছেন। ইহাতে কবির অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।[১]

বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব-কাল :—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এদেশে দুই যুগে দুই শক্তিশালী কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন —হিন্দু রাজত্বের অবসানকালে জয়দেব, আর মুসলমান রাজত্বের অবসান-কালে ভারতচন্দ্র। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল কবির আবির্ভাব আকস্মিক নহে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দুর দুর্গতির ইতিহাস এই ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—'মহারাজ লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধ বয়সে গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিলেন। জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীর মধুর আস্বাদনেই তিনি অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ভাগবতের দশমস্কন্ধ এই সময় লক্ষ্মণের সভায় নিত্য পাঠ্য হইয়া পড়িয়াছিল। * * * এই সময়ের রাজকবি ধোয়ীর "পবনদূত" পাঠ করিলে দেখিতে পাইব—বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের রাজধানীতে বিলাসিতার স্রোত সতেজে প্রবাহিত হইতেছিল। প্রকাশ্য রাজপথ বারবিলাসিনীগণের মঞ্জীর-নিক্কণে মুখরিত, নিশীথে স্বেচ্ছাচারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহতগতিতে সেনরাজধানী সচকিত, নাগর-নাগরীর

১। এখানে একটি অদ্ভুত উক্তির উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত মহাকাব্যের লক্ষণের কিছুই ইহাতে না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মহাকাব্য।" এতদিন সোনার পাথরবাটির কথা শুনিয়াছিলাম, এই উক্তিতে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল।

প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী যেন বিকশিত। তাহারই পরিণামে গৌড়ীয় সেনা-বিভাগে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচার, বিলাসিতা, ও চরিত্রহীনতা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহারই ফলে গৌড়-রাজধানী মুসলমান-কবলিত হয়।" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ, ৪: পৃঃ)। একটা জাতি চরম অবনতির সীমায় পদার্পণ না করিলে বিনা যুদ্ধে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণসেনকে চলিয়া যাইতে হইত না। যাহাই হউক, এই যুগলক্ষণ অঙ্গে ধারণ করিয়াই আবির্ভূত হইয়াছিল—জয়দেবের গীতগোবিন্দ, এবং ধোয়ী কবির পবনদূত। লক্ষ্মণসেনের সভায় পণ্ডিতের অভাব ছিল না। তন্মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ রচনা করিয়াছিলেন—মৎস্যসূক্ত, ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব, শৈব-সর্ব্বস্ব, বৈষ্ণব-সর্ব্বস্ব। প্রধান পণ্ডিত পশুপতির রচিত সংস্কার-পদ্ধতি, ও হলায়ুধের ভ্রাতা ঈশানের আহ্নিক-পদ্ধতি প্রভৃতিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেশটা ছিল ব্রাত্য, এইজন্য বঙ্গদেশে তীর্থযাত্রা ভিন্ন আগমন নিষিদ্ধ ছিল। সেনরাজগণের সময়ে বাঙ্গালী জাতির গোড়া-পত্তন আরম্ভ হয়। এই হেতু ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য পণ্ডিতগণের এই প্রচেষ্টার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু যে বাহুবলের প্রভাবে ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে, বিলাসিতার মোহে তাহা চিরদিনই অবহেলিত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালী চরিত্রের এই বিশেষত্ব আজও বিলুপ্ত হয় নাই।

যাহাই হউক, রুগ্ন সমাজ-দেহ হইতে গীতগোবিন্দের উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রভাব অল্পকালের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও এই প্রভাব অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিয়াছে। চণ্ডীদাস গীতগোবিন্দের অনুকরণে আদি-রসাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং ইহার অনেক শ্লোক অনুবাদিত করিয়া গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অতএব চণ্ডীদাসকে জয়দেবের পরবর্ত্তী কবি বলিয়া নির্দ্দেশিত করা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি কত পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহাই বিচার্য্য বিষয়। জয়দেবের সময়েই মুসলমান-রাজত্বের সূত্রপাত হয়। ইহার পরে বঙ্গদেশে প্রায় আড়াই শত

বৎসর কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনে দেশে অরাজকতার উদ্ভব হয়। বিশেষতঃ জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজগত পার্থক্য হেতু মুসলমানগণের আগমনে যে দেশের পরিস্থিতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রারম্ভের পরে সকল গতিই আহরিত শক্তির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। অতএব ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত প্রবলভাবে দেশকে আলোড়িত করিয়া প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে কিছু সমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয়। এই হেতু দেশে সাহিত্য-সাধনার সুযোগ যদি কিছু ঘটিয়া থাকে, তাহা জয়দেবের বেশী পরবর্ত্তী কালে সংঘটিত হইতে পারে নাই। এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ও বিবেচনা করিবার রহিয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলী চৈতন্যদেবের সময়ে এদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার প্রভাব লক্ষিত হয় না। ইহার কারণ এই যে, চণ্ডীদাসের সময়ে বঙ্গদেশে ইহার আবির্ভাব হয় নাই। এই হিসাবে চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আদর্শ পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারাও কবির সময় নির্দ্ধারিত হইতে পারে। লিপি-বিদ্যাবিশারদ স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত আদর্শ-পুথির অক্ষরগুলি লইয়া আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন—"১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে (শূদ্রপদ্ধতি প্রভৃতি) ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর। কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে সমস্ত প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন চতুর্থাংশের অধিক অক্ষর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" পরবর্ত্তীকালে কেহ কেহ ইহা লইয়া আলোচনা

করিয়া ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেও ঐ পুথিখানি যে বহু প্রাচীন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সেই প্রাচীনকালেও কৃষ্ণকীর্ত্তনের পাঠের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।

আল রাধা

সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোএঁ দেব মুরারী মোএঁ

তোর মোর উচিত সেনেহা।

আল রাধা

তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জানে দেবাগণ

ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা॥

আল রাধা

না পরিহর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।

সব কলা সংপুনী তোঁ রাহী॥

মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের (২য় সং) ৩৩ পৃষ্ঠায় পদটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী অংশ ভিন্ন ছন্দে রচিত। অথচ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুথিশালায় আবিষ্কৃত একখানি প্রাচীন পুথিতে সম্পূর্ণ পদটি এই ছন্দেই রচিত রহিয়াছে। যথা—

আগো রাধে

আইলু মুঞী বড় আশে না করহ নৈরাশে

শুন ধনি আমার বচনে।

আগো রাধে

দেবের দেবতা আমি জানিঞা না জান তুমি

ফিরি চাহ নিরখি বদনে॥

আগো রাধে

তোর রূপে মোর মন মজে।

জৌবন রাখহ কোন কাজে॥ ইত্যাদি।[১]

১। সম্পূর্ণ পদটি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই নবাবিস্কৃত পুথিতেই ইহার প্রকৃত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়, আর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আদর্শ পুথিতে এই পদের প্রথমাংশের সহিত অন্য একটি পদের অংশ সংযোজিত রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত একটি সম্পূর্ণ নূতন পদের সন্ধানও ইহাতে পাওয়া যায়, যথা—

চামরি জিনিঞা তোর চিকন কবরি।
মালতির মালা তাহে বেড়া সারি সারি ॥
অলকা তিলক কিবা ভালের উপরে।
সুরঙ্গ সিন্দূরবিন্দু তাহার মাঝারে ॥
বদন শরত চান্দ সুধা হাসী ঝরে।
দশন-কিরন কত বিজুরি সঞ্চরে ॥
হৃদএ মুকুতার হার অমুল্য রতন।
কুন্দ কনয়া গিরি তোর দুই স্তন।
হেন শে জোবন রাধা সব আলপাট।
জোবন [গড়িলে] তনু হইবেক নাট ॥
না ছুঞিঃ জোবন রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাষুলির গন ॥

ভাবে ও ভাষায় পদটি সম্পূর্ণ ই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ। অতএব ইহাকে চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে মুদ্রিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩০ পৃষ্ঠার শেষ চারি পঙ্ক্তির রচনা-সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই পদটি এইভাবে পাওয়া যায় না। মুদ্রিত গ্রন্থে—"সাসুড়ী ননন্দ মোর ঘরে দুরুবারে" রূপে একটি পদ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু নবাবিস্কৃত পুথিতে ইহার পূর্ব্বে আট পঙ্ক্তি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অতএব মুদ্রিত গ্রন্থে পদের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, পরিবর্জ্জন প্রভৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একখানি গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে বহুদিন প্রচলিত না থাকিলে এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ চৈতন্যচরিতামৃত ও রুক্মিণীহরণ-নাটের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও সংস্কৃত শ্লোকে পরবর্ত্তী ঘটনার নির্দ্দেশ প্রদান করিবার

রীতি লক্ষিত হয়। কিন্তু সকল পদের পূর্ব্বে মুদ্রিত গ্রন্থে এইরূপ শ্লোক পাওয়া যায় না। বংশীখণ্ডের প্রথম তিনটি পদের পূর্ব্বে শ্লোক রহিয়াছে, তৎপর ছয়টি পদে নাই, আবার তাহার পরেই তিনটি পদের পূর্ব্বে রহিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, আদি পুথিতে প্রত্যেক পদের পূর্ব্বেই এইরূপ শ্লোক ছিল, কিন্তু বহু প্রচলন হেতু ক্রমে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় নাই, অতএব ধীরে ধীরে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পরে মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শ পুথি লিখিত হইয়া থাকিবে। চতুর্থতঃ গ্রন্থের ভাষা পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চর্য্যাপদের পরেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের স্থান নির্দ্দেশিত হইতে পারে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় যে, এই গ্রন্থ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। সেনযুগের প্রভাব ইহার পত্রে পত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া চণ্ডীদাসকে জয়দেবের বেশী পরে স্থাপন করা যায় না। চণ্ডীদাস যে বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে স্পষ্টই ধারণা জন্মে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস :—চণ্ডীদাস স্বীয় কল্পনা-বলে ঘটনা-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাপতির রচনায় ঘটনার সেই গাঁথনি নাই। তিনি বিচ্ছিন্নভাবে পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, পরে সম্পাদকগণ পদ-বর্ণিত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। চণ্ডীদাস যেভাবে বিভিন্নখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ঘটনার ক্রমিক অভিব্যক্তিতে গ্রন্থের একত্ব সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় কবি এপিক বা মহাকাব্যের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে আদিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণ-লীলা-মাধুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের কাব্যে যে এপিক, লিরিক ও নাটকের অপূর্ব্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয় তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতির পদগুলি লিরিক পর্য্যায়ভুক্ত। যদিও সম্পাদকগণের গ্রন্থন-কৌশলে এখন দেখা যায় যে, তিনিও মুগ্ধা রাধাকে প্রগল্ভা রাধায় পরিণত করিয়া রচনার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন, তথাপি মধ্যে মধ্যে এমন ফাঁক রহিয়া গিয়াছে যে, ইহা পূরণ করিতে কল্পনার আশ্রয়

গ্রহণ করিতে হয়। অতএব পদগুলি যে বিচ্ছিন্ন ভাবে রচিত হইয়াছিল, এই ধারণাই জন্মিয়া থাকে, নতুবা এক বয়ঃসন্ধি বর্ণনাতে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া এতগুলি পদ রচিত হইবার কোনই কারণ নাই। যাহাই হউক, উভয় কবির রচনার মধ্যে যে প্রভূত সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিকল্পনার দিক্ দিয়া বিচার করিলে বুঝা যায় যে, উভয়েই মুগ্ধা রাধাকে প্রগল্‌ভা রাধায় পরিণত করিয়া গ্রন্থ-সমাপ্তি করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্নতা এই যে বিদ্যাপতির রাধা জ্ঞাতযৌবনা, আর চণ্ডীদাসের রাধা অজ্ঞাতযৌবনা বলিয়া কেবল প্রেমের সম্বন্ধে নহে, সংসার-মোহে এবং পূর্ব্ব-স্বরূপত্ব বিস্মৃত হওয়াতেও মুগ্ধা। অতএব মূল পরিকল্পনায় চণ্ডীদাস যে বিদ্যাপতি অপেক্ষাও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সকল বিষয় পূর্ব্বেই বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। রূপ বর্ণনায় উভয় কবিই সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য উপমাগুলি প্রায় একই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মুখের সহিত চন্দ্রের, নয়নের সহিত খঞ্জনের, উরুর সহিত কদলী বৃক্ষের, স্তনের সহিত শম্ভু বা সুমেরুর উপমাগুলি প্রাচীন কবি-প্রসিদ্ধি অবলম্বনে ব্যবহৃত হইয়াছে। তথাপি উভয়ের প্রকাশ-ভঙ্গীর তুলনা করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

লোচন খঞ্জন ভাঁতি (পদ সং ২৪)

আর চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

নয়ন-যুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে (২য় সং, ৩২ পৃঃ)

অন্যত্র—

বিদ্যাপতি—দশনহি মোতিম পাঁতি। (পদ সং—২৪)

চণ্ডীদাস—মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা। (২য় সং—৩২ পৃঃ)

বিদ্যাপতি—চিকুর নিকর তম সম।

পুনু আনন পুনিম সসী।

চণ্ডীদাস—নীল জলদ সম কুন্তল ভারা।

এবং—ষোলকলা সংপুন্ন চন্দ্র-বদন। (২য় সং—৩২ পৃঃ)

বিদ্যাপতি—পল্লবরাজ চরণযুগ শোভিত

গতি গজরাজক ভানে। (পদ সং—১৭)

চণ্ডীদাস—চরণযুগল থলকমল আকারে॥

করিরাজ জিনী রাধা করিল গমনে। (২য় সং—১৫ পৃঃ)

বিদ্যাপতি—কনক কেদলি পর সিংহ সমারল

তাপর মেরু সমানে॥

মেরু উপরে দুই কমল ফুলাএল

নাল বিনা রুচি পাই।

মণিময় হার ধার বহু সুরসরি

তঁই নহি কমল শুখাই॥ (পদ সং—১৭)

চণ্ডীদাস—উরু তোর রামকদলী সমানে। (২৬ পৃঃ)

সিংহ জিনী তোর আতি মাঝা খিনী। (২৮ পৃঃ)

কমলকলিকা সম তার পয়োভারে। (১৫ পৃঃ)

এবং—কনক কুম্ভ আকাঁরে দুঈ তোর পয়োভারে

তাহাত উপর গজ মুকুতার হারে।

যেহ্ন শোভা করে সুমেরু গঙ্গার ধারে

তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহি সরে॥

(২য় সং—৬১ পৃঃ)

বিদ্যাপতি—চামরে ঝাঁপল কনক মহেশ। (পদ সং—৮)

চণ্ডীদাস—দুঈ কুচ তোর রাধা শম্ভুর আকার। (২য় সং—২৮ পৃঃ)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রচনা-মাধুর্য্যে কেহ কাহারও অপেক্ষা কম নহেন। উভয়েই আহরিত সম্পদে নিজ নিজ রচনা সুসজ্জিত করিয়া লোক-মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। মুগ্ধা রাধা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছেন, কিন্তু প্রথম মিলনের ভয় তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছে। রাধার এই অবস্থাটা উভয় কবিই বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

কোরি কুসুম মধু বেকত ন রহতে।

এবং—কাঁচি বদরি উপভোগে ন আওত।

হম কোমল তনু নারি। ইত্যাদি (পদ সং—১৬৩)

আর চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

মালতী মল্লিকাকলিকাত নাহিঁ গন্ধ।

এবং—কাঁচফল ভাঁগিলে কিছু রস ন পাই।

কোঁঅলী পাতলী বালী আম্মে চন্দ্রাবলী। ইত্যাদি

(২য় সং, ৫৪, ৬১ পৃঃ)

বিদ্যাপতি লিখিলেন—

ন দিহ কুচে নখরেখঘাত। (পদ সং—১৭৩)

আর চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

নখঘাত না দিহ মোর পয়োভারে। (ঐ, ৬১ পৃঃ)

মিলনের পরে রাধাকে দেখিয়া বিদ্যাপতির কোন সখী জিজ্ঞাসা করিতেছে—

এ ধনি ঐসন কহবি মোয়।

আজু যে কৈসন দেখিয় তোয়॥

সুরঙ্গ অধর বিরঙ্গ ভেলি। (পদ সং—১৮৯)

এবং—আজু বিপরীত ধনি দেখিয় তোয়।

বুঝই ন পারিয় সংশয় মোয়॥ ইত্যাদি (পদ সং—১৮৭)

আর চণ্ডীদাসের বড়াই রাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

সকল শরীর তোর দেখি বিপরীত।

ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত॥

আধর ছাড়িল তোর তাম্বুলের রাগ। ইত্যাদি

(২য় সং—৬২ পৃঃ)

উভয় কবিই মুগ্ধা রাধাকে লইয়া খেলা করিয়াছেন, এইজন্য উভয়ের পরিকল্পনায় এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,

বিদ্যাপতির পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ দানলীলা ও নৌকালীলার পদ সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস রাধা-প্রেমের ক্রমিক অভিব্যক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য ঘটনা-পরম্পরার সৃষ্টি করিয়া যে ভাবে গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন, তাহাতে দানলীলাদির সার্থকতা রহিয়াছে। রাধা মথুরার হাটে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, এই পরিকল্পনা চণ্ডীদাসের নিজস্ব, অথচ বিদ্যাপতির পদে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

বিকে গেলিহুঁ মাথুর মধুরিপু
ভেটল সাধে। (পদ সং—৬৬)

অন্যত্র—

গোরস বিরস বাসি বিশেষল
ছিকেহু ছাড়ল গেহা।
মুরলি ধুনি সুনি মন মোহল
বিকেহু ভেল সন্দেহা॥ (পদ সং—৫৯)

এবং—সখি, আজ মধুরিপু ভেটল মো হটিআঁ।
বিসরলি দুধহু কলসী। ইত্যাদি
(পদ সং—৬০)

প্রসঙ্গক্রমে এই সকল কথার উল্লেখে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যখন এই সকল পদ রচিত হইয়াছিল, তখন রাধার হাটে যাওয়ার আখ্যায়িকাটি বিশেষ-রূপে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। নগেন্দ্রবাবু কর্তৃক সম্পাদিত বিদ্যাপতির প্রথম পদটিতেই ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষতঃ উক্ত ৬০ সংখ্যক পদের ভণিতায় শিবসিংহকে "দান-কল্পতরু" বিশেষণে ভূষিত করায় কবির মনে দানলীলার প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু নৌকালীলায় শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রভাব আরও স্পষ্টভাবে পতিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, কৃষ্ণ রাধার সখীগণকে আগে পার করিয়া পরে রাধাকে পার করিয়াছিলেন, এবং মাঝ-যমুনায় নৌকা ডুবাইয়া রাধার সহিত জলে বিহার করিয়াছেন। বিদ্যাপতির নৌকালীলার পদেও এই সকল ঘটনার উল্লেখ

রহিয়াছে, এমন কি রচনারও আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

তুঅ গুন গৌরব সীল সোভাব।
সেহে লএ চঢ়লিহুঁ তোহরী নাব॥ (পদ সং—১২৫)
তুং—নাঅত চঢ়িলোঁ কাহ্নু তোঁর সত্য বোলে।
(কৃঃ কীঃ ২য় সং—৭৩ পৃঃ)

বিদ্যাপতি—আইলি সখি সবে সাথে হমার।
সে সবে ভেলি নিকহি বিধি পার॥ (ঐ)
চণ্ডীদাস—সব সখিজন মোর করি তোহ্মে পারে। (ঐ, ৭০ পৃঃ)
বিদ্যাপতি—ভাল মন্দ জানি করিঅ পরিণাম। (ঐ)
চণ্ডীদাস—পাপ পুণ্যের কাহ্নু করহ বিচার। (ঐ, ৭১ পৃঃ)
বিদ্যাপতি—কাঁপ হৃদয় তুঅ প্রকৃতি বিচারি। (ঐ)
চণ্ডীদাস—অন্তর হালএ তোর বচনে। (ঐ, ৭১ পৃঃ)
বিদ্যাপতি—হাম অবলা কত কহব অনেক। (ঐ)
চণ্ডীদাস—মো কিছু না জাণো শিশু আবালী গোআলী।
(ঐ, ৬৯ পৃঃ
বিদ্যাপতি—নাব ডোলাব অহীরে। (ঐ, পদ সং—১১৬)
চণ্ডীদাস—নাঅ টালবলাএ আধিকে দামোদর। (২য় সং—৭৪ পৃঃ)
বিদ্যাপতি—ককে বিকে ঐলিহু আপে
বেঢ়লিহু মোহি বড় সাপে
মোরে পাপে ল। (ঐ, পদ সং—১২৬)
চণ্ডীদাস—পুরুব জরমে কৈল করমের ফলে।
জরম লভিল আহ্মে গোআলার কুলে॥
তেঁসি দধি বিকে জায়িতেঁ মথুরার হাটে।
তরুজন কাহ্নাঞি সুন এবেঁ পাড়ে বাটে॥
(ঐ, ৬৮ পৃঃ)।

বিদ্যাপতির পদে যে পাপের উল্লেখ আছে, চণ্ডীদাসের রচনা পাঠ করিলে তাহার অর্থ স্পষ্টতর হয়। চণ্ডীদাস একটি বিস্তৃত পালাতে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, বিদ্যাপতি তাহার সার সঙ্কলন করিয়া উক্ত পদ দুইটি রচনা করিয়াছেন মাত্র। নতুবা বিদ্যাপতির রচনায় অনাবশ্যক নৌকালীলার পদ এইরূপ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় থাকিবার কোনই হেতু নাই। বিদ্যাপতির ৩২৬ সংখ্যক পদটি পাঠ করিলে এই ধারণা আরও স্পষ্টতর হইবে।

খরি নরি বেগে ভাসলি নাই।
ধরএ ন পারথি বাল কহ্নাই॥
তেঁ ধসি জমুনা ভেলাহু পার।
ফুটল বলয়া টুটল হার॥
কুন্তল খসল জমুন মাঝ।
তাহি জোহইতে পড়লি সাঁঝ॥
অলক তিলক তেঁ বহি গেল।
সুধ সুধাকর বদন ভেল॥
তটিনি তট ন পাইঅ বাট।
তেঁ কুচ গাড়ল কঠিন কাঁট॥ ইত্যাদি। (পদ সং—৩২৬)

ইহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যমুনা পার হইবার কালে কৃষ্ণের সহিত জলে বিহার করিয়া রাধা তীরে উঠিয়াছেন। ইহার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার কুচেও নখরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহাই প্রত্যক্ষ করিয়া বড়াই রাধাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কুচে নখরেখ তোর নিরস আধরে। (ঐ, ৭৫ পৃঃ)

অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বিদ্যাপতির সময়ে এই সকল আখ্যায়িকা মিথিলায় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। কি ভাবে ইহা সংঘটিত হইতে পারে ইহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে যে, প্রচলিত প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যাপতি ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু মিথিলা শৈব দেশ, তাহাতে রাধাকৃষ্ণ-লীলার এইরূপ প্রসারতা বিদ্যাপতির

পূর্ব্ববর্ত্তী কালে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা অহেতুক কল্পনা মাত্র। পুরাণে দানলীলাদির বর্ণনা থাকিলে বুঝা যাইত যে, তাহা হইতে আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে, অতএব বিদ্যাপতির পক্ষে সেই সময়ে এই সকল আখ্যায়িকা-সৃষ্টির কোনই কারণ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ যখন চণ্ডীদাসকেই দান-লীলাদির প্রবর্ত্তক হিসাবে নির্দ্দেশিত করা হইয়াছে, এবং তাঁহার গ্রন্থেই এই নব পরিকল্পনার সার্থকতা লক্ষিত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাবই যে বিদ্যাপতির উপরে পতিত হইয়াছে এই ধারণাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আর নূতন উদ্ভাবনা যে একই প্রকারের হইবে তাহারও কোন কারণ নাই। চণ্ডীদাস রাধাকে হাটে পাঠাইয়া দানলীলার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন, আর রূপ-গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদীতে বৃন্দারণ্যের যজ্ঞে ঘৃত যোগাইবার কালে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতির পদে হাটে যাইবার কথা রহিয়াছে, এবং নৌকালীলায় জল-বিহারেও বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা স্পষ্টরূপেই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আবার এই সকল পদ বিদ্যাপতির রচিত নহে ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ উদ্ধৃত ১২৫ এবং ১২৬ সংখ্যক পদে শিবসিংহের উল্লেখ করা বিদ্যাপতির ভণিতা রহিয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি। লক্ষ্মণ সম্বৎ মিথিলায় প্রচলিত ছিল, আর বিদ্যাপতির অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ যে সেন-রাজত্বে রচিত গ্রন্থগুলির অনুকরণ মাত্র, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন মিথিলায় প্রচারিত থাকাই সম্ভবপর। ইহারই ফলে পরম শৈব বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ লীলায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মূল পরিকল্পনাতেও তিনি চণ্ডীদাসের ন্যায় রাধাকে মুগ্ধা নায়িকা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। ইহাতেও চণ্ডীদাসের প্রভাব পড়িয়াছে। আর বিদ্যাপতির পদে যে কিছু মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় ইহাও তাঁহার অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীনতার নিদর্শন। চণ্ডীদাসে গীতগোবিন্দ ও সেনযুগের প্রভাব পূর্ণ-মাত্রায় লক্ষিত হয়, বিদ্যাপতিতে তাহা কিছু মার্জ্জিত হইয়াছিল, আর চৈতন্য-পরবর্ত্তী

যুগে ইহা আদর্শীভূত হইয়াছে। এই ধারা অনুসরণ করিলে এই লীলার ক্রমিক পরিবর্ত্তনের ইতিহাস পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি যদি প্রায় ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং বাঙ্গলার গ্রন্থ মিথিলায় প্রচারিত হইতে যদি শতাধিক বৎসর লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের আবির্ভাব কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই নির্দ্দেশিত করা উচিত। অতএব চণ্ডীদাসকে জয়দেবের বেশী পরে স্থাপন করা যায় না। এতদিন আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, মৈথিলীর প্রভাবে বাঙ্গালায় ব্রজবুলীর সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেখা যাইতেছে যে, ইহার বহু পূর্ব্বেই মিথিলার সর্ব্বপ্রধান কবি নিজের রচনায় বাঙ্গালার ঋণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার অঞ্চল ধারণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির "মিথিলার পদেও" ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

কুঞ্জ-ভবন সঞো নিকসলি রে
রোকল গিরিধারী।
একহি নগর বস মাধব হে
জনু কর বটবারী॥
ছাড়ু কহ্নইয়া মোর আঁচর রে
ফাটত নব সারী।
অপজস হোএত জগত ভরি হে
জনু করিঅ উঘারী॥
সঙ্গক সখি অগুআইলি হে
হম একসরি নারী। ইত্যাদি

(পদ সং—১২৩)

কৃষ্ণ এমনভাবে অঞ্চল ধারণ করিয়াছেন যে, নূতন সাড়ী ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। সঙ্গের সখীরা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে আর রাধা একাকিনী, এইরূপ উক্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পুনঃ পুনঃ রহিয়াছে। সেখানে ঘটনার সৃষ্টি করিয়া কবি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সার্থকতা আছে, কিন্তু বিদ্যাপতির পদে ইহা

পূর্ব্বাপর সম্বন্ধবিহীন উক্তি মাত্র। পাঠ করিলেই মনে হয় যেন কবির মনে এই ধারণা পূর্ব্ব হইতেই কার্য্য করিতেছিল। "একসরি" শব্দটিও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এই পদে বিদ্যাপতির মাধব "কহ্নইয়া"তে পরিণত হইয়াছেন। শুধু এই পদে নহে, ১২৪ সং পদে একাধিক বার "কহ্নেয়া", নৌকালীলার ১২৫ সং পদে "কহ্নু", "কাহ্নু" প্রভৃতি, এবং ৩২৬ সং পদে "কহ্নাই"। এই সকল শব্দ ব্যবহারে, এবং ঘটনার উল্লেখেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীদাস বড়াইর হাতে কৃষ্ণের ফুলতাম্বুল রাধার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; বিদ্যাপতির পদেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

তোহর কেশ, কুসুম, তৃণ, তাম্বুল
ধয়লহু রাহিক আগে।
কোপে কমলমুখি পলটি ন হেরল
বৈসলি বিমুখ বিরাগে॥
(পদ সং—৩৯৯)

অন্যত্র—

কাহ্নুক তৃণ, কেশ ধরু তসু আগে।
তবহুঁ সুধামুখি নহি অনুরাগে॥ (পদ সং—৩৯৮)

বিভিন্নতার মধ্যে এই যে বিদ্যাপতির উপহার মানের সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিরহখণ্ডে মিলনের পরে পরিশ্রান্ত রাধা কৃষ্ণের উরুস্থলে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর সেই সুযোগে কৃষ্ণ রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির রচনাতেও এইভাবের পদ পাওয়া যায়, যথা—

সুরত-পরিশ্রম সরোবর-তীর।
সুরু অরুণোদয় সিসির সমীর॥
মধু নিসা বেলী ধনি ভেলি নিন্দ।
পুছিও ন গেলে মোহি নিঠুর গোবিন্দ॥ (পদ সং—৬১৬)

আর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—

উরুখানী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।
শ্রম বড় পায়িল আহ্মে সুতি যাওঁ নিন্দ।
হেন সম্ভেদে দেখি শীতল বহে বাএ।
ভ্রমর কোকিল মেলি কলগীত গাএ।
কুসুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ।
রাধার নয়নে গিঞাঁ নিন্দ কৈল বাস।

এবং—ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু
কাঢ়ি গেলা মথুরা নগরক কাঁহ্নে। (১৭৮ পৃঃ)

এইরূপ যে সকল আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় তাহাত আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিদ্যাপতির সময়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ঘটনাগুলি কবির মনোরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল, তাহারই ফলে বিভিন্ন পদে ইহাদের অভিব্যক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে।[১]

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় উপমা-প্রয়োগ করেন নাই—সুন্দরের স্বভাবভঙ্গীই অলঙ্কার হইতে বেশী আকর্ষক। উপমা কবির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বর্ণিত আছে সত্য—কিন্তু যিনি ভাবটি নিজের তুলিতে আঁকিতে পারেন না, তিনি উপমার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে গৌণ-বস্তু দ্বারা মুখ্য বস্তুর আভাস দিতে চেষ্টা করেন। তাই উপমার রূপবর্ণনা অপেক্ষা জীবন আঁকিয়া রূপবর্ণনা উৎকৃষ্ট। এই হিসাবে কালিদাস অপেক্ষা সেক্ষপীয়র শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাপতি হইতে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ।" অবশ্যই তিনি প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাসকে লক্ষ্য করিয়াই এই অভিমত প্রকাশিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতিও প্রযোজ্য

১। বিরুদ্ধবাদিগণ হয়ত বলিবেন যে, যে সকল পদে এইরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় তাহা বিদ্যাপতি রচনা করেন নাই। অথচ ইঁহারাই এতদিন নানাভাবে বিদ্যাপতির ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তাঁহার কবি-খ্যাতি বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। এখন ইহা বলা সঙ্গত হইবে কি?

হইতে পারে। রূপ-বর্ণনার যে সকল উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বিদ্যাপতির উপমা-অলঙ্কারবহুল পণ্ডিত্য ও চাতুর্য্যপূর্ণ রচনা অপেক্ষা চণ্ডীদাসের রচনা সহজ, সরল ও মাধুর্য্যময়।

দ্রষ্টব্য ঃ—প্রচলিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা বিদ্যাপতিকে চণ্ডীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া গ্রহণ করিয়াই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই সকল আলোচনারফলে আমাদের সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তথাপি আমরা যে খেয়াল বশে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য বিদ্যাপতির আলোচনা এই গ্রন্থে চণ্ডীদাসের পূর্ব্বেই সন্নিবিষ্ট রহিল।

চণ্ডীদাস ও প্রচলিত পদাবলী ঃ—এক চণ্ডীদাসই বর্ত্তমান ছিলেন এবং তিনি যৌবনে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও বার্দ্ধক্যে পদাবলী রচনা করিয়াছেন, এই ধারণা এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যে, বড়ু চণ্ডীদাসকে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে টানিয়া আনা শুধু ভ্রান্তি নহে, হাস্যজনক প্রয়াস মাত্র। কবিরা যুগ-প্রভাবে আবির্ভূত হন, এই তত্ত্ব প্রাচীন ও আধুনিক কালে সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহারা যে ভাব-ধারার সৃষ্টি করিয়া যান, তাহা যুগান্তরকারী কোন ঘটনা সংঘটিত না হওয়া পর্য্যন্ত সমভাবেই বর্ত্তমান থাকে। বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এই পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছিল। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনার পরিসমাপ্তিতে মুগ্ধা রাধা যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া চৈতন্যোত্তর যুগে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। এইজন্য রাধাকে আমরা জন্ম হইতেই কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনীরূপে দেখিতে পাই। অতএব চৈতন্য-পরবর্ত্তী পদাবলীর ভাবধারার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের পার্থক্য থাকা বিচিত্র নহে। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীদাস রাধাকে বংশীধ্বনি শ্রবণ করাইয়াছেন বাণখণ্ডের পরে। এই জন্য উক্ত গ্রন্থে রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ প্রচলিত পদাবলীতে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাস কাব্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া অতি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরিবর্ত্তে তিনি দানলীলাদির সৃষ্টি করিয়া রাধা-প্রেমের

ক্রমোন্নতির স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার প্রভাব যে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্ণ মাত্রায় পতিত হইয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত পদাবলীর দানলীলাদিতে আমরা আদর্শীভূত রাধা-প্রেমের বর্ণনাই প্রাপ্ত হই। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে প্রেমময়ী রাধা দানের ছল করিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছেন। তথাপি ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়াই রহিয়াছে, এবং কথোপকথন উক্ত গ্রন্থের অনুকরণে পোষা পাখীর বুলির ন্যায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে॥ যথা—

বেরাইতে রাধা নাহি পড়ে বাধা
পশরা লইয়া মাথে।
তবে কি এ পথে বিকি করিবারে
আসিথু বড়াই সাথে॥

তুলনীয়—

কমন আসুভক্ষণে বাঢ়াইলোঁ পা।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

অন্যত্র—

বহুদিন এই পথে আসি যাই
পশরা লইয়া মাথে।

এবং—

এ পথে জগাত ঘাটে ঘাটিয়াল
কখন নাহিক জানি।

পদাবলী।

তু°—

এতকাল যাইএ আহ্মে মথুরার হাটে।
কভোঁ না দেখিল কাহাঞি দানী এহা বাটে॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন।

পদাবলী—

কহিব কংসেরে গিয়া।
তোমার যোগানী তার হেন গতি
রাখিবে ধরিয়া লয়া॥

তুলনীয়—

রাজা কংসে করিবোঁ গোআরী।
তবে কাহ্নু লআঁ যাবোঁ ধরী॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন।

পদাবলী—

কংসের যোগানী বলিয়া তোমার
বড় অহংকার দেখি।
কোটী কোটী কংস করিয়াছি ধ্বংস
শুনহ কমল মুখি॥

তুলনীয়—

মারিবোঁ কংস আসুর।
তোর দাপ করোঁ চূর॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন।

পদাবলী—গরু না রাখিতে হাতে বাড়ি করি
তবে বা হইত কত।

তুলনীয়— হআ গরু রাখোআল বোল আকাশ পাতাল
তা সুনি কেবা পতিআএ।

কৃষ্ণকীর্ত্তন।

পদাবলী— তিলেকে ভাঙ্গিব ঠাকুরালি-পনা
আপনি দাঁড়ায়ে দেখ।

তুলনীয়— ষোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে।
মাগু কিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে॥

বিভিন্নতার মধ্যে এই যে, ঠাকুরালি-পনা রাধা কি ভাবে তিলেকে ভাঙ্গিবেন তাহা সাবধানী কবি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উক্তিটি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ইহারই আদর্শে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। যুগ-প্রভাব কিভাবে কবির রচনা নিয়ন্ত্রিত করে, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পদাবলী— তোর নিজ পতি তার হেন রীতি
তোরে পাঠাইয়া বিকে।
কেমনে ধৈরজ ধরিয়া আছয়ে
সে হেন পাষাণ বুকে॥

তুলনীয়—

আইহন সে জীএ কিকে হেন নারী পাঠাএ বিকে
গোপজাতী ধনের কাতর। ইত্যাদি।

ইহা ব্যতীত রাধার অঙ্গের উপর দান নির্দ্ধারণ, বড়ায়ের অন্তরালে গমন প্রভৃতি ঘটনাও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ। অবশেষে রাধার সহিত বিহারান্তে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

গোলক বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে।
তুয়া সঙ্গ অঙ্গ পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে॥

এইভাবে চৈতন্য-পরবর্ত্তী ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার করিয়া পদাবলীর কবি দানলীলার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। নৌকালীলার বিশিষ্টতা এই যে, কৃষ্ণ একসঙ্গে সকল গোপীকে পার করিয়াছিলেন, এবং নৌকাতে উঠিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—

হাসি কহে তবে সব গোপনারী
আর কিবা দিতে আছে।
এ নব যৌবন কুল সমাপন
দিয়াছি তোমার কাছে॥ ইত্যাদি।

পোষা পাখীর ন্যায় এই সকল বুলিতে পরম বিচিত্রতার সৃষ্টি হইতে পারে নাই। চৈতন্য-পরবর্ত্তী ভাব-ধারার নিদর্শন এই সকল পালায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সনাতন গোস্বামী এই পদাবলীর দান-লীলাদিকে প্রাক্‌চৈতন্যযুগে স্থাপন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বংশী ও বিরহখণ্ডে রাধা যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া পদাবলী রচিত হইয়াছে, এবং চৈতন্যোত্তর ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাব প্রচলিত পদাবলীতে কি ভাবে পতিত হইয়াছে তাহার আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

১। কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। (কৃঃ কীঃ)

তুº— শ্যামের বাঁশীটি দুপুরে ডাকাতি
সরবস হরি নিল।
হিয়া দগদগি পরাণ-পাগলী
কেন বা এমতি কৈল॥
(দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ৭৬৯ সং পদ)।

এবং— ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ না রহে ধরে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে।
(ঐ, ৭৭০ সং পদ)।

অন্যত্র— হারে সই, শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহ-কাজ ভুলি, প্রাণ করে আনচান॥
(ঐ, ৭৭৩ সং পদ)।

এবং— এ অঙ্গ জ্বলিয়া গেল মোর।
(ঐ, ৩৭৪ সং পদ)।

২। দাসী হঞাঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা। (কৃঃ কীঃ)

তুº— সব পরিহরি করিলে বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী। (ঐ, ৫৯৬ পৃঃ)।

অন্যত্র— আমরা তোমার দাসী। (ঐ, ৭৬৯ সং পদ)।

এবং— চরণে শরণ নিল না বাসিল ভিনে।

(ঐ, ৭৭৫ সং পদ)।

৩। আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী। (কৃঃ কীঃ)

তু°— নয়ানে ঝরয়ে নীর পরাণ না রহে স্থির

এ বাঁশীর মধুর আলাপে।

(ঐ, ৭৭৪ সং পদ)

৪। বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।

মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥ (কৃঃ কীঃ)

তু°— বন পুড়িছে যে বনের আগুনে

দেখয়ে জগৎ-লোকে।

এ বড় বিষম শুনগো সজনি

জ্বলে উঠে বিনি ফুকে।

(ঐ, ৮১৭ সং পদ)

এবং— তুখের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায়।

(ঐ, ৭৮৩ সং পদ)।

৫। আহোনিশি মো আন না জানো

এ দুখ কহিবোঁ কাএ।

কাহ্নের ভাবে চিত্ত বেআকুল

লাজে মো না কান্দো রাএ॥ (কৃঃ কীঃ)

তু°— নিশিদিন মোর মন কানু লাগি ঝুরে।

(ঐ, ৭৮১ সং পদ)॥

এবং— শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে

ও পদ করেছি সার। (ঐ, ৪০৭ সং পদ)

অন্যত্র— চোরের রমণী যেন অনাথিনী

ফুকরি কাঁদিতে নারে॥ (ঐ, ৮৮১ সং পদ)

এবং—আমি কুলনারী ফুকারিতে নারি
ননদী আছয়ে ঘরে। (ঐ, ৮২১ সং পদ)

৬। সামী মোর ডরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিয়া দিল
রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে॥ (কৃঃ কীঃ)

তুº—স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি। (ঐ, ৮৫৪ সং পদ)
নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা।
তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা॥
(তরু, ৮১১ সং পদ)

তুº—ননদী বচনে দগধে পরাণে
পাঁজর বিঁধিল ঘুণে॥
(দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ৮২১ সং পদ)

এবং—ঘরে গুরু দুরুজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে কানু লাগি॥ (ঐ, ৭৮০ সং পদ)
যদি বা কখন কাঁদি কোন ছলে
শাশুড়ী ননদী তারা।
বলে শ্যাম লাগি কান্দে কলঙ্কিনী
এমতি তাহার ধারা॥ (ঐ, ৩৯৬ সং পদ)

অন্যত্র—
লোক মুখে শুনি ইহা বলে লোকে
কানু সনে রাধা আছে। (ঐ, ৮৩৭ সং পদ)
গোকুল নগরে আমার বঁধুরে
সবাই আপনা বাসে।
হাম অভাগিনী আপন বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে॥ (ঐ, ৮৪৬ সং পদ)

গোকুল-নগরে কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
শ্যাম-কলঙ্কিনী রাধা॥ (ঐ, ৭৯০ সং পদ)

এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥ (ঐ, ৮৫৪ সং পদ)

এ পাড়া-পরসী ডাকিনী সদৃশী
সকলি দোষয়ে মোরে॥ (ঐ, ৮৬২ সং পদ)

৭। দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞ নারী বড় অভাগিনী। (কৃঃ কীঃ)

ইহারই প্রতিধ্বনি "সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিলুঁ, অনলে পুড়িয়া গেল" ইত্যাদি বিখ্যাত পদটিতে পাওয়া যায়।

ভাবসম্মিলনের অনেক উৎকৃষ্ট পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে সঙ্কলিত রহিয়াছে। এই পরিকল্পনার আদর্শও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মিলিয়া থাকে, যথা—

সব খন মোরে নান্দের নন্দন
চুম্বন করে কপোলে।
হেন হাথ নিধি কে হরি নিলে
মো দুখমতীর হেলে॥

রাধার দারুণ বিরহাবস্থায় যখন—

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে॥

তখন ঐ পদেই তিনি বলিতেছেন যে, কৃষ্ণের স্পর্শ তিনি সর্ব্বদাই লাভ করিতেছেন। ইহা যে সম্পূর্ণই ভাব-জগতের কথা তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—

কাহ্ন বিণী সব খণ পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥

তু°—লেহ-দাবানলে বন যেন জ্বলে
হরিণী পড়িল ফাঁদে ॥
পলাইতে মনে চাহে পথ-পানে
দেখয়ে অনলময়।
বনের মাঝারে ছট্‌ফট্‌ করে
কত বা পরাণে সয় ॥
বাহিরে আসিয়া বাণ যে খাইয়া
পশিতে তাহাতে পুন।
গরল-আনলে শরীর বিকলে
পাশাইতে নারে যেন ॥ (ঐ, পদ সং—৮২১)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—

তরুদল চালএ পবনে।
কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে ॥

ইহার প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের গানেও মিলিয়া থাকে, যথা—

কে আসিছে বলি চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—

যেনা দিগেঁ গেলা চক্রপাণী।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জানী ॥
দেব অসুর নরগণে।
বস হএ মন্মথ বাণে ॥
না বসএ তথা কি মদনে।
যে দিগেঁ বসে নারায়ণে ॥

ইহাঁরই প্রতিধ্বনি প্রাকৃত শ্লোকে পাওয়া যায়, যথা :—

নব মঞ্জরি সজ্জিঅ চূঅহ্ গাছে ;
পরিফুল্লিঅ কেসুলঅ বন আছে ;
জই এংথি দিগন্তর জাইহি কন্তা,
কিঅ মন্মহ নংথি কিনংথি বসন্তা ?

আবার রাধার উল্লেখ করা রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে—

এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি।
সেথা কি হাসেনা চাঁদিনী যামিনী
সেথা কি বাজেনা বাঁশরী॥
এথা সমীরণ লুটে ফুলবন
সেথা কি পবন বহেনা।
তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ
মোর কথা তারে কহেনা॥

ইত্যাদি

রসশাস্ত্রে আটপ্রকার নায়িকার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, অভিসারিকা প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহাদেরও সন্ধান মিলিয়া থাকে। বড়ায়ির নির্দ্দেশ অনুযায়ী রাধা—

কদমতরুতল গিআঁ।
কিশলয়ে শয়ন বিছাইআঁ॥
আগর চন্দন আঙ্গে মাখী।
কাজলে রঞ্জিল দুই আখী॥
ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে।
পরিধান করি নেত বাসে॥
তরুদল চালএ পবনে।
কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে॥

না দেখিআঁ ছাড়এ নিশাসে।
বড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে ॥
হেনমতে কতোখন রহী।
কদমতলাত রাধা রাহী ॥
না পাইল কাহ্নাঞি দৈবদোষে।

ইত্যাদি।

এখানে বিভিন্নতার মধ্যে এই যে, কৃষ্ণের নির্দ্দেশে নহে, কিন্তু বড়ায়ির নির্দ্দেশ অনুযায়ী রাধা নিজের গৃহ ও দেহ সুসজ্জিত করিয়া কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কৃষ্ণ আসিলেন না দেখিয়া তাঁহার "ছাড়এ নিশাসে" উৎকণ্ঠিতা অবস্থার সূচনা করে। বাসকসজ্জিকা দশার শেষেই উৎকণ্ঠিতা দশা আরম্ভ হয়। ইহার পরেই যখন রাধা বলিতেছেন—

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী ॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতে না পাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥

তখন বুঝা যায় যে, তাঁহার রাত্রি বিফলে অতিবাহিত হইয়াছে। আর ইহার পরেই যখন বড়ায়ি বলিতেছেন—

বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর।

তখন বুঝিতে পারা যায় যে, রাধার বিপ্রলব্ধা দশার উদ্ভব হইয়াছে। রাধা অভিসারে বহির্গত হইয়া বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিয়াছেন। আখ্যায়িকামূলক পালাগানে এই সকল বিষয় পদাবলীর ন্যায় পৃথক্‌ভাবে বর্ণিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের—

তোহ্মার আহ্মার দুই মণে।
এক করী গাস্থিল মদনে ॥

রামানন্দের পদ—"তুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি ॥"

না খোজলুঁ দূতি না খোজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥”

মনে করাইয়া দেয়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাব প্রচলিত পদাবলী ও কবিগণের উপর পতিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একটি মাত্র পদের ভাব-ধারা সমগ্র পদাবলীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—

যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ, বড়াই
না মানিলোঁ লঘু-গুরুজনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥
বড়াই গো, কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল,
মোঞ্‌ঁ নারী বড় আভাগিনী॥
নান্দের নন্দন কাহ্নু যশোদার পো, আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞ্‌ঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
মোকে নেহ কাহ্নাঞির পাশে।
বাসলী-চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

রাধার এই অবস্থাই প্রচলিত পদাবলীতে নানাভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

প্রচলিত পদাবলীতে রাধা ও চন্দ্রাবলী বিভিন্ন নায়িকারূপে চিত্রিত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধাকেই চন্দ্রাবলী বলা হইয়াছে। কবি এই ধারণার জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের নিকট ঋণী[১]। ইহার কৃষ্ণজন্মখণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে রাধার ষোড়শ নামের মধ্যে চন্দ্রাবলী নাম ধৃত হইয়াছে, এবং ইহার অর্থ এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—"রাধার মুখ চন্দ্রের ন্যায়, এবং নখে চন্দ্রাবলী নিরন্তর বিরাজমান, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চন্দ্রাবলী বলিয়া থাকেন।" (ঐ, বঙ্গানুবাদ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৪৭৭ পৃঃ)। অতএব চণ্ডীদাস নামকরণে প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধ ধারণায় উপনীত হন নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বসন্তকালে রাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই ধারণার জন্যও কবি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের নিকট ঋণী। কৃষ্ণের জন্মের পরে গর্গ নন্দের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া যশোদাকে বলিতেছেন—"এই বালক বসন্তকালে পূর্ণিমারাত্রিতে রাসমণ্ডপে সকলের হর্ষবর্দ্ধক অনির্ব্বচনীয় রাসোৎসব করিবেন। ইনি নব-সম্ভোগে গোপীগণের মনোরথ পূর্ণ করিয়া তাহাদের সহিত কুতূহলে জলক্রীড়া করিবেন।" (ঐ, বঙ্গানুবাদ, বঙ্গবাসী সং, ৪৪৬ পৃঃ)। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের ৪৯ অধ্যায়ে রায়াণ যে কৃষ্ণজননী যশোদার সহোদর, অতএব কৃষ্ণের মাতুল ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে[২]। ভাগবতাদি পুরাণে রাধার নাম না থাকিলেও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, গীতগোবিন্দে, বেণীসংহার নাটকে এবং গাথা সপ্তশতী প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণপ্রণয়িনী রাধিকার উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব লক্ষ্মীর অবতাররূপে রাধার পরিকল্পনা করা চণ্ডীদাসের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার পরম বিরাগকে অনুরাগে পরিণত করিবার জন্য যে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদির সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই

১। অথবা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উক্তিই এই পুরাণে সমর্থিত হইয়াছে, কারণ অনেকের মতে ইহা অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন।

২। ইহা হইতে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাবই ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পড়িয়াছে, কারণ এই পুরাণের প্রভাব উক্ত গ্রন্থে নাই।

বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কাব্য-রচনায় কবি যে এইরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য।

বড়ু চণ্ডীদাস বোধ হয় আমারই ন্যায় দুর্ভাগ্য লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশিত হইবার পরে ইহার যেরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে, আমাদের অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থ সম্বন্ধে সেইরূপ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। এই জাতীয় সমালোচনা প্রায় সম্পূর্ণই সমালোচকগণের ভ্রান্তিপ্রসূত, অথচ তাঁহারা কবির উপর দোষারোপ করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই সকল সমালোচনার প্রত্যেকটির উত্তর দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে, তথাপি প্রয়োজনবোধে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ ঐ সকল শ্লোক অন্য কোন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐরূপ গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া কবি যদি ইহা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে চোর বলা যাইতে পারে। চৌর্য্যবিদ্যা বর্ত্তমানকালে যেমন সুকৌশলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, প্রাচীন কবিরা তত ধূর্ত্ত ছিলেন বলিয়া মনে করিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হয়। এই সকল শ্লোক পাঠ করিলে দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী পদে যে ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে, তাহারই নির্দ্দেশ ইহাতে প্রদান করা হইয়াছে। এই প্রথা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতেও অনুসৃত হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে সেই অধ্যায়-বর্ণিত ঘটনার অভাস দিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এক একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন, যেমন মধ্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথমেই রহিয়াছে—

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডম্
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন
যৎ প্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি॥

ইহার পরে এই পরিচ্ছেদে মাধবেন্দ্রের জন্য গোপীনাথের ক্ষীর চুরির

আখ্যায়িকাটি বর্ণিত রহিয়াছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ শ্লোকে সাক্ষি-গোপালের উল্লেখের পরে ঘটনাটি বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। শঙ্কর-দেবের রুক্মিণীহরণ নাটের প্রতি পৃষ্ঠায় এইরূপ সংস্কৃত শ্লোকে পরবর্ত্তী ঘটনার নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। এই রীতি সেই প্রাচীন যুগে অনুসৃত হইবার কারণ কি? বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই আদি যুগে সংস্কৃতজ্ঞ লোকদিগকে (যাঁহারা ভাষা-গ্রন্থ পছন্দ করিতেন না) গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়ের আভাস প্রদান করিবার জন্য এই সকল শ্লোক রচিত হইয়া থাকিবে, নতুবা একই রীতি সকলে অনুসরণ করিবেন কেন? চৈতন্যচরিতামৃতের ত কথাই নাই, কারণ ইহা গোস্বামিগণ প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের প্রথম ভাষা-গ্রন্থ। যে সময়ে সকল গোস্বামীই সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সময়ে যে এই প্রথার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচনার কালে এই রীতি অনুসৃত হইবার আরও বেশী প্রয়োজন ছিল, কারণ ইহাতেই বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্র যে এই রীতি অনুসৃত হয় নাই তাহার কারণ এই যে, মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শ পুথিখানি গ্রন্থ-রচনার বহু পরবর্ত্তীকালে লিখিত হইয়াছিল (পূর্ব্বে ইহা আলোচিত হইয়াছে)। সেই সময়ে সংস্কৃত শ্লোকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই, অথবা বহু প্রচলন হেতু মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কবি যে কাহারও বিত্ত আত্মসাৎ করেন নাই, এই সিদ্ধান্ত ভদ্রসমাজে গৃহীত হওয়া উচিত। বিশেষতঃ যখন এই সকল শ্লোক অন্য কোন গ্রন্থে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেই ইহাদের সার্থকতা লক্ষিত হয়, তখন কল্পনাবলে কবিকে চোর বলা সম্পূর্ণই অসঙ্গত। আমাদের এই প্রাচীন কবি অন্ততঃ এই ভদ্রতাটুকু আমাদের নিকট আশা করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ডে একাধিক পালার সন্ধান পাওয়া যায়। এজন্য এই ধারণা করা সঙ্গত নহে যে, অন্যের রচনা গ্রন্থমধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। দানখণ্ডে একাধিক দিনের ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে। এই সাধারণ কথাটা গ্রন্থ

পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মুদ্রিত গ্রন্থের ২য় সংস্করণের ৫৫ পৃষ্ঠায় আছে—

বড়াইর উক্তি :—না জাইব আল রাধা মথুরানগর।
বাটে দুরুবার কাহ্নাঞি নান্দের সুন্দর ॥
রাধার উক্তি :—নিছন লইআঁ কাহ্নাঞি থাকু এক বাটে।
আন পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে॥

এই কথোপকথন হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মথুরার হাটে যাইবার জন্য নূতন পরামর্শ হইতেছে। অতএব ইহা অন্য একদিনের ঘটনা। এই ভাবে একাধিক দিনের ঘটনা লইয়া দানখণ্ডটি রচিত হইয়াছে। অন্যের রচনা যে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, পদগুলির ভণিতাও তাহা সমর্থন করে।

১৩৪২ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কয়েকটি পদ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তী কোন লেখক অনুমোদন করিয়া লিখিয়াছেন—(দানখণ্ডের) "পদ দুইটি প্রায় একই ভাবের, সুতরাং একই কবির রচনা হইতে পারে না। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত কাঁচা হাতের রচনা। প্রথম পদে আছে—'দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে', দ্বিতীয়টিতে আছে—'দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে।' বিদ্যানিধি মহাশয় ঠিকই ধরিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পদটির এই ছত্র প্রথমটির অপেক্ষা অর্ব্বাচীন।" যে দুইটি পদ লইয়া "চায়ের পেয়ালায় এই ঝড়ের উদ্ভব" হইয়াছে, তাহা এই—

প্রথমটি

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা ॥
শিশত শোভএ তোর কাম সিন্দুর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূর ॥

ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা ।
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা ॥
নাসা তিলফুল তোর আতী আনুপামা
গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা ॥
নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে ।
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে ॥
বিম্বফল জিনী তোর আধরের কলা ।
মাণিক জিনিআঁ তোর দশন উজলা ॥
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা ।
বাহু মৃণাল কর রাতা-উতপলা ॥
কনক চম্পকসম শোভে কলেবরা ।
মাঝা দেখি সিংহ গেল পর্ব্বতকুহরা ॥
নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা ।
উরুযুগ রামকদলী তরুসমা ॥
মন্থর গমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে ।
তা দেখিআঁ বনবাস নৈল করীবরে ॥
অমরপুরত নাহিঁ হএ হেন রামা ।
বিধি কৈল অঙ্গমে কনকপ্রতিমা ॥
দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে ।
গাই বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥

দ্বিতীয়টি

ষোল-কলা-সংপুন্ন চন্দ্রবদন ।
বেকত আমৃত তোর মধুর বচন ॥
কাঁচ-কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ ।
কণ্ঠ কম্বু মণিগণ শোভএ দশন ॥

সুন্দরি রাধা ল সরূপ বোল মোরে।
দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে ।।
কুণ্ডলে আদিত্য যেহ্ন রবির সংঘাত।
গজরাজগতি পরিমল পারিজাত ।।
সুরজনে মোহে পুরজনে নাহি রাখ।
কালকূট বিষহরি জাগল কটাক্ষ ।।
সুররাজ গজকুম্ভ কুচযুগল।
তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল ।।
অমূল মণিনূপুর বাজের গমনে।
তাক সুনী মোহ পাএ তীন ভুবনে ।।
সকলগুণসংপুনী রাধা চন্দ্রাবলী।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ।।
রসহাস পরিহাসে তোষহ কাহ্নাঞিঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-আয়ী ।।

কবির মহা অপরাধ হইয়াছে এই যে, প্রথম পদটিতে রাধার রূপ বর্ণনা করিতে করিতে তিনি শেষের কলিটিতে "দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে" লিখিয়াছেন, অর্থাৎ তোমাকেই বোধ হয় মহাসমুদ্ররূপে দেবতা ও অসুরেরা মন্থন করিয়াছিল। সমুদ্র মন্থনে চন্দ্র, অমৃত, বিবিধ রত্ন, ঐরাবত, কালকূট বিষ ইত্যাদি উত্থিত হইয়াছিল। কবির বক্তব্য এই যে, তোমাকে মন্থন করিয়াছিল বলিয়াই যেন তোমার দেহে এই সকল জিনিষ ভাসিয়া উঠিয়াছে, বা প্রকটিত রহিয়াছে। কিন্তু প্রথম পদটিতে তিলকের সহিত শশিকলার তুলনা ছাড়া এই সকল জিনিষের আর কোন উল্লেখ নাই। এখন দ্বিতীয় পদটি লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। ইহার প্রথম ছত্রেই বদনের সহিত ষোলকলাপূর্ণ শশীর তুলনা করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য এই যে, সমুদ্র মন্থনে পূর্ণ-চন্দ্রেরই উদয় হইয়াছিল, তিলকের ন্যায় শশিকলার নহে (প্রথম পদ দ্রষ্টব্য)। তারপর রাধার বচনের সহিত অমৃতের, দশনের সহিত মণিগণের (প্রথম

পদটিতে সাধারণ কবি-প্রসিদ্ধি অনুসরণ করিয়া মাণিকের সহিত দন্তের তুলনা রহিয়াছে বটে, কিন্তু রূপ-বর্ণনায় সেখানে গতানুগতিক রীতিরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়), সুররাজ গজকুম্ভের সহিত কুচযুগলের (এখানে ঐরাবতের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, প্রথম পদের উৎপ্রেক্ষার করিবর নহে), কালকূট বিষপূর্ণ কটাক্ষের, এবং দেহ-লাবণ্যের সহিত জলের উপমা রহিয়াছে। অতএব এই দ্বিতীয় পদটিতেই সমুদ্রমন্থনজাত বিবিধ জিনিষের স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অতএব এই ধারণাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, প্রথম পদটিতে প্রচলিত প্রথায় রাধার রূপ বর্ণনা করিতে করিতে ইহার শেষ কলিটিতে কবির মনে সমুদ্র-মন্থনের উপমার ধারণা উদিত হইয়াছিল, আর তাহাই তিনি দ্বিতীয় পদটিতে বিবৃত করিয়াছেন। অতএব এই দুইটি পদ একই কবির রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

আবার কেহ লিখিয়াছেন—"ইহার পর (অর্থাৎ তাম্বূল খণ্ডের একটী পদের পরবর্ত্তী, ২য় সং ৯ম পৃঃ পরে) রাধার জবানীতে যে পদটি (পৃঃ ১০) আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত, অর্থাৎ মূল পালায় ছিল না; কেননা, ইহার মর্ম্ম অনুনয়সূচক, পূর্ব্ববর্ত্তী পদের এবং পরবর্ত্তী রাধার উক্তির সহিত একেবারে মিল নাই, ইত্যাদি।" না থাকিলেই কি তাহা প্রক্ষিপ্ত হইবে? পূর্ব্ববর্ত্তী পদটিতে রাধা বড়াইকে একেবারে নিরুৎসাহ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সাধারণ স্বভাব এই যে, কাহাকেও রূঢ় ভাবে কোন কথা বলিয়া ফেলিলে পরে তাহা সংশোধন করিয়া লইতে চাই। এইভাবে বিচার করিলে রাধার উক্তিটি প্রক্ষিপ্ত বলিবার কারণ থাকিতে পারে কি? কিন্তু গ্রন্থমধ্যে এই পদটির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। এখানে রাধা বলিয়াছেন—

জৈসাণে রতি জাণবোঁ।
তৈসাণে কাহ্ন আনিবোঁ। ইত্যাদি

অর্থাৎ লক্ষ্মীর অবতার রাধার অবচেতন মনে কৃষ্ণের প্রতি এই আসক্তি বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু মুগ্ধা বলিয়া মোহাভিভূতা রাধা প্রথমতঃ কৃষ্ণের আহ্বানে সাড়া দেন নাই। এই সুপ্ত প্রীতিরই ক্রমিক অভিব্যক্তি এই গ্রন্থমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এই পদটি গ্রন্থের মূল পরিকল্পনার অংশ-বিশেষ। পরবর্ত্তী

পদে বড়াই-যাইয়া কৃষ্ণের নিকটে ইহাই বিবৃত করিয়াছেন। এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত দুইটি পদ বর্ত্তমান থাকাতেও ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলা বিস্ময়ের বিষয়। এই সকল খামখেয়ালীর মূল্য নির্দ্ধারণের ভার পাঠকগণের উপরেই অর্পিত হইল। ভগবান নাই, ইহা বলা সহজ, কিন্তু আছেন, ইহা প্রমাণিত করাই কষ্টকর। কাব্য-বিচারে কবিকে বুঝিতে চেষ্টা করাই সনাতন প্রথা, তৎপরিবর্ত্তে কবির দোষ প্রদর্শন করিয়া আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হওয়া আমাদেরই অবিবেচনার নিদর্শন মাত্র। যাঁহারা এইভাবে কাব্য-বিচারে ব্রতী হন, তাঁহারা কি মনে করেন যে, চণ্ডীদাস আমাদের অপেক্ষাও কম চিন্তাশীল ছিলেন? যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় গ্রন্থ রচনা করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিত্তি গঠিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কথা বলিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হওয়াই আমরা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদগুলির সুর ও তাল সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, পাহাড়ীয়া, গুজ্জরী, রামগিরী, বিভাষ, কোড়া, মালব, ক্রীড়া, কুড়ুক্ক প্রভৃতি রাগরাগিণী প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, আর শ্রী, ধানশী, মল্লার, বেলাবলী, বরাড়ী, কেদার, ললিত, ভৈরব প্রভৃতি সুর, এবং রূপক, একতালী, যৎ, অষ্টতাল প্রভৃতি তালও অধুনা কীর্ত্তনে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ লগনী, প্রকীন্নক প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যে সকল পদের পূর্ব্বে এই লগনী শব্দটি ব্যবহৃত রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, ঐ সকল পদে একাধিক চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি রহিয়াছে। অতএব আমাদের ধারণা এই যে, লগনী শব্দটি সুর-তাল নির্দ্দেশক নহে, ইহা দ্বারা পদ-বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর প্রকীর্ণক অর্থে সঙ্গীতরত্নাকরে আছে—"বিষয়বিভাগেন বিনা প্রবৃত্তম্", এবং মধুসূদন মিশ্র-সম্পাদিত রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় আছে—"বহ্বপি স্বেচ্ছয়া কামং প্রকীর্ণমভিধীয়তে", এবং ইহার টীকায়—"প্রকীর্ণং সঙ্গতি রহিতং অসমঞ্জসং বহ্বপি ঘনমপি অভিধীয়তে।" যে সকল পদের পূর্ব্বে লগনী প্রকীন্নক রহিয়াছে

তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল পদে একাধিক ব্যক্তির কথাবার্ত্তা ব্যতীতও অন্যান্য বিষয়ের সমাবেশ রহিয়াছে। ইহাই "সঙ্গতি রহিত অসমঞ্জস।" অতএব এই শব্দটিও সুর-তাল নির্দ্দেশক নহে। মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আদর্শ পুথি যে গ্রন্থ-রচনার বহু পরে লিখিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, এবং প্রায় সকলেই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই পুথির সুর-তাল প্রভৃতির বিচার করিয়া এই গ্রন্থকে বিষ্ণুপুর-অঞ্চলের সম্প্রদায়বিশেষের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে! ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।